বিদ্যাসুন্দর

সটীক ও সচিত্র

এবং

জীবনচরিত ও সমালোচনা সম্বলিত।

শ্রীরামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন

প্রণীত।

কলিকাতা,

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট,

বঙ্গবাসী ষ্টীমমেসিনপ্রেসে

শ্রীবিহারীলাল সরকার কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯৩ সাল

মূল্য ২৲ দুই টাকা।

ভূমিকা।

"কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে,
সদ্যঃপরনির্বৃতয়ে কান্তাসম্মিততয়োপদেশ যুজে।"

কাব্যপ্রকাশ।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ যে আবার, একখানি বিদ্যাসুন্দর লিখিয়াছেন, তাহা অনেকেই জানেন না। হয়ত কথাটা শুনিয়া অনেকে বিস্মিত হইবেন। যাঁহার ন্যায় ভক্ত সাধক বাঙ্গালায় অতি অল্পই জন্মিয়াছেন—শুধু বাঙ্গালা কেন, সমস্ত জগতের সাহিত্য খুঁজিয়াও যাঁহার ভক্তিরসাত্মক গানের তুলনা মিলে না—যাঁহার পদাবলী শুনিলে পাষণ্ডের মনেও ভক্তিরসের আবির্ভাব হয়—সেই রামপ্রসাদ যে বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন—অনেকের হয়ত এ কথা বিশ্বাস করিবার ইচ্ছা হইবে না।

নানা কারণে কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর এতদিন লুপ্তপ্রায় ছিল। বাঙ্গালী পাঠক বরাবরই ভক্ত রামপ্রসাদকে চাহিত—কবি রামপ্রসাদকে চাহিত না। বাঙ্গালী পাঠক ভক্তরঞ্জন রামপ্রসাদের গানেই মোহিত থাকিত—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের দিকে তত লক্ষ্য করে নাই। একা রামপ্রসাদ দুই মূর্ত্তিতে বাঙ্গালী পাঠকের নিকট দেখা দিয়াছিলেন। ভক্ত, সাধক, সঙ্গীত-রচয়িতারূপ অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে তিনি বাঙ্গালী পাঠককে ভুলাইয়া রাখিয়াছিলেন—কাজেই তাহারা তাঁহারা কবিমূর্ত্তি দেখিতে অবসর পায় নাই। এই জন্য ক্রমে ক্রমে তাঁহার বিদ্যাসুন্দর বাঙ্গালী পাঠকের নিকট অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে।

আরও একটী বড় গুরুতর কারণ আছে। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের নিকট কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর প্রতিযোগিতায়

হারিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের—অন্ততঃ প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের মধ্যে, ভারতের বিদ্যাসুন্দরই প্রধান রসাত্মক কাব্য। কবিরঞ্জনের রস ভারতের ন্যায় এত মধুর—এত অধিক ও এত তৃপ্তিকর নহে। লোকে বাইজীর নাচ গান ফেলিয়া ধ্রুপদীয়া কালওয়াতের গান শুনিবে কেন? গোলাব পাইলে পদ্মের আঘ্রাণ লইবে কেন? ওডিকলম ল্যাবেণ্ডার ফেলিয়া চন্দন চুয়া মাখিবে কেন? ভারতের কবিতা-সুন্দরী যেন পূর্ণযৌবনা রমণী—আপনার যৌবনে আপনি মোহিত—আপনার রসে আপনি মত্ত—আপনার বিলাসে আপনি গর্ব্বিত। তাহার যৌবনের চঞ্চলতা আছে, সৌন্দর্য্যের মোহিনীশক্তি আছে—তাহার রসের ছড়াছড়ি ঢলাঢলি আছে—তাহার বিলাসে আবেশময় মত্ততা আছে। সে সৌন্দর্য্যে বুঝি যোগীরও মন টলে—সে বিলাসে বুঝি সাধকের প্রাণেও লালসা জন্মে। কবিরঞ্জনের কবিতা, যুবতী কিন্তু প্রৌঢ়া। তাহার যৌবনে চাঞ্চল্য নাই, তাহার রস উছলিয়া পড়ে না—তাহার বিলাসে মত্ততা নাই—সে ভঙ্গি নাই—তাহার সৌন্দর্য্যে আবেশ নাই। যে রস আছে তাহা বড় গভীর—বড় চাপা, স্থানে স্থানে ফল্গু নদীর ন্যায় অন্তঃশীলা। কাজেই লোকে ভারতের রসময় কবিতার প্রতি যেরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিল—কবিরঞ্জনের কবিতায় ততদূর হয় নাই। এই রসের উপর ভারতের ছন্দের মাধুরী, বর্ণনার কারিগরি—শব্দের পারিপাট্য—অলঙ্কারের চাকচিক্য—ভারতের কবিতা-সুন্দরী যেমন রূপবতী যুবতী, তেমনি অতি সুন্দররূপে বস্ত্রালঙ্কারভূষিতা, সুতরাং লোকে আর চায় কি? কবিরঞ্জনের কবিতা-সুন্দরী যেমন একদিকে প্রৌঢ়া, তেমনি আবার সুন্দররূপে বস্ত্রালঙ্কৃতা নহে। সুতরাং সে স্বভাবসুন্দরীর দিকে সাধারণের মন তত আকৃষ্ট হইবে কেন?

কিন্তু সাধারণের মন আকৃষ্ট হউক আর না হউক, যে গুণজ্ঞ, যে বাহিরের চাকচিক্যে আকৃষ্ট না হয়, সে তাহাতে মোহিত হয়। কবিরঞ্জনের কবিতা মধ্যে অন্তঃশীলা যে রস বহিতেছে তাহা স্থূলদর্শী দেখিতে পায় না—বাহ্য আবরণ ভেদ করিয়া

সে রসের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিলে রসাস্বাদন হয় না। সকলেই ত জানেন স্বর্গে উঠিতে হইলে দুর্গম সিঁড়ি ভাঙ্গিতে হয়, নতুবা স্বর্গে যাওয়া যায় না। কবিরঞ্জনের কাব্যস্বর্গে যাইতেও সেইরূপ কিছু কষ্টভোগ আছে। কাজেই সহজে লোকে সে কষ্ট স্বীকার করে না।

কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দরে যে রসের প্রাধান্য আছে, তাহা সাধারণ কাব্যরস হইতে কিছু স্বতন্ত্র। আজ কাল লোকে যাহাকে কাব্য বলে, তাহাতে ভক্তি, করুণা, ধর্ম্মভাবের সমাবেশ থাকে না। থাকিলেও তাহা সাধারণ পাঠকের নিকট আদৃত হয় না। বোধ হয় এই কারণেই প্রাচীন অলঙ্কারবেত্তাগণ ভক্তিরসকে কাব্যরসের সহিত গণনা করেন নাই। কিন্তু প্রকৃত কাব্যে ভক্তিরসের সমাবেশ থাকে; ধর্ম্মের, সত্যের, জ্ঞানের নিগূঢ় তত্ত্বের আলোচনা থাকে। প্রকৃত কাব্য কাহাকে বলে, তাহা ভারতচন্দ্রের কাব্য সমালোচনায় দেখান হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে সাধারণ লোক কাব্য বলিলে যাহা বুঝে তাহা স্বতন্ত্র। কথাটা একটু ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক।

সাধারণ লোকের কাছে ধর্ম্মের কথা—জ্ঞানের কথা বড় কটু বোধ হয়—সকলে সে রস আস্বাদনে সুখ পায় না। যে সকল বাহ্য বিষয় আমাদের প্রত্যক্ষসিদ্ধ হয়, যাহা দেখিয়া বা শুনিয়া আমরা আমোদ পাই—কাব্যে তাহারই বর্ণনা পাইলে আমরা সুখ বোধ করি। অতীন্দ্রিয় বিষয়ের আলোচনা আমাদের নিকট ভাল লাগে না। কাব্য বাহ্যপ্রকৃতির দর্পণ স্বরূপ হইলেই তাহাতে আমরা মোহিত হই। কাব্যে আমাদের ন্যায় লোকের চরিত্র চিত্র, সাধারণ মনোবৃত্তির ক্রিয়া, সাধারণ লোকের কার্য্য-প্রণালী চিত্রিত থাকিলে, তাহাকেই আমরা প্রকৃত কাব্য বলি। নতুবা অমানুষ চরিত্র, অলৌকিক ঘটনা, অতীন্দ্রিয় বিষয়ের সমাবেশে কাব্যের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়, এই আমাদের ধারণা। আমরা বড় স্থূলদর্শী, বাহ্যজগতের আকর্ষণ হইতে মনকে টানিয়া লইতে পারি না। তাই কাব্যেও বাহ্য-

জগত ব্যতীত আর কিছু চাই না। তাহার পর আমাদের মন সংসার সমুদ্রে পড়িয়া প্রবৃত্তি আবর্ত্তে বড়ই হাবুডুবু খাইতে দেখিলে সুখী হই। তাই সাধারণ লোক কাব্যে এইরূপ স্বভাব বর্ণনা ও এই সকল সাধারণ প্রবৃত্তির চিত্র ব্যতীত অধিক কিছু চায় না। যিনি অপেক্ষাকৃত ভাল লোক, যাঁহার চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি গুলি অধিকতর মার্জ্জিত, তিনি কাব্যে বড় জোর সদ্বৃত্তির চিত্র দেখিতে চাহেন। কাব্য মধ্যে কল্পনার লীলা, আদর্শ চরিত্রের বর্ণনা, উচ্চতর মনোবৃত্তির কার্য্যপ্রণালীর চিত্র প্রভৃতি আদর্শ কাল্পনিক বিষয়ের সমাবেশ দেখিতে ভাল বাসেন। এই রূপ কাব্যকেই তাঁহারা প্রকৃত কাব্য বলেন।

কিন্তু যিনি জ্ঞানী, তাঁহার নিকট বাহ্য-জগতের বৈচিত্র্য, দূর হইতে থাকে। সকলই তিনি সমান দৃষ্টিতে দেখিতে শিখেন। এই বৈচিত্র্যের প্রকৃত তত্ত্ব অন্বেষণ করিয়া সকলের মূলে এক মূল সত্ত্বা আছে দেখিতে পান। কাব্যেও ইঁহারা এই তত্ত্ব দেখিতে চান। ইহাঁদের মতে প্রকৃত কাব্যের এই সত্যই প্রধান ভিত্তি হওয়া আবশ্যক। তাই ভক্তিরস, ধর্ম্মকথা, জ্ঞানের কথা, ঈশ্বরানুগৃহীত লোকের কথা, ইহাঁদের মতে কাব্যের প্রধান অঙ্গ হওয়া উচিত। যে সকল অতীন্দ্রিয় বিষয় কেবল জ্ঞানীর জ্ঞানচক্ষেই প্রতিভাত হয়, ইঁহাদের মতে প্রকৃত কাব্যে সেই সকল বিষয় বর্ণনার প্রতি মূল লক্ষ্য থাকা উচিত। কোন খ্যাত-নামা লেখক বলিয়াছেন, "সামান্য কবিতা (স্বভাব) বর্ণনাময়ী; উচ্চতর কবিতা (আদর্শ) কল্পনাময়ী; এবং উচ্চতম কবিতা (আধ্যাত্মিক) রহস্যময়ী।" সুতরাং যাহাতে সাধারণ লোক সন্তুষ্ট হয়—উচ্চদরের লোক তাহাতে সুখ পান না—আবার যাহাতে জ্ঞানীগণ আনন্দ উপভোগ করেন, তাহাতে সাধারণ লোক আকৃষ্ট হয় না। এই জন্য সাধারণ লোকের কাছে কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর অপেক্ষা ভারতের বিদ্যাসুন্দর অধিক আদৃত—আর জ্ঞানী লোকের কাছে ভারতের বিদ্যাসুন্দর অপেক্ষা কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর অধিক আদৃত।

বাস্তবিক সাধারণতঃ যাহাকে রসাত্মক কাব্য বলে, তদনু-সারে ভারতের বিদ্যাসুন্দর শুধু বাঙ্গালায় প্রধান কাব্য নহে,— ইহাই একমাত্র কাব্য। ভারতচন্দ্রের কাব্য সমালোচনায় দেখান গিয়াছে যে, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে ধর্ম্ম ছাড়া কাব্য নাই। ধর্ম্মপ্রচারের জন্যই প্রধানতঃ বাঙ্গালা কাব্য লিখিত হইয়াছিল। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কৃষ্ণদাস, কবিকঙ্কণ, কবি-রঞ্জন, ঘনরাম, রামেশ্বর প্রভৃতি সকলেই ধর্ম্মকথা প্রচারের জন্য দেবতাদের বরপুত্রগণের জীবনচরিত—তাহাদের দেবতাপূজা প্রচার প্রভৃতি বিষয় কাব্যে বর্ণনা করিয়াছেন। কাব্য লেখা অপেক্ষা ধর্ম্মপ্রচার তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কেবল একমাত্র বিদ্যাসুন্দরই বাঙ্গালার রসপ্রধান কাব্য। কাব্যলেখার জন্যই প্রধানতঃ ভারতের বিদ্যাসুন্দর লিখিত হয়। তাই বাঙ্গালী পাঠকের নিকট বিদ্যাসুন্দরের এত আদর। কবিরঞ্জ-নের বিদ্যাসুন্দর অতি উচ্চদরের কাব্য হইলেও তাহাতে অন্যান্য কাব্যের ন্যায় দেবীর বরপুত্র শাপভ্রষ্ট সুন্দর কিরূপে কালী পূজা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাই প্রধানতঃ বর্ণিত হইয়াছে। কবিরঞ্জনের বিদ্যাসুন্দর পড়িলেই বোধ হয়, কবি যেন কালীর মাহাত্ম্য, ভক্তের প্রতি তাঁহার করুণা, প্রভৃতি বুঝাইবার জন্যই এই কাব্য লিখিয়াছেন। তাঁহার বিদ্যাসুন্দরের আগাগোড়াই ধর্ম্মকথা, ধর্ম্মের আভাস, ধর্ম্মের ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ। তিনি সর্ব্বত্রই তাঁহার নিজ কালী ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। সাধারণ রুচিবিরুদ্ধ বর্ণনাই হউক,—ব্যঙ্গ পরিহাসের বর্ণনাই থাকুক, আর রসিকতার বর্ণনাই থাকুক, সর্ব্বত্রই তিনি প্রতি পরিচ্ছেদের শেষে বলিয়াছেন,—

> প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ি।
> আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

অথবা এইরূপ অন্য কোন প্রার্থনা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার কাব্যের অনেক স্থলেই সাধনার গূঢ় কথার ইঙ্গিত আছে—

"কালীকিঙ্করের কাব্য কথা বুঝা ভার।
বুঝে কিন্তু সে কালী-অক্ষর হৃদে যার॥"

আবার অনেক স্থলে সে ইঙ্গিত এত অস্পষ্ট যে, প্রকৃত সাধক ব্যতীত তাহা কেহই বুঝিতে পারে না—

"গ্রন্থ মধ্যে সঙ্কেত রহিল যে যে স্থানে॥
মা জানেন মাত্র ব্যক্ত নহিলে কে জানে॥

সুতরাং কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর কাব্য মধ্যে উৎকৃষ্ট হইলেও সাধারণতঃ যাহাকে কাব্য বলে, ঠিক তাহা লেখাই কবিরঞ্জনের উদ্দেশ্য ছিল না। কেন না,—

" বিষম বিষয় কাল সর্প নিয়া খেলা॥
স্বকীয় কল্যাণ কিছু চিন্তা করা চাই।"

এজন্য কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর পড়িলে শুধু আমোদ পাওয়া ব্যতীত, তাহার সহিত পারমার্থিক মঙ্গলও কিছু সংসাধিত হয়। কেন না ইহা "যে গাওয়ায় যে বা গায়, তাহার মঙ্গল।"

তাই বলি, শুধু যাঁহারা আমোদ চাহেন, শুধু কাব্য পড়িতে চাহেন, কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর তাঁহাদের ভাল লাগে না। একমাত্র ভারতের বিদ্যাসুন্দরই তাঁহাদের নিকট আদৃত। বাস্তবিক প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে একমাত্র ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরই সাধারণ লোকের কাব্যপাঠস্পৃহা সম্পূর্ণরূপে তৃপ্তি করিতে পারে। ভারত স্বয়ংই তাঁহার বিদ্যাসুন্দরে বলিয়াছেন,

"ভারতের রচিতের অমৃতের ভার।
ভাষা গীত সুললিত অতুলিত সার॥"

তাই বাঙ্গালার ভারতের বিদ্যাসুন্দরের এত আদর। কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দরে কাব্যরস যথেষ্ট আছে সন্দেহ নাই—কিন্তু তাহার সহিত ধর্ম্মকথা বড় অধিক পরিমাণে মিশিয়া আছে।

আমরা জানি, আজিও এদেশে এমন পণ্ডিত পাওয়া যায়, যাঁহারা ভারত ও কবিরঞ্জনের বিদ্যাসুন্দর আগাগোড়া হরগৌরী পক্ষে ব্যাখ্যা করিতে পারেন। শুনিয়াছি এরূপ

ব্যাখ্যা-করা পুঁথিও অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যায়। কিন্তু পণ্ডিতে বিদ্যাসুন্দর সম্বন্ধে যেরূপ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করুন না, কেন, সাধারণ লোকের কাছে বিদ্যাসুন্দর কাব্য বই আর কিছুই নহে। সুতরাং লোকে কাব্যের দোষ গুণ ধরিয়াই এই দুই বিদ্যাসুন্দরের তুলনা করিয়া থাকেন।

আবার সুধু ধর্ম্মের কথা, সুধু সাধনার কথার বাড়াবাড়ি আছে বলিয়াই যে কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর সাধারণের নিকট আদৃত হয় নাই, তাহা নহে; কবিরঞ্জনের রচনা ভারতের ন্যায় তত মধুর, তত প্রাঞ্জল নহে। অনেক স্থলে কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দরের অর্থ দুর্ব্বোধ্য—অনেক স্থলে তাহা অবোধ্য। লিপিকর প্রমাদ জন্যই হউক, আর যে জন্যই হউক, অনেক স্থানের পাঠে গোলযোগ হইয়াছে—অর্থ দুর্ব্বোধ হইবার ইহা এক প্রধান কারণ। অনেক স্থলে আবার সাধনার গূঢ় কথা আছে বলিয়া সেই সকল স্থান কূট ও দুর্ব্বোধ্য করা হইয়াছে। আবার ইহার উপর কবির অনুপ্রাসের ছটা, অপ্রচলিত শব্দের ঘটা, দুরাণ্বয় প্রভৃতি দোষে, আর হিন্দী ও পারসী কথার বাড়াবাড়ি, ও এইরূপ অপ্রচলিত ভাষার বর্ণনার আধিক্য হেতু, অনেক স্থলের অর্থ সহজবোধ্য নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে তাহার দুই একটী উদ্ধৃত হইল;—

সুন্দরের বন্ধন দৃষ্টে বিদ্যার খেদোক্তি;—

"দয়িতং দুর্গতি দেখি দগ্ধ দ্বিজরাজ-মুখী
দুঃখ সিন্ধু উথলিয়া উঠে।
ধরাতলে ধনী পড়ে, ধীহারা ধুচয় বাড়ে,
ধড়ে প্রাণ নাহি ঘর্ম্মছুটে॥
নয়নে নিয়গাতীর, নিশায় নির্গত নীর,
নাথার্থে পদ্মিনী যেন জ্বরা।
ফাঁপরে ফেপর রূপা, ফলতঃ করগো কৃপা,
ফিকিরে ফিরাও প্রাণনাথে॥"

পাঠকগণ ভারতের এই স্থানের বর্ণনা দেখুন,—

"প্র াত হইল বিভাবরী, বিদ্যারে কহিল সহচরী,

সুন্দর পড়েছে ধরা, শুনি বিদ্যা পড়ে ধরা,
সখি তোলে ধরাধরি করি।
কাঁদে বিদ্যা আকুল কুন্তলে, ধরা তিতে নয়নের জলে,
কপালে কঙ্কণ হানে, অধীর ক্রোধর বাণে,
কি হৈল কি হৈল ঘন বলে।

রাণী রাজাকে বিদ্যার গর্ভ সংবাদ দিতে যাইবার সময়—

"নহে সুখী সুমুখী নিরখি নন্দিনীরে।
অসম্বর অম্বর অম্বর পড়ে শিরে॥
জ্ঞানহারা তারাকারা ধারা শত শত।
গোমুখে গলিত ধারা তৃষ্ণা নিষ্ঠাগত॥
বিগলিত কুন্তল জলদপুঞ্জ ছটা।
নিরানন্দ গতি মন্দ জিনিয়া বরটা॥"

ঠিক এই স্থলে ভারত বলিয়াছেন—

"ক্রোধে রাণী ধায় রড়ে, আঁচল ধরায় পাড়,
আলু থালু কবরী বন্ধন।
চক্ষু ঘুরে যেন চাক, হাত নাড়া ঘন ডাক,
চমকে সকল পুরজন॥"

সুতরাং বলিতে হইবে কবিরঞ্জনের বর্ণনা অনেক স্থলে দুর্ব্বোধ্য ও প্রসাদ-গুণবর্জ্জিত বলিয়া, ভারতের বিদ্যাসুন্দর অপেক্ষা তাঁহার বিদ্যাসুন্দরের আদর কম হইয়াছে।

কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর সাধারণে অপ্রচলিত হইবার আর একটা বড় গুরুতর কারণ আছে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কবি-রঞ্জনের একজন প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। তিনিই কবি-রঞ্জনকে এক শত বিঘা নিষ্কর ভূমি ও 'কবিরঞ্জন' উপাধি দান করেন। অনেকে বলেন, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধেই কবিরঞ্জন এই বিদ্যাসুন্দর লিখেন। শুধু বিদ্যাসুন্দর কেন, কবিরঞ্জনের অষ্টমঙ্গলা পাঠে বেশ বুঝা যায় যে, তিনি বিদ্যাসুন্দর ব্যতীত কালীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া আট পালায় সম্পূর্ণ এক মহাকাব্য লিখিয়া, তাহাই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে উপহার দিয়াছিলেন। তখন এই সকল পালা রীতিমত গীত

হইত ও গায়কদের দ্বারাই তাহা সাধারণে প্রচারিত হইত। তাহারাই এই সকল পুঁথি নকল করিয়া অভ্যাস করিত, নতুবা ইচ্ছা করিয়া শুধু পড়িবার জন্য, পুঁথি অনুসন্ধান করিয়া সাধারণ লোকে তাহা বড় একটা নকল করিয়া লইত না। তখন ত লোকে সুর করিয়া গানের ধরণে পড়া ব্যতীত, সহজ ভাবে পদ্য পড়াই জানিত না। কাজেই যে কাব্য গীত হইত না, তাহা একেবারে অপ্রচলিত হইয়া পড়িত। চণ্ডী বল, ধর্ম্মমঙ্গল বল, মনসামঙ্গল বল, শিবায়ণ বল, অন্নদামঙ্গল বল, সকলই এইরূপ গায়কদের দ্বারা গীত হইত বলিয়াই সেগুলি আজিও প্রচলিত আছে। এই জন্য যে যে স্থানে যাহা গীত হয়, সেই সেই দেশেই তাহা পাওয়া যায়। মেদিনীপুরেই কেবল শিবায়ণ গীত হয়, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে ধর্ম্মমঙ্গল গীত হয়; এই জন্য সেই সেই দেশ ছাড়া অন্য দেশের লোক সে সকল মহাকাব্যের নাম পর্য্যন্ত জানিত না। কবিরঞ্জনের বিদ্যাসুন্দরও গীত হইবার জন্য লিখিত হয়। কবি এক স্থলে বলিয়াছেন, "যে গাহায়, যে বা গায় তাহার মঙ্গল।" কিন্তু দুঃখের বিষয়, কবিরঞ্জনের বিদ্যাসুন্দর বা তাঁহার সমস্ত পালা বোধ হয় কখন গীত হয় নাই। এই জন্য তাহা সাধারণে প্রচারিত হইতে পায় নাই। কেন গীত হয় নাই তাহা বলিতেছি। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যখন কবিরঞ্জনকে বিদ্যাসুন্দরাদি লিখিতে বলেন— তখন, যতদুর বুঝা যায়—ভারতের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় নাই। তাহার বোধ হয় দুই তিন বৎসর পরে ভারত তাঁহার সভাসদ্ হইলেন। সেই বৎসরেই তিনি ভারতকে অষ্টমঙ্গলা অন্নদামঙ্গল রচনা করিতে বলেন। বোধ হয় কবিরঞ্জনের মহাকাব্য ভারতকে দেখাইয়া, তদনুরূপ আর একখানি মহাকাব্য রচনা করিতে তাঁহাকে আদেশ করেন। ভারতের কাব্য উৎকৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়াই হউক, অথবা সংসার-বিরাগী কবিরঞ্জন তাঁহার নিকটে ছিলেন না বলিয়াই হউক, অথবা ভারতের মহাকাব্যে তাঁহার ইষ্টদেবী অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছিল বলিয়াই হউক, মহারাজ

ভারতের অন্নদামঙ্গলই গান করাইতে আরম্ভ করেন। সুতরাং তাঁহার নিকট কবিরঞ্জন অষ্টমঙ্গলা ও তৎসহ বিদ্যাসুন্দর বোধ হয় অযত্নে রক্ষিত ছিল। তাই তাহা ক্রমে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। হয়ত কোন গুণগ্রাহী ব্যক্তি তন্মধ্যে কেবল বিদ্যাসুন্দরই নকল করিয়া লইয়াছিলেন, তাই কেবল তাঁহার বিদ্যাসুন্দরই রক্ষিত হইয়াছিল।

কিন্তু কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর যে রূপেই রক্ষিত হউক, তাহা এক্ষণে বড় দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। বিদ্যাসুন্দর পুঁথি এক্ষণে আর পওয়া যায় না। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কবিরঞ্জন কাব্যসংগ্রহ নামে একখানি মুদ্রিত পুস্তকে, রামপ্রসাদের অন্যান্য কাব্যের সহিত এই বিদ্যাসুন্দর প্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু সাধারণের উৎসাহ অভাবেই হউক—আর যে জন্যই হউক, তাহা আর পুনর্মুদ্রিত হয় নাই—সুতরাং তাহাও এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। সম্প্রতি আর একখানি কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর প্রকাশত হইয়াছে। কিন্তু তাহাও সাধারণে আদৃত হয় নাই। বোধ হয় সাধারণ লোকে কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দরের অনেক স্থল বুঝিতে পারে না বলিয়াই, তাহারা এরূপ উৎকৃষ্ট কাব্যের এত অনাদর করিয়াছে।

এখন কথা হইতেছে, যাহা কালের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে—অথবা ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহাকে কি আবার ফিরাইয়া আনা সম্ভব? যে কাব্য কালের ভীষণ অগ্নি পরীক্ষায় পরীক্ষিত হইয়া শেষে অমরত্ব লাভ করিয়াছে—তাহাই সাহিত্য জগতে চিরকাল সাদরে রক্ষিত হইবে। নতুবা যে কাব্য কালের দারুণ নিষ্পেষণে একেবারে দলিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহাকে পুনরুদ্ধার করিবার প্রয়োজন কি?

ইহার উত্তরে কবিরঞ্জন-কাব্য-সংগ্রহকার বলিয়াছেন, "ইহা একটি সাধারণ নিয়ম যে, কোন জাতির রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, রুচি ও ধর্ম্মভাব প্রভৃতি যখন যে ভাব প্রবর্দ্ধিত হয়, তখন সেই গুলি সেই জাতীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ কাব্যাদিতে প্রায় ঠিক সেই ভাবেই প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। সুতরাং

আমরা কোন একখানি লব্ধ প্রতিষ্ঠ কাব্য যে সময়ের—তাহাতে সাধারণের ঠিক সেই সময়ের সমাজচ্ছবি দেখিতে পাই। এবং তাহা হইতে তৎকালীন লোকের মানসিক ভাবোন্নতির সীমাও নির্দ্ধারণ করিতে পারি। এতদ্ভিন্ন কোন সময়ের কাব্যে কোন সময়ের সমাজচ্ছবি দেখিয়া, এই জাতির এই প্রথায় উন্নত অথবা এই জাতি এই প্রথায় অবনত হইয়াছিল, এইরূপ আলোচনা করিয়া বর্ত্তমানে আমরা আমাদিগের কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে পারি। অতএব ভাষার ইতিহাস জন্য সেই ভাষার প্রাচীন সাহিত্যাদি সুরক্ষিত ও সাধারণে প্রচারিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।" আমরা ভারতচন্দ্রের কাব্য সমালোচনায় বলিয়াছি যে, "সাহিত্যই সমাজের ইতিহাস, সাহিত্যই সমাজের জীবন। স্মৃতি যেমন অতীতকে ভবিষ্যতের সহিত বাঁধিয়া রাখে—স্মৃতি যেমন আমাদের আমিত্বকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে—ইতিহাস ও সাহিত্য সেইরূপ সমাজের সমাজত্ব, জাতির জাতীয়ত্ব বজায় রাখে। এই জন্য যাহা দেশের সাহিত্যের অন্তর্গত, যাহাকে Classic literature বলে, তাহা কোন কারণেই ত্যাগ করা যায় না।"

সুধু তাহাই নহে—যে মহাভক্ত, মহাসাধক রামপ্রসাদ বাঙ্গালীর এরূপ আদরের ধন—যাঁহার পদাবলী সাহিত্যজগতে অত্যুজ্জ্বল মণি—সেই রামপ্রসাদের কবিত্ব, পাণ্ডিত্য, মনোভাব প্রভৃতি জানিতে হইলে তাঁহার বিদ্যাসুন্দর পড়িতে হয়—বিদ্যাসুন্দর না পড়িলে আমরা সম্পূর্ণ রামপ্রসাদকে বুঝিতে পারি না। সুতরাং যেমন বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস, বাঙ্গালী জাতীর ইতিহাস বুঝিতে হইলে—কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর পাঠ করা আবশ্যক—সেইরূপ রামপ্রসাদকে সম্পূর্ণরূপে চিনিতে হইলে তাঁহার বিদ্যাসুন্দর পড়াও নিতান্ত প্রয়োজন।

আর এক কথা। কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর যে এক খানি শ্রেষ্ঠ কাব্য তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সে কাব্য যে কালের স্রোতে ভাসিয়া যাইবে, এ আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। রত্ন যখন সমুদ্র গর্ভে লুকাইত থাকে, পদ্মরাগ মণি যখন খনির

তিমির গর্ভে নিহিত থাকে—তখন তাহা সাধারণে দেখিতে পায় না বলিয়া কি তাহাকে নিকৃষ্ট বলা যায়? সুতরাং যাঁহারা কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর এতদিন সাধারণে আদৃত হয় নাই বলিয়া, তাহা নিকৃষ্ট কাব্য ও সেই জন্য তাহা পুনরুদ্ধারের আবশ্যক নাই এরূপ মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। সকল শ্রেষ্ঠ কাব্যই কোন না কোন সময়ে এইরূপ বিস্মৃতির তিমির গর্ভে লীন হইয়া যায়—চক্রের পরিবর্ত্তনের ন্যায় যুগভেদে, শিক্ষা ও সংস্কারের পরিবর্ত্তনের সহিত সে সকল কাব্যেরও অদৃষ্ট চক্র পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। যখন রোম রাজ্য ধ্বংস হইয়া ইউরোপে তমোযুগ Dark Age আরম্ভ হইল—তখন কয়জন লোক ইলিয়ড্, অডেসি, ওভিড, কেটালস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ল্যাটিন কবিদিগের কাব্য পড়িত? পর্ব্বতগুহায় সংসার-ত্যাগী মঙ্কদের নিকট সেই সকল পুস্তক লুকাইত থাকিত—লোকে তাহাদের নাম পর্য্যন্তও জানিত না। বিলাতের এমন যে সেক্ষপীয়র, তাহাই কতকাল পিউরিট্যান ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের জ্বালায় লোকের অপাঠ্য হইয়াছিল। আমাদের এ হেন কালিদাসের কাব্যও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কাছে কেবল "উপমা কালিদাসস্য" বলিয়া আদৃত ছিল। সুতরাং কালবিশেষে কাব্য বিশেষের প্রতি লোকে অনাদর করিয়াছে বলিয়া তাহাই সে কাব্যের নিকৃষ্টতা সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ হয় না।

সে যাহা হউক কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর কোন শ্রেণীর কাব্য তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে দুই একটা দৃষ্টান্ত দিয়া, কাব্যের অন্তর্গত সৌন্দর্য্য দেখাইয়া সে কথা পরীক্ষা করা যাউক।

কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। ভারত ও প্রসাদ, দুই জন শ্রেষ্ঠ কবিই বিদ্যাসুন্দর কাব্য লিখিয়াছেন। ইহা ব্যতীত প্রাণরাম চক্রবর্ত্তী নামক আর একজন বাঙ্গালী কবি ইহাঁদের বহুকাল পূর্ব্বে কালিকামঙ্গল নামক কাব্যে এই বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান সন্নিবেশিত করেন। এখন কথা হই-তেছে এই উপাখ্যানের মূল কোথায়? এ সম্বন্ধে পণ্ডিত রাম-

গতি ন্যায়রত্ন মহাশয় অনেক অনুসন্ধান করিয়া যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

"বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানটী রামপ্রসাদের স্বকপোল-কল্পিত নহে। অনেকের বিশ্বাস এই যে, বররুচিকৃত এক খানি প্রাচীন পুস্তক আছে। বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান তাহাতে বর্ণিত আছে। আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও সে পুস্তক পাইলাম না। জিলা যশোহরের অন্তঃপাতি বাগের হাটের স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু পঞ্চানন ঘোষ মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক সুন্দর কাব্য নামে দ্বাদশ সর্গে বিভক্ত একখানি সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তাহা বররুচিকৃত প্রাচীন গ্রন্থ নহে। একজন আধুনিক বঙ্গদেশীয় কবির বিরচিত। এ গ্রন্থে কবিত্ব শক্তির পরিচয় বিলক্ষণ আছে, কিন্তু উপাখ্যানাংশে তত বৈচিত্র্য নাই—তজ্জন্য উহা রামপ্রসাদ বা ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ দেখিয়া রচিত হইয়াছে—এরূপ অনুমান করা যায় না। যেহেতু তাহা হইলে উহাঁদের গ্রন্থে উপাখ্যানাংশে যে সকল বৈচিত্র্য আছে তাহা তিনি কখন ছাড়িতেন না। বরং এরূপও কতক বোধ হয় যে, রামপ্রসাদ ঐ গ্রন্থ বা ঐরূপ কোন গ্রন্থ দেখিয়াই কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছিলেন; কারণ ঐ উভয় পুস্তকের অনেক অংশে ঐক্য আছে। স্থূলকথা এই যে, উক্ত গ্রন্থ-বর্ণিত উপাখ্যানের সহিত বিদ্যাসুন্দরের চলিত উভয়বিধ উপাখ্যানেরই বৈলক্ষণ্য নাই। তবে হীরার স্থলে বিমলা, গঙ্গারামের স্থলে মাধব, বাঘাইয়ের স্থলে রাঘব ইত্যাদি কয়েকটি নামঘটিত যাহা বৈলক্ষণ্য আছে, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। কিন্তু চোরধরা প্রকরণে কবিরঞ্জন ও গুণাকরের যে দুইরূপ কৌশল আছে, উহাতে তাহার কোন রূপই নাই। সুন্দর ও বিদ্যার পরিচয়দান স্থলে ও বিচার সময়ে উক্ত দুই বিদ্যাসুন্দরেই যে সংস্কৃতশ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে—উহাতে সে শ্লোকগুলি নাই। কিন্তু সে স্থলে অপরবিধ শ্লোক রচিত হইয়াছে। চোরপঞ্চাশৎ নামক শ্লোকের একটীও উহাতে নাই—তবে ২।৪টী কবিতায় চোরপঞ্চাশদ্বর্ণিত কোন কোন

শ্লোকের ভাব লক্ষিত হয় এইমাত্র। ফলতঃ উক্ত সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর হইতে ভাষা দুই খানিই বিদ্যাসুন্দর রচিত হইয়াছে—কি ভাষা বিদ্যাসুন্দরের অন্যতরকে অবলম্বন করিয়া ঐ "সুন্দর কাব্য" রচিত, তাহার কোন স্পষ্টপ্রমাণ পাওয়া যায় না।

সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরের আরও একখানি হস্তলিখিত প্রাচীন পুস্তক আমরা পাইয়াছি এখানি অতি ক্ষুদ্র, ইহাতে কোন পর্ব্বতে অবস্থিত রাজকন্যা বিদ্যার সহিত সুন্দরের উক্তি প্রত্যুক্তি, উভয়ের গোপনে সমাগম বিহার ও রাজসমীপে তাহা প্রকাশিত হওয়ায় সুন্দরের প্রতি দণ্ডদানোদ্যম পর্য্যন্ত ৫৬টী শ্লোকে বর্ণিত আছে। বর্দ্ধমান বীরসিংহ প্রভৃতির কোন কথা নাই। এ পুস্তকের গ্রন্থকারের নাম নাই, কিন্তু ইহা বররুচি প্রণীত সেই পুস্তক কি না—তদ্বিষয়ে আমাদের সংশয় আছে। যাহা হউক রচনাদৃষ্টে এখানিকে আধুনিক বলিয়া বোধ হয় না। সুন্দরের পরিচয় ও বিচার স্থলে পূর্ব্বোক্ত দুই ভাষাপুস্তকেই যে সংস্কৃত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, ইহাতেও সেগুলি এবং সেইরূপ আরও কতকগুলি আছে—সুতরাং ঐ শ্লোকগুলি ভাষাপুস্তকরচয়িতার যে কাহারও নিজের রচিত নহে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা ব্যতীত আমরা "বররুচিবিরচিতং সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরম্" নামে একখানি মুদ্রিত পুস্তক প্রাপ্ত হইলাম। উহা আমাদিগের উল্লিখ্যমান এই গ্রন্থেরই প্রায় অবিকল। কেবল উহাতে চোরপঞ্চাশৎটী অধিক আছে। আমাদের নিকটস্থিত হস্তলিখিত চোরপঞ্চাশতের শ্লোকগুলি একেবারে নাই। ফল কথা সমুদয় দেখিয়া শুনিয়া আমাদের বিলক্ষণ প্রতীতি হইয়াছে—যে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান রামপ্রসাদ বা ভারতচন্দ্র কাহারই স্বকপোলকল্পিত নহে। অবশ্যই উহার কোন প্রাচীন মূল ছিল। কিন্তু সেই মূলখানি কোন গ্রন্থ—তাহা স্থির বলিতে পারা যায় না।

অনেকে কহিয়া থাকেন যে, রামপ্রসাদের পূর্ব্বেও প্রাণরামচক্রবর্ত্তী নামে এক কবি বররুচি প্রণীত প্রাচীন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া কালিকামঙ্গল নামে এক কাব্য রচনা করিয়া-

ছিলেন; তাহাতেও বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান বর্ণিত আছে। রামপ্রসাদ সেই উপাখ্যানকে আদর্শ করিয়া কবিরঞ্জন রচনা করেন—কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, আমরা বিবিধ চেষ্টা করিয়াও কালিকামঙ্গলের একখণ্ড পাইলাম না—সুতরাং সে বিষয়ে কোন কথা বলিতে পারা গেল না। কিন্তু এস্থলে একথা অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, কবিরঞ্জন নিজ গ্রন্থ-মধ্যে রাজসমক্ষে বিদ্যার রূপাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে যে পাঁচটী শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন, এবং ভারতচন্দ্র ঐস্থলে যে ৫০ টী শ্লোক 'চোরপঞ্চাশৎ' নামে তুলিয়া তাহার দুইপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ঐ শ্লোকগুলি বৰ্দ্ধমানাস্থিত সুন্দরচোরের রচিত নহে। ঐ সকল শ্লোক 'চোর' নামক একজন প্রাচীন কবির রচিত। জয়দেব প্রসন্নরাঘব নাটকের প্রথমে ঐ চোরের নামোল্লেখ করিয়াছেন যথা—

যস্যাশ্চোরশ্চিকুরনিকরঃ কর্ণপূরো ময়ূরো
হাসো হাসঃ কবিকুলগুরুঃ কালিদাসো বিলাসঃ॥
হর্ষো হর্ষো হৃদয়বসতিঃ পঞ্চবাণস্তু বাণঃ
কেষাং নৈষা কথয় কবিতাকামিনী কৌতুকায়॥

এতদভিন্ন আরও প্রাচীন শ্লোক আছে—যথা—

"কবি রমরঃ কবি রমরুঃ কবী চোর ময়ূরকৌ।" ইত্যাদি। যাহা হউক, ঐ চোরকবির প্রকৃত নাম বিহ্লণ; তিনি বিন্ধ্য পর্ব্বতের সমীপস্থ কোন দেশে ৮০০ বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ দেশের কোন রাজকন্যার অধ্যাপনা কার্য্যে তিনি ব্রতী ছিলেন। ক্রমে উভয়ের প্রণয়বদ্ধ হওয়ায় গোপনে গান্ধর্ব্ব বিবাহ হয়—রাজা তাহা জানিতে পারিয়া বিহ্লণকে বধ করিবার জন্য শ্মশানে পাঠাইলে, তিনি তথায় বসিয়া ঐ সকল শ্লোক রচনা করেন। এক্ষণে কালিকা মঙ্গলকারই হউন, বা রামপ্রসাদই হউন, প্রথমে ঐ শ্লোক তাঁহাদের বর্ণনীয় বিষয়ের উপযোগী দেখিয়া, নিজ গ্রন্থ মধ্যে নামান্তরে প্রবেশিত করিয়াছেন।"

বিদ্যাসুন্দরের ঘটনা স্থান সম্বন্ধে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়-

বসু মহাশয় লিখিয়াছেন "কিন্তু যেরূপ শুনা যায়, তাহাতে বোধ হয় বিদ্যাসুন্দরের কাণ্ড উজ্জয়িনী নগরে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া বররুচি কর্ত্তৃক বর্ণিত আছে। পূর্ব্বোক্ত 'সংস্কৃত 'সুন্দর কাব্য' রচয়িতা যে কেহই হউক না কেন, বোধ হয় প্রথমে উহাকে দূর দেশ হইতে আপন দেশ বর্দ্ধমানে আনিয়া স্থাপিত করেন। তৎপরে রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র দেশের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, তাহার অন্যথা করিতে পারেন নাই, যাহা হউক উক্ত কয়েক খানি গ্রন্থ রচনার পূর্ব্বে বর্দ্ধমানে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান ও সুড়ঙ্গের কথা প্রচারিত ছিল। তাহা আমাদের বোধ হয় না। এমন কি বোধ হয় ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল রচনার পর হইতেই লোকে ঐ কল্পিত কাণ্ডের ক্রমে ক্রমে স্থানসমাবেশ করিয়া দিয়াছে।"

সুতরাং স্পষ্টই বুঝা গেল যে, কবিরঞ্জন ও গুণাকরের মধ্যে কেহই কাহার নিকট মূল উপাখ্যান সংগ্রহ করেন নাই। কিন্তু তাহা না হইলেও কোন্ বিদ্যাসুন্দর অগ্রে রচিত— তাহা দেখা কর্ত্তব্য। নতুবা আমরা কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দরের কাব্যগত সৌন্দর্য্যের প্রকৃত বিচার করিতে পারিব না।

পূর্ব্বে কবিগণ তাঁহাদের কাব্যশেষে হেঁয়ালি দ্বারা কাব্যরচনার সময় লিখিয়া রাখিতেন। তাহা ধরিয়াই সেই সকল কাব্যের রচনা কাল নির্ণয় হইত। ভারত অন্নদামঙ্গলের শেষে বলিয়াছেন,

"বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥"

এই হেঁয়ালী ভাঙ্গিলে বুঝা যায় যে, ১৬৭৪ শকে বা ১৭৫১ খৃীঃ অব্দে তাঁহার অন্নদামঙ্গল রচনা শেষ করেন।

অনেকে বলেন ভারতের বিদ্যাসুন্দর অন্নদামঙ্গল সহিত, একত্র রচিত হয় নাই—তাহা পরে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। কিন্তু কথাটা বিশেষ সঙ্গত হয় না। যদিও বিদ্যাসুন্দর প্রসঙ্গত মানসিংহে উল্লিখিত হইয়াছে—কিন্তু আমরা অন্নদামঙ্গলের সমালোচনায় দেখাইয়াছি যে বিদ্যাসুন্দর ব্যতীত অন্নদামঙ্গলের

অষ্টাহ পালা সম্পূর্ণ হয় না। বিশেষতঃ কবি মানসিংহের শেষ অষ্টাহমঙ্গল পালার সংক্ষেপ উল্লেখ করিবার সময় বিদ্যাসুন্দরের দুই পালা-গানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন,এবং ঠিক সেই খানেই অন্নদামঙ্গল শেষ করিবার সময় হেঁয়ালিতে লিখিয়াছেন। সে সময়ে অষ্টমঙ্গলা গান রচনা করাই কবিদিগের রীতি ছিল। কবিকঙ্কণ চণ্ডী হইতেই এই প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। কবি-রঞ্জন যে বিদ্যাসুন্দর লিখেন, তাহাও তাঁহার অষ্টমঙ্গলা গানের অন্তর্গত। সুতরাং ভারত যে এই প্রসিদ্ধ পথ পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে পাঁচ পালায় তাঁহার অন্নদামঙ্গল শেষ করিয়াছিলেন, এবং পরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধে বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়া অন্নদামঙ্গলের স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন করিয়া তবে তন্মধ্যে তাহা সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন, ইহা কখন সম্ভব নহে। বিশেষতঃ তখন সংস্কৃত বা বাঙ্গালায় অনেকগুলি বিদ্যাসুন্দর কাব্য বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। সুতরাং সে সময়ে ভারত বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান বেশ জানিতেন। এই সকল কারণে স্পষ্টই বুঝা যায় যে ভারত অন্নদামঙ্গলের সহিতই তাঁহার বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ১৬৭৪ শকে ভারত অন্নদামঙ্গল শেষ করেন। তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে তিনি এক বৎসরে এই সুবৃহৎ অন্নদামঙ্গল রচনা শেষ করেন। তাহা হইলে ১৬৭৪ শকে বা ১৭৫১ খ্রীঃ অব্দের ভারত যে তাঁহার বিদ্যাসুন্দর রচনা শেষ করেন—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কবিরঞ্জন যদি বিদ্যাসুন্দরের শেষে কোন রূপ হিঁয়ালীতে তাঁহার কাব্য লেখার সময় নির্দ্দেশ করিয়া যাইতেন, তবে কোন গোলযোগ হইত না। সেকালে সকল কবিদিগের মধ্যেই এই প্রথা প্রচলিত ছিল; কিন্তু কবিরঞ্জন কেন যে পথ ত্যাগ করিয়াছেন তাহা বলা যায় না। বোধ হয় তাঁহার বৃহৎ অষ্টমঙ্গলা কাব্যের শেষে বা অন্য কোন স্থানে এইরূপে সময় নির্দ্দেশ করা ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা এক্ষণে আর পাইবার উপায় নাই। একারণ তাঁহার বিদ্যাসুন্দর

কাব্যের রচনা সময় নির্দ্দেশ করা বড় কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এইরূপ স্থলে কাব্যের সময় নির্দ্দেশ করিতে হইলে সাধারণতঃ দুইটী উপায় অবলম্বন করা যায়। এক কাব্যের ছন্দাদি বিচার বা Internal evidence আর দ্বিতীয়, আনুসঙ্গিক অবস্থা বিচার বা External evidence। যতদূর সম্ভব, আমরা এস্থলে এই সকল মীমাংসা করিব।

এ সম্বন্ধে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়, তাঁহার বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে বলিয়াছেন, কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর "কোন্ শকে রচিত হইয়াছে তাহা স্থির বলা যায় না। কিন্তু ইহা নিশ্চয়ই বোধ হয় যে, কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল রচনার ২।১ বৎসর পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল। অন্নদামঙ্গল ১৬৭৪ শকে সমাপ্ত হইয়াছে, একথা তদ্গ্রন্থেই উল্লিখিত আছে, সুতরাং কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর ১৬৭০। ৭২ শকে রচিত হইয়াছে, অনুমান করা যাইতে পারে। এস্থলে কেহ কেহ বিপরীত অনুমানও করিয়া থাকেন—তাঁহাদের মতে কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর অন্নদামঙ্গলের পর রচিত। কিন্তু একথা কোন রূপেই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। যেহেতু অন্নদামঙ্গলের অন্তর্গত বিদ্যাসুন্দরের রচনা, কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দরের রচনা অপেক্ষা অনেক মধুর, অনেক চাতুর্য্যসম্পন্ন ও অনেক উৎকৃষ্ট। অতএব তাহা বিদ্যমান দেখিয়াও কবিরঞ্জনের রচনা প্রবহমান নদীসন্নিধানে সরোবর খননের ন্যায় নিতান্ত অবিজ্ঞের কার্য্য হয়। মহাকবি রামপ্রসাদ তত অবিবেচক ও অসহৃদয় ছিলেন ইহা সম্ভব হয় না। বরং এইরূপ সম্ভব যে, রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে প্রদান করিলে তিনি উহা পাঠ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হয়েন, কিন্তু উহাকে আরও বিশোধিত ও সুমধুর করিবার অভিপ্রায়ে স্বীয় সভাসদ্ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের হস্তে সমর্পণ করেন। রায়গুণাকর উহা বিশোধিত না করিয়া ঐ মনোরম উপাখ্যানকে অস্থিস্বরূপ অবলম্বনপূর্ব্বক

মাংসাদি যোজনা করিয়া নিজে এক বিদ্যাসুন্দর লেখেন, এবং তাহা কৌশলক্রমে অন্নদামঙ্গলের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া দেন, এবং রচনামুখে উপাখ্যানাংশেও যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করেন। সে পরিবর্ত্তন প্রধানতঃ এই—কবিরঞ্জনের হীরামালিনী, বিদ্যা ও সুন্দরের পরস্পর সন্দর্শনাদির পর, তাঁহারা যেরূপে গোপনে মিলিত হইয়াছিলেন, তৎসমস্ত অবগত ছিল—রায়গুণাকরের মালিনী সমাগমের বিষয় কিছুই জানিত না, এবং কবিরঞ্জন বিদ্যার গৃহ ও শয্যায় সিন্দূর মাখাইয়া চোর ধরিবার উপায় করিয়াছিলেন, রায়গুণাকর বিদ্যাকে বাসগৃহ হইতে স্থানান্তরে পাঠাইয়া, কোটাল ও তাহার ভ্রাতাদিগকে স্ত্রীবেশে সেই গৃহে রাখিয়া মহারসিকতাসহকারে চোরকে গ্রেফ্‌তার করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন সুন্দরের পরিচয় দিবার জন্য শারী শুক দুইটী গুণাকরের নিজের পোষাপক্ষী। এ ছাড়া আর আর যে বিভিন্নতা আছে তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে।”

এই কথা সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে বলা আবশ্যক যে, ভারত পরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায় বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়া কৌশলক্রমে তাহা অন্নদামঙ্গলের অন্তঃর্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, এমত আমাদের নিকট সঙ্গত বোধ হয় না।

সে যাহা হউক যদি ১৬৭৪ শকে ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর লিখিয়াছেন স্থির হইল, তবে সে সময়ে কবিরঞ্জনের বয়স কত দেখা যাউক। আমরা কবিরঞ্জনের জীবনীতে দেখাইয়াছি যে ১৬৪২ শকে কবিরঞ্জন জন্মগ্রহণ করেন। অন্ততঃ ১৬৪০-১৬৪৫ শকের মধ্যে যে তিনি জন্মিয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাহা হইলে যখন ভারত তাঁহার বিদ্যাসুন্দর লিখেন, তখন কবিরঞ্জনের বয়স ৩২ বৎসরের বড় অধিক হইবে না। সুতরাং যদি কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দরের ভারতের বিদ্যাসুন্দরের পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে ধরা যায়—তবে বলিতে হইবে যে কবিরঞ্জন ২৮ বা ৩০ বৎসর বয়সের সময়ই তাঁহার

বিদ্যাসুন্দর লেখা শেষ করিয়াছিলেন। এ কথা কতদূর সঙ্গত দেখা যাউক।

কবিরঞ্জনের জীবনীতে দেখান হইয়াছে যে, তিনি ২০ বৎসরের অনধিক বয়সে মুহুরিগিরি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, মাসিক ৩০৲ টাকা বৃত্তি পাইয়া স্বগ্রাম কুমারহট্টে আসিয়া নিজ ইষ্টদেবী কালী আরাধনায় নিযুক্ত হন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ১৬৩৪ শকে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং তিনি ভারতের সমবয়স্ক ও কবিরঞ্জন অপেক্ষা আট বৎসরের বড় ছিলেন। কুমারহট্টে মহারাজের বায়ুসেবনালয় ছিল। সুতরাং তিনি যে যৌবনে—বিলাসের সময়, প্রতি বৎসর এই স্থানে বেড়াইতে আসিতেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার মত গুণগ্রাহী কাব্যরসজ্ঞ লোকের নিকট যে কবিরঞ্জন অধিক দিন অপরিচিত ছিলেন তাহা বোধ হয় না। সুতরাং কবিরঞ্জনের কুমারহট্টে আসিবার অল্প কাল পরেই যে তাঁহার সহিত মহারাজ কৃষ্ণ-চন্দ্রের আলাপ হয় তাহা নিশ্চয়। অন্নদামঙ্গল রচিত হইবার এক বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৬৭৩। ৭৪ শকে যে ভারতের সহিত মহারাজের প্রথম পরিচয় হয়, তাহা তাঁহার জীবনী পাঠেই পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা হইলে যখন কবিরঞ্জনের সহিত মহারাজের আলাপ, তখন ভারতের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল না। সুতরাং মহারাজ যে কবিরঞ্জনের গুণের পরিচয় পাই-বার অল্পকাল পরেই তাঁহাকে ভূমি ও উপাধি দান করিয়া-ছিলেন, তাহা নিশ্চয় রূপে বলা যাইতে পারে।

কবিরঞ্জন এ সময়ে সুধু ভক্ত সাধক, সঙ্গীত রচয়িতা বা গায়ক ছিলেন না, তখন তিনি এক জন বিলক্ষণ রসজ্ঞ কবিও ছিলেন। অতএব সে সময়ে মহারাজের অনুরোধেই হউক, আর যে কারণেই হউক, তিনি আট পালায় কালীমঙ্গল ও তৎসহ বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়া মহারাজকে উপহার দিয়াছিলেন তাহাই সম্ভব। অতএব এ হিসাবে ধরিলে কবিরঞ্জন বিদ্যা-সুন্দর যে ভারতের বিদ্যাসুন্দরের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল তাহা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

কবিরঞ্জন ও রায়গুণাকরের জীবনের ঘটনা গুলির তুলনা করিয়া যেরূপ সিদ্ধান্ত করা যায়, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল।

ঘটনা	শক	খ্রীঃ অব্দ	বাং শাল।
ভারতের জন্ম	১৬৩৪	১৭১০	১১১৯
রামপ্রসাদের জন্ম	১৬৪২	১৭১৮	১১২৭
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম	১৬৩৪	১৭১০	১১১৯
বর্গীর হাঙ্গাম আরম্ভ	১৬৬৪	১৭৪০	১১৪৯
শেষ বর্গীর হাঙ্গামা এবং বার লক্ষ টাকারজন্য কৃষ্ণচন্দ্রের কারাবাস	১৬৭৪	১৭৪১	১১৫৯
ভারতে অন্নদামঙ্গল রচনা শেষ	১৬৭৪	১৭৫১	১১৫৯
ভারতের মৃত্যু	১৬৮২	১৭৫৯	১১৬৭
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যু	১৭০৫	১৭৮২	১১৯০
রামপ্রসাদের মুহুরিগিরি ত্যাগ (অনুমান)	১৬৬২	১৭৩৮	১১৪৭
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট সম্মান প্রাপ্তি (অনুমান)	১৬৬৭	১৭৪৩	১১৫২
কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর রচনা (অনুমান)	১৬৭০-২	১৭৪৬-৮	১১৫৫
শেষে মহারাজের নিকট ১৪ বিঘা ভূমি প্রাপ্তি	১৬৮০	১৭৫৭	১১৬৫

ইহা ব্যতীত কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দরের অনেক স্থান হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ইহা গ্রন্থকারের নবীন বয়সের লেখা। এস্থলে তাহার কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া হইল।

১। কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দরে যেরূপ অনুপ্রাসের ছটা, শব্দের ঘটা, প্রভৃতি দোষ দেখা যায়, তাঁহার পদাবলীতে সেরূপ দোষ আদৌ লক্ষিত হয় না। পদাবলী পাঠে দেখা যায় যে তিনি আদৌ ভাষার দিকে, কথার দিকে দৃষ্টি রাখেন নাই - ভাব লইয়াই তিনি ব্যস্ত ছিলেন। ভাষা—ভাবের পরিচারিকার ন্যায়, সর্ব্বদা তাঁহার অনুবর্ত্তী ছিল। সকলেই জানেন নবীন বয়সেই শব্দ, ভাষা, অনুপ্রাস প্রভৃতির দিকে কবিদিগের মন অধিক আকৃষ্ট হয়। সুতরাং বিদ্যাসুন্দরের যে, কবিরঞ্জনের নবীন বয়সের লেখা ইহা হইতেই তাহা অনুমান করা যায়।

২। বোধ হয় এই বিদ্যাসুন্দর লিখিবার অতি অল্প কাল পূর্ব্বেই তিনি কবিরঞ্জন উপাধি পাইয়াছিলেন। কেননা "নিশাকালে চরিতার্থ শ্রীরঞ্জন যথা," প্রভৃতি অনেক স্থলেই ভণিতায় তিনি এই উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার পদাবলীতে কখন 'প্রসাদ' ব্যতীত 'রঞ্জন' বা কবিরঞ্জন ভণিতা দেওয়া নাই।

৩। কবিরঞ্জন পরে সাধনায় সিদ্ধ" হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পদাবলী পাঠেই বেশ বুঝা যায়। কিন্তু তিনি যখন বিদ্যাসুন্দর লিখেন, তখন তাঁহার সাধনা সিদ্ধ হয় নাই— তখন তিনি নবীন সাধক ছিলেন মাত্র। বিদ্যাসুন্দরে তিনি কোন কোন স্থলে খেদ করিয়া বলিয়াছেন,

"ক্ষীণ পুণ্য দেখি বিড়ম্বনা কৈল শিবা।"

"আমি কি অধম এত বৈমুখ আমারে॥"

৪। কবিরঞ্জর বিদ্যাসুন্দরে অনেক হিন্দী পারসী শব্দ অবিকল সংস্কৃত বিভক্তিযুক্ত কথা ব্যবহার করিয়াছেন। অনেক স্থলে তিনি যুদ্ধ হিন্দিতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত তিনি অনেক সংস্কৃত শ্লোকের বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছেন। বাস্তবিক তাঁহার বিদ্যাসুন্দর পড়িলেই বেশ বুঝা যায় যে, তিনি, সুন্দরপুত্র পদ্মনাভের যেরূপ

বিদ্যাশিক্ষা বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার নিজের বিদ্যাশিক্ষাও প্রায় সেইরূপ ছিল ঃ—

বালক ত্বরায় ব্যাকরণ সায়
ভট্টি অভিধান গণ।
রঘু কুম্মারাদি, সাঙ্গ হল যদি
অলঙ্কারে দিল মন॥
কৃপান্বিতা চণ্ডী পাঠ করে দণ্ডী
তদনু কাব্যপ্রকাশে।
ন্যায় শাস্ত্রে ঘুন কত কব গুণ
কবি চিত্তে মহোল্লাসে॥
জ্যোতিষ পিঙ্গল সাংখ্য পাতঞ্জল
মীমাংসা বেদান্ত তন্ত্র।
কোন ক্ষোভ নাই জননীর ঠাঁই
নিল একাক্ষরী মন্ত্র॥

ইহার উপর ও তিনি হিন্দী পারসী শিখিয়াছিলেন, বোধ হয় তাঁহার পাঠশেষের অতি অল্প পরেই বিদ্যাসুন্দর লিখেন, নতুবা তাঁহার কাব্যে এত অধিক বিদ্যার পরিচয় দিতেন না।

৫। যখন কবি বিদ্যাসুন্দর লিখেন, তখন তাঁহার যৌবনোচিত চঞ্চলতা ছিল—তখনও তিনি তাঁহার বহির্ম্মুখী বৃত্তিগুলিকে সম্পূর্ণ সংযত করিতে পারেন নাই স্পষ্টই বুঝা যায়। সেই জন্য তিনি কাব্যের স্থানে স্থানে গ্রাম্য ও অশ্লীল বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার এ সকল বর্ণনা পাঠে বোধ হয় যে, তিনি তখন সংসারকে একেবারে তাচ্ছিল্য করিতেন—কোন দিকে দৃকপাত করিতেন না—মত্ত হস্তীর ন্যায়, ভক্তিমদে বিভোর হইয়াই হউক, আর যে জন্যই হউক, আপন মনে আপন গন্তব্য পথে চলিয়া যাইতেন। রাণীসহ বিদ্যার বাক্‌চাতুরী, গর্ভ শ্রবণে রাণীর বিদ্যা প্রতি ভৎর্সন, কোটালের চোর অন্বেষণে সজ্জা, চোর সুন্দরের রাজসভায় পাত্রের প্রতি কটূক্তি, এবং স্থানে স্থানে হিন্দী বদজবান পড়িলেই কবির নবীনত্বের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। বাস্তবিক কবির সুন্দ-

য়ের চরিত্রচিত্র পড়িলেই সে সময় কবির চরিত্রের কতক আভাষ পাওয়া যায়।

৬। কবি বিদ্যাসুন্দর রচনার সময়, যেমন ভক্ত, যেমন সঙ্গীতবেত্তা, তেমনি কাব্যপ্রিয়ও ছিলেন। এই কাব্যপ্রিয়তাই তাঁহার নবীন বয়সের পরিচয়। বোধ হয় রঘু কুমারাদি পড়িয়া কবির কাব্যস্পৃহা বড়ই বর্দ্ধিত হইয়াছিল। বাস্তবিক তাঁহার বিদ্যাসুন্দর পড়িলেই বেশ বুঝা যায় যে, তাঁহার চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলি অত্যন্ত স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল। তিনি যে অসাধারণ সঙ্গীত-ভক্ত ছিলেন, তাহা তাঁহার পদাবলীতেই প্রকাশ। আর তিনি বিদ্যাসুন্দরে স্পষ্টই বলিয়াছেন, " ন বিদ্যা সঙ্গীত পর।" তিনি বর্দ্ধমান বর্ণনায় তাঁহার কাব্যপ্রিয়তারও পরিচয় দিয়াছেন। বর্দ্ধমানের লোক সম্বন্ধে বলিয়াছেন,

" পরস্পর সুকৌতুক কাব্য ছাড়া একটুক
কদাচিত মুখে নাহি ভাষা।"

৭। কবির নবীনত্বের আর এক পরিচয় এই—এসময়ে তিনি নিজ বিদ্যা প্রকাশ করিতে বড়ই উৎসুক। তিনি শবসাধন বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছেন,

" জ্ঞাত নহি বলে কেহ না করিবে হেলা।"

সুধু তাহাই নহে। ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি তন্ত্রসার হইতে 'শবসাধন' ব্যাপার অবিকল বাঙ্গালা করিয়া উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। প্রবীণ বয়স হইলে কবি কখন এরূপ করিতেন না। সুধু বিদ্যা দেখাইবার জন্য যাহা বর্ণনা অকর্ত্তব্য এবং শাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ তাহা ব্যতিক্রম হইবে বুঝিয়াও কখন বর্ণনা করিতে পারিতেন না। ইহা ব্যতীত "অরসিক নিকটে রহস্য নিবেদন", "কালীকিঙ্করের কাব্য কথা বুঝা ভার" প্রভৃতি স্থানেও এই গর্ব্বের পরিচয় দিয়াছেন।

৮। কবি বিদ্যাসুন্দরে তাঁহার নিজ বংশাবলীর পরিচয় দিয়াছেন। তদনুসারে জানা যায় যে, সে সময়ে তাঁহার জগদীশ্বরী ও পরমেশ্বরী নামে দুই কন্যা, এবং রামদুলাল

নামে এক পুত্র হইয়াছিল। এই সময়ে তাঁহার কন্যাদের বিবাহ হয় নাই। তাহা হইলে ভণিতার কোন না কোন স্থানে তাঁহার জামাতার নাম উল্লেখ থাকিত। তাঁহার ভগিনী ভগিনীপতি ভগিনীসুত প্রভৃতি সকলের জন্যই ভণিতায় প্রার্থনা করিয়াছেন, কেবল তাঁহার নিজ জামাতার জন্য প্রার্থনা করিতে উপেক্ষা করিবেন ইহা সম্ভব নহে। সুতরাং বিদ্যাসুন্দর রচনা কালে তাঁহার সন্তানগণ অল্প বয়স্ক ছিল বেশ বুঝা যায়। কবির নবীন বয়সেই এই তিন সন্তান জন্মিয়াছিল সন্দেহ নাই। এই তিন সন্তানের পর তাঁহার সন্তান হওয়া বন্ধ হয়, এবং শেষে বৃদ্ধ বয়সে আর একটী মাত্র সন্তান জন্মে। (এই বৃদ্ধ বয়সের সন্তান উপলক্ষ করিয়াই আজু গোঁসাই তাঁহাকে রহস্য করিয়াছিল, তাহা তাঁহার জীবনীতে বলা হইয়াছে।) সুতরাং বিদ্যাসুন্দরে কবিরঞ্জনের তিনটী সন্তানের নাম থাকায়, তাহা যে তাঁহার নবীন বয়সের রচনা নহে, এরূপ অনুমান করা যায় না।

৯। বিদ্যাসুন্দর হইতে কবির জীবনী সম্বন্ধে আর একটী ঘটনার আভাষ পাওয়া যায়। আমরা তাঁহার জীবনীতে বলিয়াছি যে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাহার সহিত আলাপে প্রীত হইয়া তাঁহাকে নিজ পারিষদ করিবার ইচ্ছা করেন। কিন্তু কবি তাহাতে সম্মত হন নাই। ইহারই কিছুদিন পরে মহারাজ তাঁহাকে বৃত্তি দান করেন। বোধ হয় এই বিষয়ে কবির যে মনোভাব ছিল, তাহা বিদ্যাসুন্দরে উল্লেখ করিয়াই বলিয়াছেন—

"ক্ষিপ্ত সেই স্বধর্ম্ম খোয়ার খোসামোদে।"

আর বোধ হয় রাজার এই বৃত্তি দান প্রথা উল্লেখ করিয়াই বর্দ্ধমান রাজের দানশীলতার বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন,

"ভূপতির আস্থা আছে যাতায়াত নিত্য কাছে
চিরবৃত্তি সুখে করে ভোগ।"

যদি এই অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে এই ঘটনার

অব্যবহিত পরেই যে তিনি বিদ্যাসুন্দর লিখিয়াছিলেন, তাহা বলা যাইতে পারে। বাস্তবিক কবি যে মহারাজের নিকট এত উপকার পাইয়া, কৃতজ্ঞতা চিহ্ন স্বরূপ তাঁহাকে এই অপূর্ব্ব কাব্য উপহার দিতে অধিক দিন বিলম্ব করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের বোধ হয় না।

যাহা হউক এই সকল বিষয় হইতে এইরূপ স্থির করা যায় যে বিদ্যাসুন্দর কবিরঞ্জনের নবীন বয়সের লেখা। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার বিদ্যাসুন্দর যে ভারতের বিদ্যাসুন্দরের পূর্ব্বে লেখা হইয়াছিল, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ হইল না। কবিরঞ্জন ও রায় গুণাকরের জীবনের ঘটনায় তুলনা দ্বারা যতদূর সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। এক্ষণে কাব্যের রচনা প্রভৃতি হইতে যতদূর সিদ্ধান্ত হয় তাহাই দেখা যাউক।

এ সম্বন্ধে কবিচরিত রচয়িতা শ্রীযুক্ত হরি মোহন মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন, "কবিরঞ্জন প্রণীত বিদ্যাসুন্দর ভারতচন্দ্র বিরচিত বিদ্যাসুন্দরের অগ্রজ ইহা অনেকেই অবগত নহেন। উজ্জয়িনী অধীশ্বর মহারাজা বিক্রমাদিত্যের অন্যতম সভাসদ্ বররুচি প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থের আভাস গ্রহণ করিয়া প্রথমে প্রাণরাম চক্রবর্ত্তী, তৎপর কবিরঞ্জন এবং সর্ব্বশেষ গুণাকর স্ব স্ব কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। যে কোন বিষয়ই হউক না কেন, প্রথমোদ্যোগেই কথন তাহা নির্দ্দোষ হইতে পারে না। প্রাণরাম ও রামপ্রসাদ স্ব স্ব প্রণীত গ্রন্থে মূলের সহিত অনেক ঐক্য রাখিয়া গিয়াছেন, ভারতচন্দ্র তাহার দুই এক স্থান পরিত্যাগ করিয়া, নূতন কল্পনার সমাবেশ পুরঃসর নিজ গ্রন্থের উপাদেয়ত্ব সম্পাদন করিয়াছেন। গুণাকর যে চণ্ডীকাব্য, প্রাণরামের কালিকামঙ্গল, ও কবিরঞ্জনের বিদ্যাসুন্দরকে আদর্শ করিয়া তাঁহার অন্নদামঙ্গল রচনা করিয়াছেন, তাহার পরিচয় সেই গ্রন্থ পাঠেই বিশেষ উপলব্ধি হয়। ফলত দুই খানি বিদ্যাসুন্দর পর্য্যালোচনা করিলে নানা লক্ষণ দ্বারা কবিরঞ্জনকৃত বিদ্যাসুন্দরের প্রাথম্য বিলক্ষণ সপ্রমাণ হয়। গুণাকরের উপখ্যান ভাগ অপেক্ষা ইঁহার উপাখ্যান ভাগ অতি সরল ও অলঙ্কার

নাতি বিভূষিত। বর্ণনা বিষয়েও যে যে স্থানে গুণাকরের পারি-পাট্য ও চাকচিক্য, সেই সেই স্থানেই ইহার হীনতা দেখা যায়। তাঁহার পূর্ব্বজ না হইলে কবিরঞ্জনের রচনার কেন এত বৈলক্ষণ্য জন্মিবে? কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে দেখান। যদি ঐ বিষয়ের উৎকৃষ্টতর গ্রন্থ মহারাজের সভাসদ ভারতচন্দ্র কর্ত্তৃক পূর্ব্বে প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে রামপ্রসাদ কখনই উহা রাজাকে দেখাইতে সাহসী হইতেন না। এবং রাজাও কখন তাহা পাঠ করিয়া তাদৃশ প্রীতি লাভ করিতে পারিতেন না।"

কবিরঞ্জনের সহিত ভারতের উপাখ্যান ও বর্ণনাগত যে প্রভেদ আছে, তাহা আমরা সবিস্তারে দেখাইয়াছি। তবে ছন্দ সম্বন্ধে যে পার্থক্য আছে, তাহা দেখান হয় নাই। কবিরঞ্জন অপেক্ষা ভারতে অনেক নূতন ছন্দের বর্ণনা আছে—ছন্দের অনেক পারিপাট্য আছে, তাহা তুলনা করিলেই সহজে বুঝা যাইবে। কবিরঞ্জন অনেক নূতন ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন সত্য। তাঁহারা বিদ্যাসুন্দরে মালঝাপ, তোটক, নানারূপ ত্রিপদী, চতুষ্পদী, একাবলী, দিগক্ষরা, প্রভৃতি অনেক নূতন ধরণের ছন্দ প্রথম লক্ষিত হয় সত্য—কিন্তু ভারতে তাহা অপেক্ষা আরও অনেক নূতন ছন্দ, অতি পরিপাটী রূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ভারতে ধুয়া লইয়া অনেক বাড়াবাড়ি আছে—কবিরঞ্জনে তাহার প্রথম অঙ্কুর দৃষ্ট হয় মাত্র। আবার তাঁহার তোটক প্রভৃতি ছন্দে এত ছন্দপতন হইয়াছে—যে তাহা তাঁহার প্রথম রচনা বোধ হয়। নমুনা সম্মুখে থাকিলে কবিরঞ্জনের এত ছন্দ পতন হইত না। ভারত সেগুলি অনেক চাঁচিয়া ছুলিয়া মসৃণ করিয়া লইয়াছেন। ইহা দ্বারাও ভারতের রচনা যে কবিরঞ্জনের পরবর্ত্তী তাহা বেশ বুঝা যায়।

বাস্তবিক এইরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়া নিঃসংশয়রূপে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, কবিরঞ্জন ভারতের পূর্ব্বে বিদ্যা-সুন্দর লিখিয়াছিলেন। এই দুই বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানগত যে প্রভেদ আছে, এবং এক বিষয়ই দুই কবি কিরূপ বর্ণনা করিয়া

ছেন, তাহা আমরা টীকায় সবিস্তারে দেখাইয়া, তাহার তুলনা করিয়াছি। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সে যাহা হউক কোন প্রচলিত উপাখ্যান অবলম্বন করিয়াই হউক—আর তদ্রূপ অন্য একখানি কাব্য অবলম্বন করিয়াই হউক, যদি দুই জন উচ্চশ্রেণীর কবি এক বিষয় অবলম্বন করিয়া কাব্য লিখেন, তবে তজ্জন্য তাঁহাদের কবিত্বের কোন ক্ষতি হয় না—বা এক জন অপেক্ষা অপরকে হীন বলা যায় না। কবিরঞ্জনের বিদ্যাসুন্দর দেখিয়াই গুণাকর তাঁহার বিদ্যাসুন্দর লিখুন, অথবা ভারতের বিদ্যাসুন্দর দেখিয়াই কবিরঞ্জন তাঁহার বিদ্যাসুন্দর রচনা করুন, তাহাতে কোন কাব্যেরই শিল্প সম্বন্ধে কোন ক্ষতি হয় নাই। মহাভারতের শকুন্তলা উপাখ্যান হইতেই কালিদাস তাঁহার চিরপ্রসিদ্ধ শকুন্তলা নাটক লিখিয়াছিলেন। রামায়ণের রামচরিত অবলম্বন করিয়াই ভবভূতি তাঁহার বীর চরিত, উত্তরচরিত লিখিয়াছেন।

ফষ্টাসের জীবনী অবলম্বন করিয়া কবি মার্লো 'ফষ্টাস্' নাটক লিখেন; এবং তাহার কিছু দিন পরে গেটি তাঁহার প্রসিদ্ধ 'ফষ্ট'নামক নাটক লিখিয়াছেন। আবার কবি বাইরণ তদবলম্বনে তাঁহার ম্যানফ্রেড্ লিখিয়াছেন। প্রায় সকল মহাকবিই তাঁহাদের কাব্য লিখিতে, কোন না কোন রূপ মূল বা চলিত উপাখ্যান অবলম্বন করিয়াছেন দেখা যায়। কিন্তু তাহার জন্য কোন কবিরই শিল্পের হানি হয় নাই। যাঁহারা শিল্পী তাঁহারা উপকরণ নিজে গড়িয়া লন না। পরের উপকরণ লইয়া তাহারই সাহায্যে নিজের আশ্চর্য্য প্রতিভা বলে—এক অপূর্ব্ব পদার্থে সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সুতরাং কবি কোথা হইতে তাঁহার কাব্যের উপকরণ লইলেন, তাহা জানিবার বিশেষ আবশ্যক করে না। কেবল কবির "সৃষ্টি" ও "দৃষ্টি" দেখিয়াই কাব্য বিচার করিতে হয়। কাব্যের কবিত্ব বা তাহার শিল্প বিচার কালে আমাদের এই কথা মনে থাকা উচিত।

সমালোচন।

আমরা এস্থলে কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দরের বিস্তৃত সমালোচনা করিব না। তবে, অনেকের এরূপ ধারণা আছে যে, তাঁহার বিদ্যাসুন্দর ভারতের বিদ্যাসুন্দর অপেক্ষা নিকৃষ্ট। কোন কোন সমালোচক স্পষ্টই একথার আভাষ দিয়াছেন তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। সেই জন্য কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর কোন শ্রেণীর কাব্য তাহা দেখাইবার আবশ্যক হইয়াছে। যে হিসাবে ভারতের বিদ্যাসুন্দর কবিরঞ্জনের কাব্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহা আমরা প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছি। সাধারণ লোকে সুধু রসাত্মক বাক্যই কাব্যের প্রধান লক্ষণ মনে করেন। এবং ভারতের সেই রসের চরম উৎকর্ষ আছে বলিয়া, লোকে তাঁহার বিদ্যাসুন্দরকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকে।

কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দরে সে রসের যথেষ্ট সন্নিবেশ আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতের মত তাঁহার রসের ছড়াছাড় ঢলাঢাল নাই। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার বিদ্যসুন্দরে সকল রসেরই সুন্দর সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক একাধারে এত অল্পের মধ্যে এত ভিন্ন ভিন্ন রসের অবতারণা কয়জন কবি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আবার প্রত্যেক রসেরই স্থায়ীভাব, সঞ্চারিভাব, তাহার আলম্বন, উদ্দীপন অতি চমৎকাররূপে সন্নিবেশিত আছে। তবে প্রসাদগুণ থাকায় ভারতের বর্ণনা যেরূপ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে—তাহার সেরূপ হয় নাই। আমরা টীকার প্রায় প্রত্যেক স্থলেই কবিরঞ্জন ও ভারতের বর্ণনা তুলনা করিয়া দেখাইয়াছি। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখের আবশ্যক নাই।

আবার কবিরঞ্জনে যেমন রসের অবতারণার চমৎকার শিল্পচাতুর্য্য আছে—তেমনই তাঁহার অলঙ্কারের পারিপাট্যও যথেষ্ট আছে। ভারতের কাব্য যেন বড় ঘরের নববধু—আগা গোড়া জড়োয়া গহনা দিয়া মোড়া। বড় ঘরের মেয়ের যেমন টকটকে 'সর্ব্ব দোষহরা' গোরা রংটী আছে—ভারতের কাব্যের

সেরূপ লাবণ্যও আছে। সুতরাং এমন জড়োয়া গহনা মোড়া, বারাণসী সাটী পরা, টুক্‌টুকে ননীর পুতলীকে—কে না আদর করিবে। এরূপ সুন্দরী—তদ্রূপ গ্লাস্ কেসে রাখিয়া ‘আঁখি ভরি’ দেখিবার সামগ্রী বটে—কিন্তু তাহা ব্যবহারের উপযোগী নহে। কবিরঞ্জনের কাব্যে এত মূল্যবান অলঙ্কার নাই বটে—কিন্তু যাহা আছে তাহা বেশ গা সাজান—বেশ চলন সই। সুধু তাহাই নহে—তাঁহার কাব্যসুন্দরী এমনই রূপবতী যে অলঙ্কার না থাকিলেও তাহার শোভা—তাহার গৌরব অতুলনীয়। বাস্তবিক তাহা—

“সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবালেনাপিরম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্মলক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিক মনোজ্ঞাবল্কলেনাপি তন্বী
কিমিবহি মধুরানাং মণ্ডনেনাকৃতিনাং।”

ভারতের কাব্যসুন্দরী বিদ্যুৎ প্রভায় নয়ন ঝলসিত করে—কবিরঞ্জনের কাব্য ইলেক্‌ট্রিক্ লাইট্ বা গ্যাসের আলোর ন্যায় উজ্জ্বল, অথচ ব্যবহারোপযোগী।

পাঠকগণ কবিরঞ্জনের বিদ্যা ও সুন্দরের রূপবর্ণনা প্রভৃতি স্থান দেখিলেই বুঝিবেন—তাঁহার অলঙ্কার সন্নিবেশ কৌশল কেমন চমৎকার।

ইহাঁর—

“ডুবিল কুরঙ্গশিশু মুখেন্দু সুধায়।
লুপ্ত গাত্র তত্র মাত্র নেত্র দেখা যায়॥”

ইহাঁর—

“উথলে বিরহসিন্ধু ভাঙ্গে শান্তিসেতু।
মনোমীন ধরিল ধীবর মীনকেতু॥”

ইহাঁর

“চন্দ্র মধ্যে চন্দ্র দীপ্ত সুচন্দন বিন্দু।”

ইহাঁর—

“দ্বিগুণ বাড়িল প্রেম মাণিক্য জড়িত হেম
সেইরূপ ভাব দোঁহাকার।”

ইহাঁর—

"নয়নে নির্গত নীর নিশায় নিম্নগাতীর
নাথার্থে পদ্মিনী যেন জ্বরা।"

ইহাঁর—

"জলশৈবালের প্রায় মন নহে স্থির।
ক্ষণেক বিবেক ক্ষণে বিদরে শরীর॥"

ইহাঁর—

"ভূতলে আছাড়ে গা কপালে কঙ্কণ ঘা
বিন্দু বিন্দু বহে পড়ে রক্ত।
তাহে শোভা চমৎকার অশোক কিংশুক হার
গাঁথা চাঁদে যেন দিল ভক্ত॥"

ইহাঁর—

"অপরাহ্নে তরু ছায় অতি দূরতর যায়
সে যেমন ছাড়া নহে মূল।
অন্যমত ভাব পাছে মানস তোমার কাছে
থাকিল গমনে সেই তুল॥"

ইহাঁর—

"স্বপ্নরূপ কন্যাগুলা ভেঙ্গে গেল ধূলা খেলা"

প্রভৃতি চমৎকার উপমার তুলনা মিলে না।

বাস্তবিক কবিরঞ্জনের কাব্যের প্রায় সর্ব্বত্রই সৌন্দর্য্যের ছড়াছড়ি আছে। যিনি প্রকৃত গুণজ্ঞ, তিনি ব্যতীত আর কেহ সে সকল দেখিতে পান না। কবি জানিতেন যে, তাঁহার কাব্যরস সকলে বুঝিবে না—তাই বলিয়াছেন—

"অরসিক নিকটে রসস্য নিবেদন।
ততোধিক শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম হয় যে মরণ॥"

আমাদের দেশে এই অরসিকের দল কিছু বেশী ছিল বলিয়াই বোধ হয়—তাঁহার কাব্য এতদূর অনাদৃত হইয়াছে। তবে এরূপ অনাদর, এরূপ মরণ তাঁহার ইপ্সিত সন্দেহ নাই।

সে যাহা হউক, এ কাব্যের রস, গুণ বা অলঙ্কারের সম্বন্ধে আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই। আমরা সেগুলিকে

কাব্যের উপরিভাগ বা আনুসঙ্গিক বিষয় মনে করি, আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি কবি দ্রষ্টা ও স্রষ্টা। তিনি বাহ্য ও অন্তর্জ্জগতে স্তরের পর স্তর ভেদ করিয়া কোথায় কোন নূতন—কোন অজ্ঞাত সত্য নিহিত আছে, তাহাই বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবেন, তৎপরে সেই সকল সত্যগুলিকে বাছিয়া বাছিয়া তাহাদিগকে সৌন্দর্য্যের আবরণে সজ্জিত করিয়া—এক নূতন অদ্ভুত, মনোহর কল্পনাময় জগত সৃষ্টি করিবেন। সাধারণতঃ স্বভাব বর্ণনায় তাঁহার দৃষ্টি, আর কাল্পনিক চরিত্র সংগঠনে তাঁহার সৃষ্টি ক্ষমতা সহজেই বুঝা যায়। আমরা এই জন্য কবিরঞ্জনের স্বভাব বর্ণনা ও তাঁহার চরিত্র কিরূপ ছিল—তাহাই দেখাইব মাত্র। তাহা হইলেই কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর কোন শ্রেণীর কাব্য তাহা পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

কবিরঞ্জনের বিদ্যাসুন্দরের বর্ণনা যেরূপ সতেজ, সহজ, স্বাভাবিক ও ভাবব্যঞ্জক—সেরূপ বর্ণনা সাধারণ কাব্যে আদৌ পাওয়া যায় না। স্থানে স্থানে তাঁহার স্বভাব বর্ণনা অত্যন্ত সুমধুর। তাহা মনের মধ্যে এমনই স্পষ্ট করিয়া চিত্র আঁকিয়া দিতে পারে যে, পাষাণের রেখার ন্যায় তাহা কখনই বিস্মৃতির কালিমাময় আবরণে আবৃত হয় না। অনেক স্থলে অল্প কথায় এরূপ অধিক ভাব প্রকাশ করা আছে—এবং তাহা এরূপ চমৎকার ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে—যে সেগুলি চলিত কথা হওয়া উচিত। নিম্নে দুই একটা দৃষ্টান্ত দিই—

বিদ্যার গর্ভ সংবাদ শুনিয়া রাণী গোলযোগ করিবার উপক্রম করিলে সখিগণ বলিল,

"আপনার মান গো আপনি যত্নে রাখি।
লোকে বলে কাটা কান চুল দিয়া ঢাকি॥
আকাশে ফেলিতে ছেপ্ এসে গায়ে পড়ে।"

আর একস্থলে বিদ্যার গর্ভ সংবাদ শুনিয়া রাজা কোটালকে তিরস্কার করিলে সে বলিল—

"বিষ খেতে দেন মাতা ধনলোভে বেচে পিতা,
জাতিবাদ যদি দেয় দারা।

অবিচারে রাজদণ্ড গৃহ দহে বহ্নি চণ্ড
কি আছে ইহার আর চারা॥

আর একস্থলে কোটাল বিদ্যাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছে,

"গ্রামের সম্পর্ক যারে যা বলিয়া ডাকে তারে
সেই ভাব করণ কর্ত্তব্য।

একস্থলে আছে,

"বৃদ্ধকালে নানা জাতি সেবা করে সুত।
কত বা সন্তান জন্মে কত জন্মে ভূত॥"

একস্থলে আছে, মদন,

"পূর্ব্বে পোড়াইল হর হারাইল পঞ্চশর
তথাপিও জয়ী সর্ব্বদেশ।"

একস্থলে বিদ্যা, সুন্দরের বন্ধন দৃষ্টে খেদ করিয়া বলিয়াছে,

"প্রভু পূর্ব্বে প্রাণ বলে পশ্চাৎ পাবকে ফেলে
পলাইলা পাপে দিলা মন।
তোমার তুলনা তুমি তরুণ তরুণী আমি
ত্যাগ কর স্বদঙ্গজ জন॥"

বাস্তবিক কবিরঞ্জনের বর্ণনা বড় সতেজ ও হৃদয় গ্রাহী। আমরা এস্থলে তাহার দুই একটী মাত্র উদাহরণ দিই।

চোর অন্বেষণে যখন কোটাল মালিনীর বাড়ী সুড়ঙ্গ দেখিতে পায়, তখন সুড়ঙ্গ খনন করিয়া চোর ধরিবার পরামর্শ হয়। তখন 'বেগার' ধরা আরম্ভ হইল। পাঠক বর্ণনা দেখুন—

"খন্দক খনিতে করে কোটালে হুকুম।
সহরে পড়িল বড় বেগারের ধুম॥
যারে পায় তারে ধরে গালে মারে চড়।
পলাবে বলিয়া রাখে কাড়িয়া কাপড়॥
তখনি হাজার তিন আনিল কোদালি।
মজুরের নিঘাবনা পাঁচ শত ঢালি॥"

যখন সহরময় এইরূপ চোর ধরার সোর পড়িয়া গেল তখন,

সহরে গুজব উঠে একে এক শত।
গল্প বাড়ে বড়ই আঠার মেসে যত ॥
দরজায় বসে কেহ মগুল্যের ঠাট।
পথের মানুষ ডেকে লাগাইছে হাট ॥
এক সরা ভরা টিকা হুঁকা চলে দুটা।
পোয়া দেড় গুড়াকু তামাকু ঢেঁকীকুটা ॥
হেসে কহে তোমরা শুনেছ ভাই আর।
শুনিলাম এখনি আশ্চর্য্য সমাচার ॥
হাত কাটা একটা মানুষ গেল কয়ে।
চোরের সহিত নাকি ছিল দুটা মেয়ে ॥

এরূপ চমৎকার বর্ণনা আমরা আর কোথাও দেখি নাই। ইহাতে সে সময়ের নিষ্কর্ম্মাদের 'গাল' গল্প তামাকু প্রিয়তা গুজব রটনা পটুতা, সমস্তই অতি সুন্দর রূপে দেখান হইয়াছে।

আবার যখন চোর ধরা পড়ে, তখন নগর সুদ্ধ লোক চোর দেখিতে দৌড়ায়—তাহাদের ব্যগ্রতা কেমন সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে দেখুন—

"ধরা গেল চোর সোর পড়িল নগরে।
বাল বৃদ্ধ যুবা যায় নাহি রহে ঘরে ॥
স্তনপান করে শিশু কোলে যে ধনীর।
মৃত্তিকায় ফেলি ধায় হৃদয় অস্থির ॥
রন্ধন শালায় বামা রন্ধনে যে ছিল।
আথার উপরে হাঁড়ি রাখিয়া চলিল ॥
বেগে ধায় নাহি চায় পিছু পানে ফিরা।
কেহ কহে দাঁড়া লো মাথার লাগে কিরা ॥
এক জন প্রতি আর জন বলে কই।
সে কছে অঙ্গুলি ঠারি ওই দেখ ওই ॥"

কবির ভণ্ড বৈষ্ণবদিগের ভণ্ডামি বর্ণনা অত্যন্ত চমৎকার হইয়াছে। বর্ণনা বিস্তৃত হইলেও আমরা তাহা উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। বর্ণনা এই—

" দশ বিশ জনে ধরে ব্রজবাসি-বেশ।
কত সবচুল কত মুড়াইল কেশ ॥
কোটিতে কৌপিন মাত্র তাহাতে গিরস ।
সদা করে কেবল ভক্ষণ নাম রস ॥

* * *

খাসা চীরা বহির্বাস রাঙ্গা চীরা মাথে।
চিকণ গুধ্ড়ী গায় বাঁকা কোঁৎকা হাতে ॥
মুঞ্জ মুঞ্জ ছড়া গলে ঠাঁই ঠাঁই ছাব।
দুই ভাই ভজে তারা সৃষ্টি ছাড়া ভাব ॥
পৃষ্ঠ দেশে গ্রন্থ ঝোলে খান সাত আট।
ভেকা লোকে ভুলাইতে ভাল জানে ঠাট ॥
এক এক জনার ধুমড়ী দুটি দুটি।
দুই চক্ষু লাল গাঁজা ধুনিবার কুটি ॥
ভুগ্লামি ভাবে ভাব জন্মে থেকে থেকে।
বীরভদ্র অদ্বৈত বিষম উঠে ডেকে ॥
সে রসে রসিক নবশাক লোক যত।
উঠে ছুটে পায়ে পড়ে করে দণ্ডবত ॥
সমাদরে কেহ নিয়া যায় নিজ বাড়ী।
ভাল মতে সেবা চাই করে তাড়াতাড়ি ॥
গোষ্ঠী সুদ্ধ খাড়া থাকে বাবাজীর কাছে।
মনে মনে ভয় অপরাধী হয় পাছে ॥
নানা রস ভুঞ্জায় শোয়ায় দিব্য খাটে।
শেষে মেয়ে পুরুষেতে পত্র শেষ টাটে ॥
বৈষ্ণব বন্দনা গ্রন্থ সকলে পড়ায়।
ছত্রিশ আশ্রম নিয়া সকত্র জড়ায় ॥
কেমন কলির ধর্ম্ম কব আর কি।
মজাইল গৃহস্থের কত বহু ঝী ॥

ইহা ব্যতীত বর্দ্ধমান বর্ণনা, সরোবর বর্ণনা, বারমাস বর্ণনা, প্রভৃতি স্থানে কবি তাঁহার কল্পনাময়ী আদর্শচিত্র বর্ণ-

নায় অতি সুন্দর শিল্পকৌশল দেখাইয়াছেন—বাহুল্যভয়ে তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল না।

এক্ষণে কবিরঞ্জনের চরিত্র-চিত্র কিরূপ হইয়াছে তাহা দেখা যাউক। আধুনিক কাব্যের চরিত্র চিত্রই প্রধান অঙ্গ—বাস্তবিক এক্ষণে তাহাকেই কাব্যের প্রাণ স্বরূপ বলা যায়। সুতরাং সাধারণ কাব্যে চরিত্রচিত্রের উৎকর্ষ না থাকিলে তাহাকে উৎকৃষ্ট কাব্য বলা যায় না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই চরিত্রচিত্রের দ্বারাই কবি কিরূপ স্রষ্টা তাহারই প্রধানতঃ পরিচয় পাওয়া যায়।

সকলেই স্বীকার করিবেন যে এবিষয়ে কবিরঞ্জন ভারত অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। ভারতের কাব্যের হীরাই একমাত্র অদ্ভুত সৃষ্টি। হীরার চরিত্রচিত্রে ভারত তাঁহার লিপি-নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। কিন্তু কবিরঞ্জন হীরা বিদ্যা ও সুন্দর তিন জনেরই চরিত্র অতি সুন্দর রূপে চিত্রিত করিয়াছেন। ভারতের বিদ্যা বা সুন্দর চিত্রিতপুত্তলিবৎ তাহাতে প্রাণ নাই, সুতরাং সে চিত্র আদৌ স্বাভাবিক হয় নাই। কবিরঞ্জন বিদ্যা ও সুন্দরের চরিত্র অতি সুন্দর রূপে চিত্রিত করিয়াছেন।

কবিরঞ্জন সুন্দরের চরিত্র কিরূপ চিত্রিত করিয়াছেন তাহা এক্ষণে দেখা যাউক। সুন্দর শাপভ্রষ্ট দিব্য পুরুষ কালী পূজা প্রকাশার্থই কর্ম্মভূমি পৃথিবীতে জন্মিয়াছিলেন।

" শাপ ভ্রষ্ট জন্ম ধরা আমার সুন্দর।
মম পূজা প্রকাশিতে পৃথিবী ভিতর॥ "

এই শাপভ্রষ্ট কালীর বরপুত্র সুন্দর কিরূপে কালীপূজা প্রচার করেন—তাহাই কবিরঞ্জন বর্ণনা করিয়াছেন, সুতরাং সুন্দর প্রথম হইতেই বরাবর কালীভক্ত। তিনি কালীর আদেশ ব্যতীত কখন কোন কার্য্য করেন নাই। কিন্তু তিনি ভক্ত ও আদেশ বাদা ছিলেন বলিয়া যে তাঁহার পুরুষার্থ আদৌ ছিল না, তাহা নহে।

সুন্দরের সহিত প্রথম পরিচয়েই জানিতে পারা যায় যে তাঁহার,

"কোন শাস্ত্রে নাহি ত্রুটি যে কহে সে দৃঢ় কোটী
ক্ষণ মাত্রে তাহার সিদ্ধান্ত।
মাধব জানিল দড় ভবানীর ভক্ত বড়
নিতান্ত বিদ্যার এই কান্ত॥"

আবার সুন্দরের যেমন গুণ, রূপও তেমনি,—

"কি মেরু শিখর কিবা বিধুবর
বিবেচনা কর কি তরুতলে।"

* * *

"কেহ কহে হাসি মনে হেন বাসি
সৌদামিনি রাশি এমনই হবে।"

* * *

"অভিন্ন মদন পূর্ণেন্দু বদন
কনক চম্পক কান্তি।"

কবি একস্থলে অতি আশ্চর্য্য কৌশলের সহিত সুন্দরের অনিন্দ্যসুন্দর রূপের পরিচয় দিয়াছেন। যখন কোটাল চোর ধরিতে আসে, তখন সুন্দর বিদ্যার পরামর্শে নারীবেশ ধরেন। সেই সময়ে বিদ্যার সহিত সুন্দরের তুলনা করিয়া কবি বলিয়াছেন,

"সুন্দরী বলিয়া বড় ছিল অভিমান।
সুন্দর সুন্দর রূপে গেল সেই ভান॥"

আবার একস্থলে মালিনী বিদ্যার নিকট সুন্দরের পরিচয় দিয়া বলে,

দৃষ্ট নহে শ্রুত নহে রূপ হেনরূপ।
গুণসিন্ধু সুত গুণ সিন্দুর স্বরূপ॥

* *

বদনে বিরাজে বাণী বিদ্বান বিপুল।
পঞ্চবক্ত্র পদ্মযোনি প্রায় সমতুল॥

দৃষ্টি মাত্র মম দেহ দহে দিবানিশি।
বৃদ্ধার বাসনা হয় বাঁচেকি রূপসি ॥

সুন্দর যখন ভাট মুখে বিদ্যার সমাচার শুনিলেন, তখন তাঁহার

বিবাহ হইল বাই পক্ষী হৈয়া উড়ে যাই
নিবসি রমনি মণি যথা।

কিন্তু সে সম্বন্ধে তাঁহার ইচ্ছা এত বেগবতী হয় নাই—যে ভারতের মত সুন্দরের 'একা যাব বর্দ্ধমান' এরূপ সংকল্প করিবেন। যাহা হউক সেই রাত্রে,

"ঘোরতর নিশা শেষ ধরি কালী নিজ বেশ
সবিশেষ কহেন স্বপন।"

কালী তাঁহাকে প্রত্যুষেই বিদ্যালাভ জন্য বর্দ্ধমান যাত্রায় আদেশ দিলেন—এবং কিরূপে বিদ্যালাভ হইবে, তাহার উপায় বলিয়া দিলেন। এক্ষণকার আদেশেবাদীগণ বোধ হয় এইরূপ আশ্চর্য্য আদেশ শুনিয়া বিস্মিত হইবেন না। তদনুসারে সুন্দর পরদিন প্রত্যুষে শুভক্ষণ দেখিয়া যাত্রা করিলেন। এবং চতুর্দ্দিকে মঙ্গল চিহ্ন দেখিয়া,

"বুঝিলা বিনোদবর বিদ্যাবতী লাভ।
প্রসন্না পর্ব্বত পুত্রী প্রকৃষ্ট প্রভাব ॥"

তদনুসারে সুন্দর পিতা মাতার অজ্ঞাতসারে নির্ভয়ে বর্দ্ধমান গমন করিলেন। পথে তাঁহার ইষ্টদেবী তাঁহাকে ঘোর পরীক্ষা মধ্যে ফেলিলেন। সন্মুখে মায়ানদী সৃষ্টি হইল। সে ভীষণ নদীতে তরণি নাই—পারের কোন উপায় নাই। তখন এক শিবোপম যোগী আসিয়া তাঁহাকে কালীর আরাধনা ছাড়িয়া শিবের আরাধনা করিয়া নদী পার হইবার পরামর্শ দিল। কিন্তু বালক সুন্দরের মনের তেজ অতুলনীয়। সে, "উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষে" এরূপ মহাযোগী কেও।

"কোপে কাঁপে কলেবর কবি কহে কটু।
বুঝিলাম আগমে নিগমে বড় পটু ॥"

ইত্যাদি উপদেশ দিয়া বলিলেন,

"তোমার বাতাসে সর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট হয়।"

তখন কালী তাঁহাকে প্রত্যক্ষ হইয়া আকাশ বাণী করিলেন,

"ভয় নাই ভকত ভূবনে শীঘ্র যাবা।
গুণ নিধে গুণবতী গত মাত্র পাবা॥"

বর্দ্ধমানে পঁহুছিয়াই প্রথমে সুন্দরের মালিনীর সহিত পরিচয় হইল। বলিলেন,

"সেবি বিদ্যা বিদ্যা লাগি হইয়াছি দেশত্যাগী
যদি বিদ্যা পুরাণ কামনা॥"

সুধু তাহাই নহে। সুন্দর আপনার গুণের কথা বেশ বুঝিতেন, তাই মালিনীকে বলিয়াছিলেন,

"গুণ না থাকিলে মাসি এত দূর আসি।"

সুতরাং হীরা বুঝিল,

"বিদ্যায় ভকতি আছে বিদ্যালাভ হবে পাছে।"

তখন হীরার সহিত সুন্দরের অনেক কথা বার্ত্তা হইল। হীরা বলিল,

আর শুন গুণযুত তব নামে ভগ্নীসুত
কহিতে বড়ই ভয় বাসি।
যদ্যপি না ঘৃণা কর থাকহ আমর ঘর
ধর্ম্মত তোমার আমি মাসি॥

যাহা হউক, সুন্দর হীরার বাড়ী থাকিতে সম্মত হইলেন। পথে নানা কথা বার্ত্তা হইল—হীরা সুন্দরকে বিদ্যার রূপের পরিচয় দিলেন।

সুন্দর যে ঈশ্বরানুগ্রহীত লোক, তাহা হীরা শীঘ্রই বুঝিল, কেননা,

"সে জন গমনে কুসুম কাননে
বিকাশিত হয় পুষ্প।"

কাজেই হীরা ভাবিল, সুন্দর 'সামান্য পুরুষ নহে।'

* * *

যাহা হউক সুন্দর বিদ্যার নিকট পরিচিত হইবার জন্য কৌশলে মালা গাঁথিয়া পদ্মের

"প্রতি দলে দলে লিখে সবিশেষ নিজ।"

মালিনীর দ্বারা বিদ্যাকে পাঠাইয়া দিলেন। বিদ্যা তাহাতেই সুন্দরের কুল শীল ও বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় পাইল। ইহাতে সুন্দরের চরিত্রের গাম্ভীর্য্য বেশ রক্ষিত হইয়াছে।

কবি আর একস্থলে সুন্দরের মহত্ত্ব ও উদার ভাবের বেশ পরিচয় দিয়াছেন। হীরা বাজার করিয়া আসিয়া হাটের পরিচয় দিলে

"সুন্দর হাসেন মনে আমি এক চোর।
চাতুরি করিয়া মাগী কড়ি খায় মোর॥
কবি বলে মরি পাইয়াছ বড় দুঃখ।
স্নানে যাও মাথা খাও শুকায়েছে মুখ॥"

কিন্তু চোর ধরার সময়েই আমরা তাঁহার চরিত্রের প্রকৃত মহত্ত্ব দেখিতে পাই। তিনি যখন কালীধ্যানে নিমগ্ন তখন কোটাল তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলে,

ধ্যান ভঙ্গ কাঁপে অঙ্গ সুড়ঙ্গে পশিল।
* * *
সুড়ঙ্গে পশিল যেন সূর্য্য গেল অস্ত॥
* কবি উপনীত প্রমদার পাশে।"

তখন বিদ্যা বুঝিল কোটাল সুন্দরকে ধরিতে সেই খানেই আসিবে। তাই সুন্দরকে বলিলেন,—

"দোষ নাহি প্রভু তুমি নারী বেশ ধর।
* * *
জাতি প্রাণ হেতু লোক তঞ্চ করে নানা।
পরিণাম দর্শী যেবা কি তার যন্ত্রণা॥"

সুতরাং

"সধর্ম্মিনী বাক্য শুনি সায় দিলা রায়।"

কিন্তু যখন কোটাল ধরিতে আসিল, তখন তিনি ধরা দেওয়াই স্থির করিলেন কারণ,

"যা করেন কৃপামই, যাম্য পদে পার হই,
কত কাল হৈয়া রব চোর।
যদি তরি বাম পায়, কোটাল সবংশে যায়,
ইহা কি উচিত কর্ম্ম মোর॥"

কিন্তু বিদ্যা তাঁহাকে অনেক নিষেধ করিল, বলিল,

"পুর্ব্বাপর শ্রুত বটে রাজনীতি ধর্ম্ম।
জাতি প্রাণ হেতু সাধু করে দুষ্ট কর্ম্ম॥"

কিন্তু সুন্দর তাহা শুনিলেন না। কেন না তাঁহার মতে মিথ্যা কথা কহিলেই পাপ আছে। দেবতারা বা দেবোপম ব্যক্তিরাও মিথ্যা কথার ফল ভোগ করিয়াছেন, তিনি কেন এমন কুকর্ম্ম করিবেন। তাই বলিলেন,—

"সত্য বাক্য রক্ষা পায় যদি যায় প্রাণ।
সেও ভাল পরকালে পায় পরিত্রাণ॥
সত্য হীন ধর্ম্মহীন বৃথা জন্ম তার।
যতো ধর্ম্ম স্ততো জয় বাক্য সারোদ্ধার॥"

সুতরাং তিনি ধরা দিলেন। তখন কোটালের চরগণ তাহার উপর অযথা অত্যাচার করিতে লাগিল—বিদ্যা শোকে আকুল হইল। তখন,

"কুপিল সুন্দর মুক্ত করে নিজ করে।
ঢেকা মেরে দুরেতে ফেলিল নিশীশ্বরে॥
তখনি পরিল বস্ত্র পুরুষের ছান্দে।
চুল ছিল এলো শায় দুই করে বান্ধে॥
পলাইতে পারে কবি কে রাখিতে পারে।
মনো সাধে ধরা দিল তং'সিতে রাজারে॥"

তাহার পর কোটাল রাজার নিকট সুন্দরকে লইয়া উপস্থিত। তখন,

"ভুপতিকে প্রণিপাত করিলেন কবি।
সদত নির্ভয় যেন দীপ্যমান রবি॥

সুন্দর বরাবর এই অসাম নির্ভিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তিনি বারম্বার বলিয়াছেন,

"কাট রাজা তিলার্দ্ধ না করি মৃত্যু ভয়।"

রাজা কিন্তু তাঁহাকে মিছামিছি মৃত্যু ভয় দেখাইয়াছিলেন। কৌশলে সুন্দরের পরিচয় লওয়া তাহার এক কারণ—কিন্তু প্রধান কারণ এই যে, "কেমন পণ্ডিত বাপা জানা কিন্তু চাই।" সুন্দরও চোরপঞ্চাশৎ শ্লোকে তাঁহার সেই পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন।

তবে এস্থলে পাত্রকে অযথা গালাগালি দেওয়া তাঁহার ভাল হয় নাই।

"হবচন্দ্র রাজা যেন গবচন্দ্র পাত্র।"

প্রভৃতি কথা বড়ই রূঢ় হইয়াছে।

সে যাহা হউক একবার আমরা সুন্দরের ভয়ের সঞ্চার দেখিতে পাই। যখন তাহাকে যথার্থই কাটিতে মসানে লইয়া যাওয়া হইল তখন,

"কিছু কাল ছিল কবি ভয়েতে নীরব।
কৃতাঞ্জলি কায়মনোবাক্যে করে স্তব॥"

তাহার পর আবার সুন্দর কেমন মহত্ব প্রকাশ করিলেন দেখুন। মাধব ভট্ট রাজসমীপে সুন্দরের পরিচয় দিলে রাজা সভাসুদ্ধ মসানে গিয়া সুন্দরের ক্ষমা চাহিলেন। সুন্দর বলিলেন,

"নিজ নিজ কর্ম্ম ভোগ, পরে বৃথা অনুযোগ
সকলি করেন ভদ্রকালী।
যেন রথ চক্রাকৃতি, নরভাগ্য নরপতি,
চিরকাল সমান না যায়॥"

সুন্দরের মাতৃভক্তিও যথেষ্ট ছিল। তিনি বহু দিন মাতা পিতার নিকট হইতে দূরে থাকায় স্বপ্নে মাতাকে দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখাকুল হইয়া বিদ্যাকে বলিলেন।

* * * শুন শুন প্রাণপ্রিয়া,
মহা গুরু জনক জননী।
শাস্ত্র সিদ্ধ কথা এহ, যাঁ হতে দুর্ল্লভ দেহ,
বিনে মুক্ত উপযুক্ত ধ্বনি॥"

শুধু তাহাই নহে তাঁহার মতে,—

"জন্মভূমি জননী জনক জনার্দ্দন।
জাহ্নবী জকারপঞ্চ দুর্লভ বচন॥"

সুতরাং এ সকলেই তাঁহার অচলাভক্তি ছিল।

এই স্থলেই বিদ্যাসুন্দরের প্রকৃত কথা শেষ হয়। কিন্তু কালীপূজা প্রকাশার্থে অবতীর্ণ সুন্দর ইহার পরে দেশে গিয়া দক্ষিণাকালী স্থাপনা করিয়া রীতি মত শবসাধনা করিয়া উত্তম সিদ্ধি লাভ করিলেন। তৎপরে পুত্রকে রাজ্য দিয়া যোগবলে দেহ ত্যাগ করিয়া কৈলাশে গমন করিলেন। সুন্দর শেষে তাঁহার পুত্রকে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহাও অতি চমৎকার। তিনি সংসারের অনিত্যতা বুঝাইবার জন্য বলিলেন।

বেদিয়ার বাজি প্রায় অনিত্য সংসার।

এবং এরূপ সংসারে লোকের কিরূপ ব্যবহার করা উচিত তাহাও বুঝাইলেন,—

"পরস্ত্রী জননী তুল্যা থাকে যেন মনে।
কদাচ না লোভ যেন হয় পরধনে॥
একান্ত বিহিত নহে মানি-মান ভঙ্গ।
সর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট তবে যাবে নীচসঙ্গ॥
নিরন্তর থাকা ভাল রিপু সঙ্গে শৌর্য্য।
সম্পদে বিনয়ী হবে বিপদেতে ধৈর্য্য॥

* * *

সেই মন্ত্রে কদাচ না কবে গুহ্যকথা।

তাই বলি যে, কবিরঞ্জনের সুন্দরের চরিত্র চিত্র সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে। প্রকৃত রাজপুত্রের যে যে গুণ থাকা আবশ্যক কবিরঞ্জন অতি চমৎকার রূপে সুন্দরের সেই সকল গুণের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। ইহার তুলনায় ভারতের সুন্দরের চরিত্র চিত্র কিছুই নহে।

বিদ্যার চরিত্র চিত্রেও কবিরঞ্জন এইরূপ শিল্প কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতের বিদ্যার চরিত্রচিত্র আদৌ

ভাল হয় নাই। সাধারণতঃ বড় ঘরের অদূরে মেয়ে যেমন প্রকৃতির হয়, ভারতের বিদ্যা প্রায় সেইরূপ। ভারতের কোথাও বিদ্যার বিদ্যার পরিচয় নাই। বিদ্যার চরিত্রে সর্ব্বত্রই কেবল বিলাসিতা, কেবল আমোদ প্রিয়তা—বিদ্যা রঙ্গ রস লইয়াই উন্মত্তা, মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ কালীভক্তি ব্যতীত তাহার চরিত্রে আর কোন উচ্চতর বৃত্তির কার্য্য আমরা দেখিতে পাই না। যখন বিদ্যা পিতা মাতাকে, স্বদেশকে জন্মশোধ ত্যাগ করিয়া সুন্দরের সহিত কাঞ্চিপুর যাইবে তখনও তাহার,

"শুনিয়াছি সেদেশের কাঁই মাঁই কথা"

প্রভৃতি রঙ্গ চলিতেছিল। শুধু তাহাই নহে, বিদ্যা তখন সুন্দরকে সন্ন্যাসী সাজাইয়া নিজে সন্ন্যাসিনী হইয়া আমোদ করিতে উন্মত্ত। ভারতের বিদ্যা সর্ব্বত্রই এইরূপ। কিন্তু কবি রঞ্জনের বিদ্যা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির। কবিরঞ্জন সে চিত্র কেমন উজ্জ্বল করিয়া কৌশলের সহিত চিত্রিত করিয়াছেন, দেখা যাউক।

সুন্দর হীরাকে দিয়া বিদ্যার নিকট স্বরচিত মালা পাঠাইয়া দিলেন। সেই মালা দৃষ্টে বিদ্যার উৎকণ্ঠাবস্থায় তাহার সহিত পাঠকের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। মালায় সুন্দরের বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া, এবং পত্রে সুন্দরকে উচ্চ রাজকুলোদ্ভব জানিয়া, বিদ্যা ভাবিলেন,

"বিরহিণী দেখি আমা প্রসন্ন হইলা শ্যামা
বিধি মিলাইল করতলে।"

সুতরাং সুন্দরকে দেখিতে তাহার উৎকট উৎকণ্ঠা হইল। স তৎক্ষণাৎ হীরাকে ডাকাইয়া সমস্ত তত্ত্ব লইবার জন্য বড়ই ব্যাগ্র হইল। এরূপ ব্যস্ত হইবার কারণ কবি নিজেই বলিয়াছেন।

শ্রীকবিরঞ্জন বলে জলনিধি উথলিলে
বালির বন্ধনে কোথা থাকে।

বিদ্যা বিদ্যাবতী বটে, কিন্তু রাজার একমাত্র কন্যা সুতরাং

বড় আদরে প্রতিপালিত। সুতরাং তাহার মনে যখন যে বাসনা উদয় হইত, তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পাদিত হইত। এরূপ স্থলে তীব্র বাসনাবেগ নিরোধ করিবার শিক্ষা তাহার আদৌ হয় নাই। যাহার চরিত্র এরূপে সংগঠিত সে কখন নিজ ইচ্ছার বেগকে বাধা দিতে পারে না। কাজেই যতক্ষণ তাহাদের ইচ্ছা পূর্ণ না হয়, ততক্ষণ বড় অধৈর্য্য হয়—অত্যন্ত উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে। যাহারা সাধারণ আদুরে মেয়েদের দেখিয়াছেন, তাঁহারা একথা বেশ বুঝিতে পারিবেন। লেখা পড়া শিখিলে এস্বভাব যায় না, কারণ স্বভাব সহজে দূর হইবার নহে।

আবার যাহারা এইরূপ অধীর তাহারা বড় রাগী, তবে তাহারা 'ক্ষণে তুষ্ট ক্ষণে রুষ্ট' স্বভাব হয়। বিদ্যার স্বভাবও সুতরাং এইরূপ হইয়াছিল।

বিদ্যা স্বয়ংই বলিয়াছেন,

"আদ্যোপান্ত এই ধারা ক্রোধে হই জ্ঞান হারা
ক্ষণেক সে ভাব নাহি থাকে।"

তাহার পর বিদ্যা সুন্দরকে দেখিলেন। দর্শনের পর তাহার আসঙ্গলিপ্সা অত্যন্ত বলবতী হইল। সখী তাহাকে অনেক বুঝাইল—বলিল,

"সহসা এমন কার্য্য তুমি ত অভব্যা।
যদ্যপি পণ্ডিতা হও তথাপিও নব্যা॥"

কিন্তু তখন বিদ্যার ধৈর্য্য ধরা সম্ভব নহে। সে সময়ে,

"রসময়ী কহে সই প্রতিজ্ঞা ভাবত।
স্মর শরে ভেদ তনু নহেক যাবত॥"

এই কথাতেই বিদ্যার অধীকতার পরাকষ্ঠা দেখান হইয়াছে। বিদ্যা বুঝিয়াছিল—

সুন্দর সুরূপ রূপ ভূপসুত অই।
যত্ন রত্ন মিলাইলা কালী কৃপাময়ী॥

এজন্য ভাবিল,

"আর ইচ্ছা নাই সই স্বামী হেন ঘটে।"

সুতরাং বিদ্যা তখন অনন্যোপায় হইয়া কায়মনোবাক্যে কালীর স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবিদ্যা তুষ্ট হইয়া প্রসাদ জবা দিয়া দৈববাণী করিলেন

"* * *, তোমার হৃদেশ সেই,
আজিনিশি সকল প্রতুল।"

সুতরাং বিদ্যা সুন্দর সমাগম দোষের কাজ মনে করে নাই। পিতামাতাকে না বলা "ক্ষুদ্র দোষ" বা অভব্যতা হইয়াছে ইহাই মনে করিত।

সে যাহা হউক বিদ্যার গর্ভ সংবাদ পাইয়া রাণী যখন বিদ্যাকে ভৎর্সনা করিতে আসিল, তখন বিদ্যা মাতার সহিত ভাল ব্যবহার করে নাই। কেন করে নাই, তাহার কারণ কবি কতকটা বুঝাইয়া দিয়াছেন।

মুসলমানদের অবরোধ প্রথার মত বাঙ্গালীর ঘরেও তখন অবরোধ প্রথা প্রচলিত হইতেছিল। এই জঘন্য প্রথা জন্য পিতা পুত্রে, মাতা কন্যায় বড় একটা সাক্ষাৎ হইত না। কন্যার স্বতন্ত্র মহাল নির্দ্দিষ্ট ছিল। কন্যা আপন ইচ্ছামত কাজ করিতে পারিত, পিতা মাতার ধার ধারিত না। তাই বিদ্যা দুঃখ করিয়া বলিয়াছিল,

অনাথিনী থাকি একা ছমাস বৎসরে দেখা
দিনেক তোমার সঙ্গে নাই। •

কাজেই মাতার উপর বিদ্যার ভক্তি, ভালবাসা বৃদ্ধি হইতে পায় নাই। ইহার উপর বিদ্যা লেখা পড়া শিখায় মাতা পিতা তাহাকে ভয় করিত।

"অন্যকে ডরাণ পিতা ততোধিক মাতা ভীতা;
জাননা গো তুমি কি আমাকে।"

ইহার উপর আবার বিদ্যা সুন্দর সহ মিলনকে দূষণীয় মনে করিত না। সুতরাং নির্দ্দোষীর যে মনোবল বিদ্যার তাহা ছিল। এই জন্য বিদ্যা মাতার কথায় তত ভীত বা লজ্জিত হয় নাই। মাতার সহিত তাহার বাক্‌চাতুরীতে অধর প্রান্তে ঈষৎ হাসি ও নয়নে ব্যঙ্গের কটাক্ষ দেখা দিয়াছিল।

সেই কারণেই বিদ্যা বিধু ব্রাহ্মণীর প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল, কোটালকে বিনয় করিয়া বলিয়াছিল,

" প্রাণ মোর নহে চোর এতো জোর মিথ্যা সোর "

আর কোটালও বলিয়াছিল,

"তুমি সতী গুণবতী ভগবতী প্রতি মতি
সামান্য মানুষ নহে এই। "

আর এক কথা, বিদ্যা যে রীতিমত কালী ভক্ত তাহা কবি বরাবর দেখাইয়াছেন। বিদ্যা প্রত্যহ রীতিমত কালী পূজা করিত। পূজার ফুল আনিতে বিলম্ব হইয়াছিল বলিয়া হীরাকে কত লাঞ্ছনা করিয়াছিল। বাস্তবিক বিদ্যা কালীর আদেশ ব্যতীত কোন কাজ করে নাই। সুন্দর সমাগমের পূর্ব্বে বিদ্যা কালীর আরাধনা করিয়া আকাশ বাণী শুনে। বন্ধন দৃষ্টেও সেইরূপ কালী পূজা করিয়া আশ্বস্তা হইয়াছিল। আবার যখন সুন্দরের মোচন ও রাজার নিকট তাহার সম্মান প্রাপ্তির কথা শুনিয়াছিল, তখনও ভক্তি ভাবে কালী পূজা করিয়াছিল। সুতরাং এরূপ ভক্ত ইষ্টদেবতার আদেশে যে কাজ করিয়াছে, তাহার জন্য তিরস্কৃতা হইলে তাহাতে লজ্জা বা দুঃখ হইবার কারণ হয় না। এই জন্য কোটালের চোর ধরিবার গোলযোগের সময়ও বিদ্য ও সুন্দর সম্পূর্ণ অমনো-যোগী থাকিয়া পরস্পর আমোদ প্রমোদে রত ছিল। ইহা ব্যতীত কবিরঞ্জন বিদ্যার বিদ্যার পরিচয় দিয়াছেন। ভারত কোথাও সে চেষ্টা করেন নাই। বিদ্যা ও সুন্দরের বিচারে অল্পই বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় আছে, অন্ততঃ তাহা যথেষ্ট নহে। কিন্তু কবিরঞ্জন বিদ্যার শ্বশুরালয়ে গমনের সময় সেই পরিচয় দিয়াছেন। সুন্দর দেশে যাইবার সময় বিদ্যা তাহার সহিত যাইবেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। বিদ্যা তাহাতে আর এক বৎসর থাকিতে অনুরোধ করিলেম। সুন্দর একান্তই যাই-বেন। বিদ্যাকে বলিলেন,

যদি ভাব যাব দূর থাক নিজে পিতৃপুর
কিছু কাল কর সুখ ভোগ।

এই কথায় বিদ্যা একান্ত দুঃখিত হইয়া মাতার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিল। মাতা শোকাকুল হইলে বিদ্যা তাঁহাকে যেরূপ বুঝাইয়াছিল, তাহাতে তাহার বিদ্যার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এখনকার কয় জন পণ্ডিত এরূপ সঙ্কটে সে উপদেশ দিতে পারেন? আর উপদেশ দেওয়া দূরে থাক্, সে উপদেশের মর্ম্ম কয় জন বুঝিতে পারেন? বিদ্যা বলিল,—

কার পুত্র কার কন্যা কার মাতা পিতা।
সর্ব্ব মিথ্যা সত্য এক নগেন্দ্র দুহিতা॥
বিষম যাঁহার মায়া সংসার ব্যাপিনী।
কৌতুকে দেখেন কর্ম্ম ভোগ করে প্রাণী॥
বেদেতে বিদ্বান বেদব্যাস মহামুনি।
মায়াতে ভুলিল তেঁহ শাস্ত্রে হেন শুনি॥
সর্ব্ব শাস্ত্র বিজ্ঞ মুনি তাঁর এত জ্বালা।
কি দোষ তোমার মাগো তুমিত অবলা॥

আবার যখন এই শাস্ত্রসঙ্গত উচ্চ আধ্যাত্মিক কথা এই নিবৃত্তি মার্গের কথা তাহার মাতা বুঝিল না—তখন সাংসারিকের ভাবে—প্রবৃত্তিমার্গের কথায় সরল উপদেশ দিয়া বলিলেন—

"নিবৃত্তিমার্গের কথা কহিলাম মাতা।
প্রবৃত্তিমার্গের সৃষ্টি সৃজিলা বিধাতা॥
পাছে নাহি বুঝে পরে করে অনুযোগ।
কন্যাপুত্র জন্মিলে কেবল কর্ম্মভোগ॥
তুভ্যমহং সম্প্রদদে কহিলে বচন।
গোত্র ভিন্ন হয়ে পড়ে দৈবের ঘটন॥
পরপুত্র জননী গো হয় হর্ত্তাকর্ত্তা।
শাস্ত্রে কহে রমণীর মহাগুরু ভর্ত্তা॥

আরও বলিল —

শোকে সর্ব্ব ধর্ম্ম লোপ শোক পাপ বড়।
সুতরাং মন দড় কর।

আর এক স্থলে পুত্রকে একাক্ষরী মন্ত্র দিয়া বিদ্যা তাহার নিজ শাস্ত্র শিক্ষা ও সাধনা শিক্ষায় পরিচয় দিয়াছে।

বাস্তবিক কবিরঞ্জন তাঁহার বিদ্যাকে উচ্চ শ্রেণীর কাল্পনিক রমণী করিয়া চিত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতে এ সকল কিছুই নাই।

কবিরঞ্জনের হীরাও ভারতের হীরা অপেক্ষা অনেক ভাল। আমরা টীকার যথাস্থলে সে কথার উল্লেখ করিয়াছি, সুতরাং এস্থলে তাহার বিস্তারিত সমালোচনার আবশ্যক নাই।

ভারতের হীরা যেমন 'হারামের হাড়' কবিরঞ্জনের হীরাও সেইরূপ। ভারতের হীরার মত এ হীরাও হাটের কড়ি চুরি করে, আবার গঙ্গাজল ছুঁইয়া বলে, "পাঁচ কড়া কড়ি বাপু খাই নাই মুই।" এ হীরা সেইরূপ কুটিল স্বভাবাও বটে। কারণ

"এই যে তোমার মাসী বোধে নহে টুটা।
কে পারে ভুলাতে কার ঘাড়ে মাথা দুটা॥
পুরুষের কান কাটে ধরে শক্তি হীরা।
ফাঁকি দিয়া চাকি ভুতে গায় করে কিরা॥"

আবার হীরা কোটালকে যে কটুবাক্য বলিয়াছিল, তাহাতেই তাহার অতুল সাহস ও নির্ভিকতা বেশ বুঝা যায়।

কিন্তু সে নীচ জাতীয়া হইলেও ভারতের হীরার মত সে তত নীচ স্বভাবা ছিল না। সে কুচরিত্রা ছিল না—স্পষ্টই বলিয়াছে

"এত কাল আছি নিষ্ঠা দেখ মিথ্যা অপ্রতিষ্ঠা

তবে সুন্দরকে দেখিয়া তাহার মন চঞ্চল হইয়াছিল বটে। কিন্তু সে কথা বিদ্যার নিকট মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিল,

"বৃদ্ধার বাসনা হয় বাঁচে কি রূপসী।"

সে ভারতের হীরার মত বিদ্যাসুন্দরের গোপনে প্রণয়ে সাহায্য করে নাই। স্পষ্টই বিদ্যাকে বলিয়াছিল

"জন্মে জন্মে নানা পুণ্যপুঞ্জ তব ছিল।
সেই ফল হেতু বর এমনি মিলিল॥"

আবার বিদ্যার নিকট ঘটকালি চাহিয়াছিল। আবার

"হবে লো দুলাল তোর সেদিন কেমন মোর ,
সে ডাকিবে কোথা আই বুড়ী।"

শুধু তাহাই নহে। হীরার স্ত্রীজনোচিত কোমল বৃত্তিও যথেষ্ট ছিল। সুন্দরকে প্রথম দেখিয়াই তাহার মনে বাৎসল্য ভাব উদয় হইল। বলিল,

আর শুণ গুণযুত তব নামে ভগ্নী সুত
কহিতে বড়ই ভয় বাসি।
যদ্যপি না ঘৃণা কর থাকহ আমার ঘর
ধর্ম্মত তোমার আমি মাসি ॥"

আবার যখন কোটাল সুন্দরকে ধরিয়া লইয়া যায় তখন,

"আছাড়ি পাছাড়ি মহী কেঁদে কহে হীরা।
ও চাঁদ মুখের কথা শুনিব কি ফিরা॥
পতি পুত্র হীনা দীনা শুণ গুণরাশি।
কে কহিল তোমাকে কহিতে মোরে মাসী॥
মৃত্যু প্রতি কারণ হইলে তুমি মোর।
লোকে বলে হীরা মাগি রেখেছিল চোর॥
কেন বাড়াইলে প্রেম রাজ কন্যা সনে।
তোমাকে ছাড়িয়া বিদ্যা বাঁচিবে কেমনে॥
তোমার মরণে এত লোকের মরণ।
কি জানি বিধির লিপি ললাটে কেমন॥"

ভারতের হীরা এ সময়ে বলিয়াছিল,

" কেটে ফেল চোরে ছেড়ে দেহ মোরে,
বান্ধহ ধর্ম্মের সেতু।"

বাস্তবিক কবিরঞ্জন নিজে ধর্ম্মভীরু বলিয়াই হউক, আর যে জন্য হউক, তিনি প্রায় সকল চরিত্রগুলিকেই ধর্ম্মভীরু করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার রাজা, কোটাল, কোটালনী সকলেই ধর্ম্মভীরু। ভারত যে কারণেই হউক, সেরূপ করেন নাই। অতএব যে দিক দিয়াই দেখা যাউক, কবিরঞ্জন বিদ্যা-

যে এরূপ কাব্য এত দিন অনাদৃত ছিল। এই কাব্য সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন,

"কবিরঞ্জন সকল রস বর্ণনাতেই বিশেষ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। ইনি পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের অপেক্ষা কি ছন্দোবন্ধ, কি বাগাড়ম্বর, কি কল্পনাশক্তি কিছুতেই হীনকল্প ছিলেন না—বরং শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইহাঁর রচনা ওজস্বী, প্রগাঢ় ও অনুপ্রাস বহুল। রায়গুণাকরের বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় কবিরঞ্জনের কবিতা সরল ও প্রসাদ গুণসম্পন্ন নহে বটে, কিন্তু কবিত্বে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে—বরং যেখানে রামপ্রসাদ পরমার্থ প্রসঙ্গ ও কালী নামের গন্ধ পাইয়াছেন, সেই স্থানেই রচনার শেষ করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার এক বিদ্যাসুন্দরেই কোমল ও সরল, এবং কুটিল ও কর্কশ রচনা প্রায় সমপরিমাণে মিশ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। কবিরঞ্জনের এক স্থানে লিখিত আছে,

"কালী কিঙ্করের কাব্য কথা বুঝা ভার।
বুঝে কিন্তু সে কালী অক্ষয় হৃদে যায়॥"

ইহা যদিও গর্ব্বব্যঞ্জক, কিন্তু কবিরঞ্জনের কবিতামালা এই গর্ব্ব সংরক্ষণে অসমর্থ নহে। * * * ফলতঃ নিরপেক্ষ চিত্তে আলোচনা করিয়া দেখিলে নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইবে যে, কবিরঞ্জন প্রণীত বিদ্যাসুন্দর একখানি সুন্দর ও মনোহর কাব্য। ইহার স্থানে স্থানে এমন সুন্দর কবিতা সকল বিরচিত হইয়াছে যে, পাঠ মাত্রে পাঠকের অন্তঃকরণে রচয়িতার কবিত্ব শক্তি প্রতিভাত হয়। কবিরঞ্জন হিন্দী এবং বাঙ্গালা ভাষা মিশ্রিত করিয়া যে সকল কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভারতচন্দ্রের মিশ্রভাষায় কবিতা অপেক্ষায় কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে।"

(কবিচরিত—১০৭ পৃঃ)

—০ঃ০—

কবিরঞ্জন

রামপ্রসাদের জীবনবৃত্তান্ত।

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই আমাদের দেশের লুপ্তপ্রায় কবিদিগের কবিতা ও জীবনচরিত উদ্ধারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যের সৌভাগ্য বলিতে হইবে। নতুবা রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের কোন কথাই আজ জানিবার উপায় ছিল না। তাহার পর বাবু দয়ালচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ও স্বয়ং কুমারহট্ট প্রভৃতি স্থানে গিয়া কবিরঞ্জন সম্বন্ধে অনেক কথা সংগ্রহ করিয়াছেন। আমরা এক্ষণে প্রধানতঃ তাঁহাদের লিখিত পুস্তক এবং পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের 'বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক' প্রস্তাব হইতে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের জীবনী সংগ্রহ করিলাম।

প্রসিদ্ধ হালিসহরের অন্তঃপাতী কুমারহট্ট গ্রামই কবিরঞ্জনের জন্মস্থান। এস্থানে পূর্ব্বে অনেক ঘর ধনবান কুম্ভকার বাস করিত বলিয়া বোধ হয়। ইহার নাম কুমারহট্ট বা কুমারহাটা হয়। এক্ষণে তথায় রামপ্রসাদের বাসগৃহের কোন চিহ্ন নাই। শুনিয়াছি, সেস্থলে পুষ্করিণী হইয়াছে। কেবল তাঁহার সাধনের পঞ্চমুণ্ডী আসনের স্থান অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে। আজি পর্য্যন্ত অনেক গায়ক মজুরী করিতে যাইবার পূর্ব্বে এই স্থানে আসিয়া গান করে, ও মাথায় ও জিহ্বায় আসনের স্থানের মাটী ছুঁয়াইয়া আপনার অভীষ্ট স্থানে যাইয়া থাকে। আজিও এখানকার লোক এই আসনের স্থান পবিত্র বলিয়া, মলমূত্র ত্যাগে অপবিত্র করে না। কবিরঞ্জন স্বয়ং বিদ্যাসুন্দরে তাঁহার বাসস্থানের পরিচয় দিয়াছেন,—

ধরাতলে ধন্য সে কুমারহট্ট গ্রাম।
তার মধ্যে সিদ্ধপীঠ রামকৃষ্ট ধাম॥

শ্রীমণ্ডপ জাগ্রত শৈলেশ পুত্রী যথা।
নিশাকালে চরিতার্থ শ্রীরঞ্জন তথা॥

কবিরঞ্জনের জন্মকাল ঠিক নির্ণয় করা সহজ নহে। অনেকে অনুমান করেন, ১৬৪০—১৬৪৫ শকের মধ্যে কবিরঞ্জনের জন্ম হয়। সাধকসঙ্গীত সংগ্রহকার শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ বলিয়াছেন, "বহুযত্নে ইহা জানিতে পারা গিয়াছে যে, কবিরঞ্জন ১৬৪২ শকে জন্মগ্রহণ করেন। তাহা হইলে ১১২৭ সাল (ইং ১৭১৮ খ্রীঃ অব্দ) কবিরঞ্জনের জন্মকাল বলিতে হইবে। সে আজ ১৬৭ বৎসর হইল। ভারতচন্দ্র ১৬৩৪ শকে (বাঃ ১১১৯ সালে) জন্মিয়াছিলেন। সুতরাং ভারত কবিরঞ্জন অপেক্ষা আট বৎসরের বড় ছিলেন।

রামপ্রসাদ বৈদ্যবংশীয় ছিলেন। মৃত দয়ালচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বহু কষ্টে রামপ্রসাদের বংশাবলীর তালিকা সংগ্রহ করেন, এই তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। ইহা দ্বারা তাঁহার বংশ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে না। তাঁহার কতকগুলি গানের ভনিতায় "দ্বিজ" শব্দ দেখিয়া অনেকেরই ভ্রম হইতে পারে যে, রামপ্রসাদ ব্রাহ্মণ ছিলেন। এ সম্বন্ধে দুইরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে। প্রথমতঃ, শাস্ত্রমতে শূদ্র ব্যতীত সকলেই দ্বিজ। বৈদ্যগণ শূদ্র নহেন, অন্ততঃ তাঁহারা একথা স্বীকার করেন না—সুতরাং শাস্ত্রমতে তাঁহারা দ্বিজ। কিন্তু কথা হইতেছে যে, বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই ত ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কোন বর্ণই আপনাকে দ্বিজ বলিত না। সুতরাং রামপ্রসাদ সেরূপ করিবেন কেন। ইহার একরূপ উত্তরও দেওয়া যাইতে পারে। ঠিক রামপ্রসাদের জীবনকালে (অথবা তাহার দুই চারি বৎসর পূর্ব্ব হইতে) বৈদ্যদের মধ্যে একটা ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হয়। সকল বৈদ্য একত্রিত হইয়া আপনাদিগকে ব্রাহ্মণের ঔরসজাত প্রতিপন্ন করিয়া উপবীত গ্রহণ করেন এবং অশৌচ কাল সংক্ষেপ করিয়া লয়েন। রামপ্রসাদ বোধ হয় এই আন্দোলন স্রোতে পড়িয়া আপনাকে দ্বিজ বলিতেন। কেহ কেহ বলেন, দ্বিজ

শব্দ পরবর্ত্তী যোজনা মাত্র। রামপ্রসাদের অনেক গান এই-রূপে বিকৃত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, হয়ত দ্বিজ রামপ্রসাদ কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তি ছিলেন। এবং কালক্রমে ইঁহার রচিত সংগীত, চলিত কবি-রঞ্জনের সংগীতের সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছে। যদি এ কথা সত্য হয়, তাহা হইলে এই দ্বিজ রামপ্রসাদ সম্বন্ধে কোনরূপ কথাই জানা যায় না। শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, "নালু পাটনা নামক কবিওয়ালার দলেও রামপ্রসাদ নামক একজন কবি ছিলেন। যথা,

"যেমন ঢাকের পিঠে বাঁয়া থাকে বাজে নাকো একটী দিন।
তেমনি নালুর দলে রামপ্রসাদ একটিন॥"

সুতরাং এ স্থলে এরূপও অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই রামপ্রসাদই উল্লিখিত দ্বিজ রামপ্রসাদ; অথবা দ্বিজ রামপ্রসাদ অন্য কোন ব্যক্তিও হইতে পারেন। এইরূপ অনুমান করিবার কারণ সম্বন্ধে মৃত দয়ালচাঁদ ঘোষ মহাশয় বলিয়াছেন যে, যে সকল সঙ্গীতে দ্বিজ রামপ্রসাদ ভণিতা আছে, সে সকল অপেক্ষাকৃত অনেক লঘু ভাবাত্মক, তবে রচনা ও সুরের বিভিন্নতা অল্প, সন্দেহ নাই। যাহা হউক এ সম্বন্ধে প্রকৃত কথা জানিবার কোন উপায় নাই। দয়াল বাবু বলিয়াছেন, "যদিও কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ ভিন্ন দ্বিজ রামপ্রসাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্থির মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিলাম না, তথাপি পশ্চিম বাঙ্গালায় সেন রামপ্রসাদ ভিন্ন পূর্ব্ব বাঙ্গালায় এক জন দ্বিজ রামপ্রসাদ ছিলেন—আমার এ সংস্কার দূর হইল না।"

এক্ষণে সে কথা থাকুক। এ স্থলে তাঁহার বংশাবলী সম্বন্ধে কি জানা যায় দেখা যাউক। কবিরঞ্জন "বিদ্যাসুন্দরের স্থানে স্থানে নিজ পূর্ব্বপুরুষ ও বংশধরগণের পরিচয় দিয়াছেন। তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

"ধন হেতু মহাকুল পূর্ব্বাপর শুদ্ধ মূল
কীর্ত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।

দানশীল দয়াবন্ত শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত
প্রসন্না কালিকা কৃপাময়ী ॥
সেই বংশ সমুদ্ভূত ধীর সর্ব্ব গুণযুত
ছিলা কত কত মহাশয় ॥
অনচির দিনান্তর জন্মিলেন রামেশ্বর
দেবীপুত্র সরল হৃদয় ॥
তদঙ্গজ রাম রাম মহাকবি গুণধাম
সদা যাঁরে সদয়া অভয়া ।
প্রসাদ তনয় তাঁর কহে পদে কালীকার
কৃপাময়ী ময়ি কুরু দয়া ॥"

অন্যত্র,

জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ভবানী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী ।
যাঁর পাদপদ্ম আমি রাত্রি দিন সেবি ॥
ভগ্নীপতি ধীর লক্ষ্মীনারায়ণ দাস ।
পরম বৈষ্ণব কলিকাতায় নিবাস ॥
ভাগিনেয় যুগ্ম জগন্নাথ কৃপারাম ।
আমাতে একান্ত ভক্তি সর্ব্বগুণ ধাম ॥
সর্ব্বাগ্রজা ভগ্নী বটে শ্রীমতী অম্বিকা ।
তাঁর দুঃখ দূর কর জননী কালিকা ॥
গুণনিধি নিধিরাম বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ।
তাঁরে কৃপা দৃষ্টি কর মাতা জগন্মাতা ॥
জগদীশ্বরীকে দয়া কর মহামায়া ।
মমানুজ বিশ্বনাথে দেহ পদছায়া ॥
শ্রীকবিরঞ্জনে মাতা কহে কৃতাঞ্জলি ।
শ্রীরামদুলালে মাগো দেহ পদধূলি ॥"

আর এক স্থলে আছে,

" শ্রীমতী পরমেশ্বরী সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ সুতা ।
শ্রীকবিরঞ্জনে ভণে কবিতা অদ্ভুতা ॥"

ইহাঁ হইতেই স্পষ্ট দেখা যায় যে, তাঁহার বংশের আদিপুরুষ কৃত্তিবাস। " ধনহেতু মহাকুল" ও 'দানশীল দয়াবন্ত' প্রভৃতি

হইতে বেশ বুঝা যায় যে, এই বংশ বেশ ঐশ্বর্য্যশালী, দানশীল ও দয়াবন্ত ছিল। তবে রামপ্রসাদ ও তাঁহার পিতা নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়—নতুবা প্রসাদ অতি অল্প বয়সে লেখা পড়া ছাড়িয়া সামান্য গোমস্তাগিরি করিতে যাইতেন না।

যাহা হউক কৃত্তিবাস হইতে রামেশ্বর পর্য্যন্ত আর কাহারও নাম পাওয়া যায় না। এই রামেশ্বর রামপ্রসাদের পিতামহ এবং রাম রাম তাঁহার পিতা ছিলেন। রাম রাম সেনের দুই স্ত্রী। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে এক মাত্র পুত্র জন্মে, তাহার নাম নিধিরাম। দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে অম্বিকা ও ভবানী নাম্নী দুই কন্যা এবং রামপ্রসাদ ও বিশ্বনাথের জন্ম হয়। সুতরাং রামপ্রসাদ রাম রাম সেনের চতুর্থ সন্তান। রামপ্রসাদেরও পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী নাম্নী দুই কন্যা, এবং রামদুলাল ও রামমোহন নামে দুই পুত্র হয়। যখন বিদ্যাসুন্দর লিখিত হয়, তখন কনিষ্ঠ পুত্র রামমোহন জন্মায় নাই, এ জন্য তাহার নাম বিদ্যাসুন্দরের কোথাও উল্লিখিত নাই। রামমোহন রাম-প্রসাদের বৃদ্ধ বয়সের পুত্র। এই সমস্ত বিবরণ পরিশিষ্টের তালিকায় দেওয়া হইয়াছে।

রামপ্রসাদ বাল্যকালেই বাঙ্গালা, সংস্কৃত, পারস্য ও হিন্দি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি এত অল্প বয়সে এরূপ লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন বলিয়া বিস্ময়াপন্ন হইবার কোন কারণ নাই। এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। যৌবনের প্রারম্ভেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়, সুতরাং সংসারের সমুদায় গুরুভার তাঁহার উপর পড়ে। তিনি কৌলিক চিকিৎসা ব্যবসা শিক্ষা করেন নাই। অগত্যা তাঁহাকে চাকুরির অনু-সন্ধান করিতে হইয়াছিল। তখন জমীদার বা মহাজনের ঘরে ব্যতীত অন্যত্র চাকুরি হইত না। সুতরাং রামপ্রসাদ কলিকাতায় এক মুহুরিগিরি চাকুরি খুঁজিয়া লয়েন। বোধ হয় তখন তাঁহার বয়স ১৭। ১৮ বৎসরের অধিক নহে। কোন্ ধনবানের গৃহে তিনি এই কর্ম্মে নিযুক্ত হন, তাহা

স্পষ্ট ঠিক করা যায় না। শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন যে, কাহারও মতে ভূকৈলাশের দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল, কাহারও মতে নবরঙ্গকুলাধিপ দুর্গাচরণ মিত্রই তাঁহার প্রভু ছিলেন। রামপ্রসাদ বড় স্বাধীনচেতা ছিলেন তাই কোথাও ভণিতায় ভারতচন্দ্রের "আজ্ঞা দিল কৃষ্ণচন্দ্র ধরণীঈশ্বর" মত তিনি তাঁহার পালক রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অথবা এই ধনবান লোকের নাম করেন নাই। কেবল কোন কোন স্থলের ভণিতায় আছে—

"শ্রীরাজকিশোরাদেশে শ্রীকবিরঞ্জন।
রচে গান মহা অন্ধের ঔষধ অঞ্জন॥"

এই রাজকিশোর যে কে তাহা স্থির করা যায় না। ইনি সম্ভবতঃ তাঁহার প্রভু অথবা তাঁহার কোন বংশধর হইতে পারেন।

প্রাক্তন জন্মের সংস্কার জন্যই হউক, অথবা যে কারণেই হউক, অতি অল্পবয়সেই রামপ্রসাদের অসাধারণ কবিত্ব শক্তি ও ঈশ্বরভক্তি মনে বিকাসিত হইয়াছিল। শুনা যায় যে, তিনি ষোল বৎসর বয়সের সময়ই অসাধারণ কবিত্ব শক্তি দেখাইয়াছেন। ভারতচন্দ্রও পনর বৎসর মাত্র বয়সে, অতি অল্পসময়ে সত্যনারায়ণের কথা রচনা করিয়াছিলেন। বাস্তবিক যিনি প্রকৃত কবি তাঁহার এই শক্তি অতি অল্প বয়সেই বিকাসিত হয়। এইরূপ যাহার ভক্তি প্রভৃতি উচ্চ মনোবৃত্তি গুলি স্বাভাবিক, তাহাও বাল্যকাল হইতে পরিস্ফুট হইতে দেখা যায়। "সাধকেন্দ্র" রামপ্রসাদও বোধ হয় অতি শিশুকাল হইতেই ধর্ম্মভীরু ও কালীভক্ত ছিলেন। তাই অতি অল্পবয়সেই সেই ভক্তিবৃত্তি তাঁহার মনে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। অকস্মাৎ পরিবারের ভার তাঁহার উপর পতিত হওয়ায়, তিনি দিগ্‌বিদিক্ বিবেচনা শূন্য হইয়া চাকুরী স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার মন উঠিল না। তাঁহার মন ঈশ্বরে পরিপূর্ণ ছিল। বিষয় কর্ম্মে মন যাইত না। তিনি সর্ব্বদা কালীর ভাবে

মোহিত হইয়া থাকিতেন। তাঁহার ইষ্টদেবতার সঙ্গে যেন সর্ব্বদা কথা বার্ত্তা হইত। তাঁহার মনের ভাব স্বতঃই সুমধুর সঙ্গীতে ব্যক্ত হইত। সে সময়ে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকিত না, সুতরাং হিসাবের পাকা খাতার কথাও তাঁহার মনে থাকিত না—তাহারই পার্শ্বে অজ্ঞাতসারে সেই গানগুলি লিখিয়া ফেলিতেন। তিনি উল্লিখিত ব্যবসাদার ধনীর তহবিলদারা ও মুহুরিগিরি পাইয়াছিলেন বটে—কিন্তু তিনি সে সকল বাহ্যিক কথা ভুলিয়া গিয়া কালীর তহবিলদার হইয়া পড়িতেন।

এইরূপে কিছু দিন তাঁহার মুহুরিগিরি চলিল। এক দিন দৈববলে, তাঁহার উপরিতন কর্ম্মচারী এই সকল খাতা দেখিয়া ফেলিলেন। দেখিলেন যে রামপ্রসাদ পাকা খাতা কাঁচাইয়া বসিয়াছে, তাহার চারিদিকে মক্‌স করিয়া কি হিজি বিজি লিখিয়া রাখিয়াছে। এই কর্ম্মচারী নিতান্ত ব্যবসাদার—সুতরাং স্থূলদৃষ্টি সম্পন্ন। সে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া এই অপকর্ম্মের কথা তাহার প্রভুকে গিয়া জানাইল।

বাঙ্গালার শুভাদৃষ্ট বলিতে হইবে যে, রামপ্রসাদের প্রভু ধীর গুণগ্রাহী ও ঈশ্বরপরায়ণ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত মনযোগের সহিত রামপ্রসাদের সঙ্গীতগুলি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। ইহার মধ্যে "আমায় দে মা তবিলদারী" এই প্রথম গীতটী তাঁহাকে একেবারে মুগ্ধ করিল। তিনি বুঝিলেন বালক রাম-প্রসাদ সামান্য নহে। তাঁহার জীবনের ব্রত অতি উচ্চতর—সামান্য মুহুরিগিরি করা তাঁহার উপযুক্ত নহে। তিনি তখনি রামপ্রসাদকে নিকটে ডাকিলেন। এবং অনর্থক সংসার চিন্তা হইতে বিরত হইয়া, এই মহত্তর কার্য্যে দীক্ষিত হইতে তাঁহাকে উপদেশ দিলেন। সুধু তাহাই নহে তিনি রাম-প্রসাদের মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন।

এই ঘটনা হইতেই প্রসাদের ভাবী জীবনের পথ পরি-

স্কার হইল। তিনি এই বৃত্তি পাইয়া সংসারের ভার হইতে মুক্ত হইলেন। তাঁহারসংসার বন্ধন ঘুচিল—মন স্বাধীন হইল। তিনি নিজ ইষ্টদেবতার সাধনায় মনযোগ দিলেন। এবং তাহার পরেই নিজ বাটী গিয়া তথায় পঞ্চমুণ্ডী আসন প্রস্তুত করিয়া, রীতিমত তান্ত্রিকী কালীসাধনায় নিযুক্ত হইলেন।

রামপ্রসাদ কোন সময়ে বিবাহ করেন, তাহা ঠিক বলা যায় না। ইহা ব্যতীত ভণিতার কোন স্থানে তাঁহার শ্বশুর কুলের নামোল্লেখ নাই। কেহ কেহ বলেন, অনুমান বাইস বৎসর বয়সে প্রসাদ বিবাহ করেন। তাহা হইলে এই ঘটনার পরে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল বলিতে হইবে। রামপ্রসাদের ধারণা ছিল যে, তিনি পূর্ব্বজন্মে কালীভক্ত ছিলেন, কিন্তু এজন্মে তাঁহা অপেক্ষা তাঁহার স্ত্রী অধিকতর সৌভাগ্যবতী। কেননা তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, স্বপ্নযোগে কালী তাঁহার স্ত্রীকে দেখা দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার নিকট কখনও প্রকাশিত হন নাই। তিনি একস্থলে বলিয়াছেন,

"ধন্যাদারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে।
আমি কি অধম এত বৈমুখ আমারে॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব।
কহিবার কথা নয় বিশেষ কি কব॥"

সে যাহা হউক তিনি সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মনোমত সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই।—

"শ্রীমণ্ডপে জাগ্রত শৈলেশ পুত্রী যথা।
নিশাকালে চরিতার্থ শ্রীরঞ্জন তথা॥
কিঞ্চিৎ তিষ্ঠিলে ফলাপেক্ষা ছিল কিবা।
ক্ষীণ পুণ্য দেখি বিড়ম্বনা কৈল শিবা॥"

কালী সাধনায় সিদ্ধ হইলে, কালী আসিয়া সাধকের নিকট প্রত্যক্ষ হন, বোধহয় প্রসাদের তত দূর হয় নাই, তাই তাঁহার এত আক্ষেপ। বিদ্যাসুন্দর পাঠে বুঝা যায় যে, তিনি শবসাধনা প্রভৃতি কঠিন সাধনার গূঢ় রহস্য জানিতেন, গুরূপদেশে কোন রূপ গুহ্য সাধনই তাহার অপরিজ্ঞাত ছিল না, বোধ

হয়, তিনি এই সমস্ত সাধনই করিয়াছিলেন। তিনি শব সাধনার বর্ণনায় বলিয়াছেন,

"জ্ঞাত নহি বলে কেহ না করিবে হেলা।
বিষম বিষয় কাল সর্প নিয়া খেলা॥
স্বকীয় কল্যাণ কিন্তু চিন্তা করা চাই।
ভঙ্গীতে সঙ্খেপে কিছু কিছু কয়ে যাই॥"

এই সাধনা সম্বন্ধে প্রসাদের গুরু কে ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। একথা প্রসাদ কোথাও ব্যক্ত করেন নাই। কারণ

"গুরু মন্ত্র ইষ্ট মন্ত্র পরমায়ু ধর্ম্ম।
ব্যক্ত করা মত নহে এসকল কর্ম্ম॥"

তবে এক স্থলে তাঁহার ভণিতায় আছে,

"কৃপানাথ উপদেশ প্রসাদ ভক্তের শেষ
প্রাণ দান দিয়া লৈতে চায়।"

ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, কৃপানাথ তাঁহার গুরুর নামও হইতে পারে।

সে যাহা হউক, সঙ্গীতই তাঁহার সাধনা ও উপাসনার প্রধান অঙ্গ ছিল। যথাস্থানে আমরা তাহার বিষয় উল্লেখ করিব।

রামপ্রসাদের বাসস্থান কুমারহট্ট গ্রাম মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জমীদারিভুক্ত ছিল। এই স্থান গঙ্গার নিকটস্থ বলিয়া মহারাজা এস্থানে এক ধর্ম্মাধিকরণ ও বায়ুসেবনালয় নির্ম্মাণ করেন। অবসর ক্রমে তিনি মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া বিশ্রাম করিতেন। সকলেই জানেন, তৎকালে তাঁহার ন্যায় গুণজ্ঞ, বিদ্যার উৎসাহদাতা, এদেশে আর কেহই ছিলনা। এদেশের প্রায় সকল প্রধান পণ্ডিতই তাঁহার সভাসদ ছিলেন। সকলেরই উপযুক্তমত বৃত্তি নির্দ্ধারিত ছিল। হরিরাম, গোপাল, বীরেশ্বর, রামেশ্বর, শিবরাম, বলরাম, শঙ্কর, দেবল, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি অনেক বিদ্যাবিশারদগণ তাঁহার সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তাঁহার সভায় মুক্তারাম, হাস্যবি

গোপাল ভাঁড় প্রভৃতি রসিক ও পরিহাসজ্ঞ লোকও ছিলেন। গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় তাঁহার দ্বারা উৎসাহিত হইয়া ছিলেন বলিয়াই, তাঁহার কবিতাপ্রসুন প্রস্ফুটিত হইয়া আজিও বাঙ্গালাকে আমোদিত করিতেছে। সুতরাং এ রূপ গুণগ্রাহী লোকের নিকট যে রামপ্রসাদ অধিক দিন অপরিচিত থাকিবেন, তাহা সম্ভব নহে।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যখন কুমারহট্টে বাস করিতেন, তখন মহারাজা রামপ্রসাদকে আহ্বান করিয়া তাঁহার সহিত নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেন, এবং তাঁহার ভক্তিপূর্ণ সঙ্গীত শুনিয়া পরমানন্দিত হইতেন। এ সময়ে ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট পরিচিত হন নাই। সেই জন্য তিনি রামপ্রসাদের অসাধারণ কবিত্ব শক্তি ও পরমার্থিক ভাব দেখিয়া তাঁহাকে সভাসদ করিবার মনস্থ করিলেন। কিন্তু রামপ্রসাদ সম্পূর্ণ সংসারবিরাগী ও বাসনাশূন্য ছিলেন। তিনি জানিতেন, "ক্ষিপ্ত যে স্বধর্ম্ম খোয়ায় খোসামোদে।" "আমি তাই অভিমান করি, আমায় করেছ গো মা সংসারী" প্রভৃতি গীতই তাহার পরিচয়। সুতরাং তিনি এই সুবিধাজনক রাজপ্রসাদ গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ইহাতে কোন রূপ বিরক্ত না হইয়া রামপ্রসাদকে একশত বিঘা নিষ্কর ভূমি, ও 'কবিরঞ্জন' উপাধি প্রদান করিলেন। সুধু সঙ্গীতের কবিত্ব দেখিয়া যে মহারাজ তাঁহাকে কবিরঞ্জন উপাধি দিয়াছিলেন, তাহা আমাদের বোধ হয় না। তিনি অবশ্য রামপ্রসাদের কবিত্ব শক্তি কাব্যের দ্বারা পরিচয় পাইয়াছিলেন। কিন্তু সে কাব্য এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য। তাঁহার বিদ্যাসুন্দর এই ঘটনার পরে লিখিত হয়—কারণ ভণিতাতেই তাহা প্রকাশ আছে। তবে এই বিদ্যাসুন্দরের শেষে অষ্টমঙ্গলা পাঠে বোধ হয় যে, তাঁহার অন্য কাব্যও ছিল। যাহা হউক, পরে যত দূর সম্ভব এ কথার মীমাংসা করা যাইবে।

কবিরঞ্জনের জীবনের সহিত কুমারহট্টনিবাসী অচ্যুত গোস্বামীর (কেহ কেহ বলেন অযোধ্যারাম গোস্বামী) সহিত

কতকটা সম্বন্ধ আছে। ইহাঁর চলিত নাম আজু গোঁসাই। ইনি বৈষ্ণব ছিলেন সুতরাং কালীভক্ত রামপ্রসাদের সহিত ইহাঁর বিবাদ ছিল। রামপ্রসাদ যে গান করিতেন—অনেক সময় ইনি তাহার পালটা স্বরূপ গান বাঁধিতেন। অনেকে ইহাঁকে পাগল বলিত। কিন্তু ইনিও এক জন কবি, ভক্ত ও ভাবুক ছিলেন সন্দেহ নাই। কুমারহট্টে অবস্থিতি কালে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মধ্যে মধ্যে রামপ্রসাদ ও আজু গোঁসাইকে একত্রিত করিয়া, তাঁহাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগাইয়া দিয়া আমোদ করিতেন। মহারাজা বৈষ্ণবদিগের উপর তত শ্রদ্ধাবান ছিলেন না বলিয়াই হউক, অথবা আজু গোঁসাইয়ের কবিত্বশক্তি উৎসাহের উপযুক্ত ছিল না বলিয়াই হউক—তিনি তাহাকে রীতিমত উৎসাহ দেন নাই।

অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এস্থলে রামপ্রসাদ ও আজু গোঁসাইয়ের উত্তর প্রত্যুত্তর দুই একটী উদ্ধৃত হইল।

রামপ্রসাদের গান :— "এসংসার ধোঁকার কাটি।
ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি॥—"ইত্যাদি।

আজু গোঁসাই —"এসংসার সুখেরে কুটি।
ওরে খাই দাই মজা লুটি॥
যার যেমন ধন, তেমনি ধন মন, করবে পরি পাটী।
ওহে সেন, অল্প জ্ঞান, বুঝ কেবল মোটামুটী।
ওরে ভাই বন্ধু দারা সুত পিঁড়ি পেতে দেয় দুধের বাটী॥"

রামপ্রসাদের গান।— "মুক্ত কর মায়া জালে।"
আজু গোঁসাই। "বদ্ধ কর মা খেপ্‌লা জালে।
যাতে চুণ পুঁটী এড়বেনা, মজা মার্‌ব ঝোলে ঝালে॥"

রামপ্রসাদ আজুগোঁসাইকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—
"কর্ম্মের ঘাট, তেলের কাট, আর পাগলের ছাট।
মোলেও যায় না॥"

আজু গোঁসাই উত্তর দিয়াছিলেন,—
"কর্ম্ম ডোর, স্বভাব চোর, আর মদের ঘোর মলেও যায় না॥"

রামপ্রসাদের স্ত্রী বৃদ্ধ বয়সে গর্ভবতী হন—আজু গোঁসাই বিদ্রুপ করিয়া বলেন,

"তুমি ইচ্ছা সুখে ফেলে পাশা কাঁচায়েছ পাকা ঘুঁটী ॥"

এই কয়টী সামান্য ঘটনা ব্যতীত রামপ্রসাদের জীবনের আর কোন ঘটনা জানা যায় না। বাস্তবিক, যাঁহাদের জীবন কর্ম্মময়—ঘটনাই যাঁহাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন, তাঁহাদের জীবনেই ঘটনাবৈচিত্র্য আছে। বীরদিগের ঐতিহাসিক জীবনই ঘটনাময়। নতুবা যাঁহাদের ভাবময় জীবন, যাঁহারা সংসারের কোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া, নির্লিপ্ত ভাবে নির্ব্বিবাদে জীবন অতিবাহিত করেন, তাঁহাদের জীবনে বৈচিত্র্য কোথায়?—তাঁহাদের জীবনে বহুল ঘটনার সমাবেশ কোথায়? এই জন্যই অধিকাংশ কবিদিগের জীবন চরিত পাওয়া যায় না। বাস্তবিক তাঁহাদের কৃত কাব্যের সহিত তাঁহাদিগের জীবন একীভূত হইয়া যায়—সুতরাং কাব্য ব্যতীত তাঁহাদের জীবনের স্বতন্ত্র সত্বা থাকে না। ভাববৈচিত্র্যেই রামপ্রসাদের জীবনের বৈচিত্র্য—কাব্য ও সংগীতে তাঁহার সেই ভাব পূর্ণস্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। সুতরাং সেই কাব্য ও সঙ্গীত ব্যতীত তাঁহার জীবনের আর কিছু আমাদের জানিতে যাওয়া অন্যায় অথবা অনর্থক। যদি শক্তিবিশেষের সমাবেশই আমাদের জীবন হয়, আর যদি সেই শক্তির ক্রিয়ার দ্বারা মানুষের মনুষ্যত্বের পরিমাণ করিতে হয়, তবে রামপ্রসাদের সাধনা ও সঙ্গীতে সেই শক্তির পূর্ণ বিকাশ ও ক্রিয়া হইয়াছিল বলিয়া, সেই সকল সঙ্গীত ব্যতীত রামপ্রসাদের জীবনে আর কিছুই জ্ঞাতব্য থাকিতে পারে না।

বাস্তবিক রামপ্রসাদ কোন সময়ে কত বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা পর্য্যন্তও জানা যায় না। তবে নিষ্ঠ সাধুপুরুষের প্রায়ই দীর্ঘজীবন হয়—রামপ্রসাদের তাহাই হইয়াছিল সম্ভব। বিশেষতঃ তাঁহার "লাখ উকীল" অথবা লক্ষ সঙ্গীত রচনা করা যদি সত্য হয়, তবে অবশ্য তিনি দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন, নতুবা এত গীত রচনা করা সম্ভবে না।

আর এক কথা—তাঁহার শেষ পুত্র হইলে বৃদ্ধ বয়সের পুত্র বলিয়া আজু গোঁসাই রহস্য করিয়া "তুমি ইচ্ছা সুখে ফেলে পাসা" প্রভৃতি যাহা বলিয়াছিল, তাহা হইতেও বোধ হয় যে রামপ্রসাদ বৃদ্ধ বয়সেই মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সজ্ঞান মৃত্যুর গল্পেও সেই কথা প্রমাণিত হয়—নিম্নে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

সাধক রামপ্রসাদের জীবন সম্বন্ধে কতকগুলি অলৌকিক উপাখ্যান আছে। অদ্যাপি অনেকে তাহা বিশ্বাস করেন। নিম্নে তাহার কয়েকটী উদ্ধৃত হইল।

১। এক দিন রামপ্রসাদ বেড়া বাঁধিতেছিলেন ও আপন মনে গান করিতেছিলেন। বেড়ার অপর পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহার কন্যা জগদীশ্বরী তাঁহাকে সাহায্য করিতেছিলেন। জগদীশ্বরী কার্য্যান্তরে হঠাৎ সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু রামপ্রসাদ তাহা দেখেন নাই। কিন্তু দড়ী পূর্ব্বমত বেড়ার অপর পার্শ্ব হইতে ফিরাইয়া দেওয়া হইতেছিল। জগদীশ্বরী ফিরিয়া আসিয়া বেড়া বাঁধা অনেক দূর হইয়াছে দেখিয়া—কে দাড় ফিরাইয়া দিতেছিল জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন রামপ্রসাদ বলিলেন, "কেন মা তুমিই ত এতক্ষণ দাড় ফিরাইয়া দিতেছিলে"। তখন রামপ্রসাদ সকল কথা জানিলেন—বুঝিলেন যে, স্বয়ং দেবী তাঁহার কন্যারূপে দড়ী ফিরাইয়া দিতেছিলেন।

আর একদিন রামপ্রসাদ গঙ্গা স্নান করিয়া বাটী আসিলে তাঁহার মাতা বলিলেন, রামপ্রসাদ কে এক জন স্ত্রীলোক তোর গান শুনিতে আসিয়াছিল, তোর দেখা না পাইয়া চণ্ডীমণ্ডপে কি লিখিয়া গিয়াছে? রামপ্রসাদ ভক্তি গদ্‌গদ্ ভাবে দেখিলেন, কাশী হইতে স্বয়ং অন্নপূর্ণা তাঁহার গান শুনিতে আসিয়াছিলেন। রামপ্রসাদ তখনই আর্দ্র বস্ত্রে মাতাকে সঙ্গে লইয়া "মন চল রে বারাণসী" ইত্যাদি গান করিতে করিতে কাশী যাত্রা করিলেন—এবং ত্রিবেণীর নিকটস্থ কোন গ্রামে গিয়া সে রাত্রি অবস্থান করিলেন। সেই রাত্রিতে অন্নপূর্ণা তাঁহাকে কাশী না গিয়া সেই খানেই গান শুনাইতে বলেন।

রামপ্রসাদ "কাজ কি আমার কাশী" "কাজ কি রে মন যেয়ে কাশী" প্রভৃতি গান করিয়া সেবার বাটী ফিরিয়া আসেন।

৩। শিবা শিবারূপ ধারণ করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৪। তিনি গাব গাছ হইতে পদ্ম নাবাইয়া কালীপূজা করিয়াছিলেন।

এই সকল অলৌকিক ঘটনা সম্বন্ধে প্রসাদপ্রসঙ্গকার লিখিয়াছেন, "এই সকল ঘটনা সাংসারিক ভাবে অলৌকিক ও অসম্ভব, কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাবে নিতান্ত সঙ্গত।

৫। রামপ্রসাদের মৃত্যু সম্বন্ধে এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, তিনি পূর্ব্বেই আপনার মৃত্যুর কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তদনুসারে তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বরাত্রে কালীপূজা করেন। পরদিন বিসর্জ্জনের সময়, আপন পরিবারদিগকে নিজ আসন্নকাল উপস্থিত জানাইয়া, সকলের সহিত গান গাহিতে গাহিতে গঙ্গাতীরে গমন করেন। এবং গঙ্গায় কালী বিসর্জ্জন দিয়া অর্দ্ধনাভি গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া, চারিটী গান করেন। "কালী গুণ গেয়ে বগল বাজায়ে" "বল দেখি ভাই কি হয় মলে," "নিতান্ত যাবে দিন" এই তিনটী গান গাহিয়া পরে "তারা তোমার আর কি আছে মনে" এই গানের "মাগো ওমা আমার দফা হল রফা দক্ষিণান্ত হয়েছে" এই শেষ অংশটুকু গাহিবামাত্র, ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া রামপ্রসাদের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। "তাঁহার মৃত্যু রোগে হয় নাই—ভাবে মৃত্যু।" বাস্তবিক যেমন কাচময় গৃহে আবদ্ধ থাকিলে—বাহিরের সমস্ত বস্তুই নখদর্পণে দেখা যায়—অথচ তাহার নিকট যাওয়া যায় না—সেইরূপ সিদ্ধ পুরুষগণও এই দেহ মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া সমস্ত অতীন্দ্রিয় বিষয়ই নখদর্পণে দেখিতে পান। প্রসাদ নিজ মৃত্যু সময় বুঝিবেন—ইহা আশ্চর্য্য কি? এখনও মধ্যে মধ্যে কোন কোন লোকের এইরূপ আশ্চর্য্য মৃত্যুর কথা শুনা গিয়াছে।

রামপ্রসাদ তান্ত্রিক মতাবলম্বী সাধক ছিলেন সুতরাং তিনি

উপাসনার অঙ্গ বোধে কিঞ্চিৎ সুরা পান করিতেন। ইহাতে অনেকে তাঁহাকে মাতাল বলিত—কিন্তু তিনি তাহাতে ক্রুদ্ধ হইতেন না। শুনা যায় একদিন তথাকার প্রসিদ্ধ অধ্যাপক বলরাম তর্কভূষণ তাঁহাকে মাতাল বলিয়া বিদ্রূপ করায়, তিনি তাহার উত্তরে গাহিয়াছিলেন—

"সুরাপান করিনে আমি
সুধা খাই রে কুতূহলে।
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ,
মদ-মাতালে মাতাল বলে॥"

এক্ষণে কবিরঞ্জনের গ্রন্থের কথা বলা যাউক। "তাঁহার গ্রন্থমধ্যে কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দরই বৃহৎ ও প্রধান।" ইহা ব্যতীত কালীকীর্ত্তনই রামপ্রসাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য। ইহাতেই তাঁহার রচনাশক্তির বিশেষ বিকাস দেখা যায়। যিনি সমস্ত জীবন কালীসাধনায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন, কালীতে আহার, কালীতে বিহার, কালীতে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহার কালীকীর্ত্তন যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হইবে, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বলিয়াছেন,"রামপ্রসাদের কালীকীর্ত্তনের রচনা মহাকাব্যের মত সুশৃঙ্খল নিবদ্ধ নহে—উহার অধিকাংশই কেবল গানময়। ঐ সকল গীতে যে অতি উৎকৃষ্ট রচনা আছে তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।"

এই দুই খানি কাব্য ব্যতীত রামপ্রসাদ কৃষ্ণকীর্ত্তন ও শিবকীর্ত্তন নামক আরও দুই খানি কাব্য রচনা করেন। কিন্তু এই দুই খানি পুস্তকই এখন পাওয়া যায় না। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় অনেক অনুসন্ধান করিয়াও উহার কয়েকটি শ্লোক বই বাহির করিতে পারেন নাই।

সে যাহা হউক, কবিরঞ্জনের পদাবলীই তাঁহার অতুলকীর্ত্তি। সঙ্গীত সাধনই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। বাল্যকাল হইতে যখনই তাঁহার মনে ভক্তির উদয় হইত, তখনই তিনি সঙ্গীতে তাঁহার মনোভাব প্রকাশ করিতেন।

প্রসাদের জীবনই ভক্তিময় ছিল, সুতরাং তাঁহার মনে সর্ব্বদা সেই ভক্তিরই উচ্ছ্বাস হইত। এইকারণ তাঁহার গীত রচনায় কালাকাল, স্থান অস্থান ছিল না, প্রায় সর্ব্বদাই তাহার মুখ হইতে স্বতঃই সঙ্গীত নির্গত হইত। আমরা অনেক সাধকের কথা শুনিয়াছি, তাঁহারা নিজ ইষ্টদেবতার পূজার পরে প্রত্যহ তাঁহার মহিমাব্যঞ্জক সঙ্গীত রচনা করিয়া প্রথমে তাহা গান করিয়া তবে আসন হইতে উঠিতেন। কবিরঞ্জন যে সুধু পূজার পর এরূপ গীত রচনা করিতেন, তাহা নহে—যখনই তাঁহার মনে ভক্তির উচ্ছ্বাস হইত, তখনি সঙ্গীতে তাহা ব্যক্ত করিতেন।

রামপ্রসাদ এইরূপ মুখে মুখে অবলীলাক্রমে গান রচনা করিতে পারিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে সিদ্ধ পুরুষ বলিত। সঙ্গীতরচনা করিতে তাঁহাকে তিলার্দ্ধও ভাবিতে হইত না। তিনি কখনও পরকে সন্তুষ্ট করিবার মানসে, বা যশস্বী হইবেন বলিয়া সঙ্গীত রচনা করিতেন না। তিনি যে অবলীলাক্রমে সঙ্গীত রচনা করিতে পারিতেন, তাহার প্রমাণ স্বরূপ দুই একটি ঘটনা উদ্ধৃত হইল।

কোন সময়ে রথ যাত্রা উপলক্ষে রাজা নবকৃষ্ণ রামপ্রসাদের সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহাকে রথ সম্বন্ধে গান শুনাইতে আদেশ করিলেন।

রামপ্রসাদ তখনি গাইলেন,

"কালী কালী বল রসনারে।
ঐ ষট্‌চক্রে রথ মধ্যে শ্যামা মা মোর বিরাজ করে॥" ইত্যাদি

আর একদিন মহারাজা নবকৃষ্ণ দোলযাত্রা উপলক্ষে প্রসাদকে গান করিতে বলিলেন। প্রসাদ গাহিলেন,

"হৃদ্-কমল-মঞ্চে দোলে করাল বদনী শ্যামা।
মন পবনে দোলাইছে দিবস রজনী ওমা॥"

কোন সময়ে রামপ্রসাদ চড়ক দেখিতে গিয়া ভাবে বিভোর হইয়া গাহিলেন,

ওরে মন চড়কী চড়ক কর এ ঘোর সংসারে॥

একদা রামপ্রসাদ কাশী গিয়াছিলেন। তিনি তথায় সমুদায় দেবতা দেখিলেন—কিন্তু বেণীমাধব দর্শন করেন নাই। তখন অন্নপূর্ণা বেণীমাধবরূপে স্বপ্নে রামপ্রসাদকে দেখা দিলেন। ঘুম ভাঙ্গিলেই রামপ্রসাদ গাহিলেন,

"কালী হলি মা রাসবিহারী।
নটোবর বেশে বৃন্দাবনে॥"

দেবী অন্নপূর্ণার আদেশে তাঁহাকে গান শুনাইতে কাশী যাইতে যাইতে, পথিমধ্যে স্বপ্নে অন্নপূর্ণাকে গান শুনাইবার আদেশ পাইয়া তৎক্ষণাৎ যে গান গাইয়াছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

ইহা হইতেই স্পষ্টই দেখা যায় যে,রামপ্রসাদ অসংখ্য সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিান কখন স্বরচিত সঙ্গীত কাগজে কলমে লিখিয়া রাখিতেন না—আর তখন বোধ হয় সেরূপ রীতিও ছিল না। বিশেষ তিনি বোধ হয়, এক সঙ্গীত কখন দুইবার গাহিতেন না। কারণ তিনি শক্তিসাধনার জন্য প্রত্যহ নূতন সঙ্গীত রচনা করিতেন। রচিত সঙ্গীত কেমন হইল, তাহা তাঁহার ভাবিয়া দেখিবারও অবসর ছিল না। যে সকল সঙ্গীত অন্য লোকে তাঁহার নিকট শুনিয়া ভাল বোধে অভ্যাস করিত, তাহাই ক্রমে লোক পরম্পরায় প্রচলিত হইয়াছে। বাকী সমস্ত সঙ্গীতই আর পাইবার উপায় নাই। বোধ হয় যে, তাঁহার সঙ্গীতের এক সহস্রাংশও এখন পাওয়া দুষ্কর, আবার যাহা পাওয়া যায়, তাহারও পাঠে অনেক ব্যতি-ক্রম হইয়া গিয়াছে।

প্রসাদের একটী গানে "লাক উকীল করেছি খাড়া" এই কথার উল্লেখ আছে। ইহাতে অনেকেই অনুমান করেন যে, তিনি লক্ষ গাত রচনা করিয়াছিলেন। বাস্তবিক তিনি যেরূপ শিশুকাল হইতেই সাধনা ও সঙ্গীত রচনা আরম্ভ করিয়া-ছিলেন, ও যেরূপ বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন বোধ হয়, তাহাতে যে তিনি যে লক্ষ সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাহা আশ্চর্য্য নহে।

কবিরঞ্জন সঙ্গীতে বড়ই ভক্ত ছিলেন। বিদ্যাসুন্দরে যেস্থলে শবসাধনার বর্ণনা করেন, সেস্থলে তিনি আপনার ভাবে আপনি মুগ্ধ হইয়া নিজের সঙ্গীতপ্রিয়তার পরিচয় দিয়া বলিয়াছেন,—

"গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হব মত্ত।"

সুধু যে প্রসাদ সঙ্গীত রচনা করিতেন, তাহা নহে। তিনি নিজ রচিত সঙ্গীতগুলি অতি সুন্দর করিয়া গাহিতেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর তত মিষ্ট ছিল না সত্য। কিন্তু নিজ রচিত গানগুলি গাহিয়া পাষাণকেও দ্রব করিতে পারিতেন। বিশেষতর তাঁহার "প্রসাদী সুর" এত সহজ ও এত হৃদয়ভেদী যে, তাহাতে লোকে সহজেই মোহিত হয়, অথচ যে আদৌ সঙ্গীত জানে না, সেও তাহা গাহিতে পারে। অতি অল্প বয়সেই রামপ্রসাদ এই সুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারাই তাঁহার ভাবুকতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। রামপ্রসাদ যে বলিয়াছিলেন,

"ন বিদ্যা সঙ্গীত পর"

তাহা যথার্থ বটে। তাঁহার নিকট কাব্যও সঙ্গীত অপেক্ষা নিকৃষ্ট, এই জন্যই তাঁহার বিদ্যাসুন্দর অপেক্ষা সঙ্গীত এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

কবিরঞ্জনের গানের মোহিনী শক্তি সম্বন্ধে এইরূপ গল্প আছে যে, তিনি একদা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত মুরসিদাবাদে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি নৌকায় গঙ্গাবক্ষে বিচরণ করিতে করিতে এক মনে গান গাহিতেছিলেন। ঘটনাক্রমে পাষণ্ড সিরাজ সেই সময়ে জলবিহারে বহির্গত হইয়াছিলেন। তিনি রামপ্রসাদের গান শুনিয়া একেবারে মোহিত হইলেন, এবং তাঁহাকে নিজ নৌকায় ডাকাইয়া আনিয়া গান করিতে বলেন।

রামপ্রসাদ প্রথমে হিন্দী গান গাহিলেন। নবাব তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিলেন, "না ও গান নয়, ঐ নৌকায় যে গান গাহিতেছিলে, সেই গান গাও।" তখন রামপ্রসাদ প্রসাদী সুরে গান ধরিলেন। নিষ্ঠুর, বিধর্ম্মী, মূর্খ সিরাজের মন একেবারে বিগলিত হইয়া গেল।

যাহা হউক, এস্থলে প্রসাদের পদাবলীর সমালোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তিনি কোন শ্রেণীর সাধক ছিলেন, তাহাই আভাষে বুঝাইবার জন্য এসম্বন্ধে এত কথা বলা হইল। এক্ষণে কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর কিরূপ সামগ্রী, এবং প্রসাদ কোন শ্রেণীর কবি ছিলেন, তাহাই দেখা যাউক।

কবিরঞ্জনের বংশাবলী ।

(পরিশিষ্ট ।)

- রামেশ্বর সেন ।
  - রাম রাম সেন
    - (প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে)
      - নিধিরাম ।
    - (দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে)
      - অম্বিকা
      - ভবানী
      - রামপ্রসাদ সেন
        - পরমেশ্বরী
        - রামদুলাল সেন
          - রামচন্দ্র সেন
            - কালাচাঁদ সেন
            - গোরাচাঁদ সেন
        - জগদীশ্বর
        - রামমোহন সেন
          - জয়নারায়ণ সেন
            - গোপালকৃষ্ণ সেন
              - কালীপদ সেন ।
          - দুর্গাদাস সেন
      - বিশ্বনাথ ।

সূচীপত্র।

—◌*◌—

বিষয় পৃষ্ঠা।

বিষয় পৃষ্ঠা।

বিদ্যাসুন্দর।

গণেশ বন্দনা।

পরম পুরুষ প্রভু পুনঃ পুনঃ প্রণমহু
পর্ব্বতেশ-পুত্রী প্রিয়-সুত।
বিভু বেদবিদাম্বর বিনায়ক বিঘ্নহর
বারণবদন গুণযুত॥
তরুণ অরুণ অণু অতি জ্যোতির্ম্ময় তনু
আজানুলম্বিত ভুজদণ্ড।
আভরণ নানা মত মণি হেম মরকত
সিন্দূরে সুন্দর শুণ্ডগণ্ড॥
অদিতি-অঙ্গজ-শ্রেষ্ঠ আরোহণ আখু-পৃষ্ঠ
আসরে উরহ একবার।
জনে যদি জপে নাম যম জিনি যোগ্য ধাম
যায় তায় করি অধিকার॥
দেবদেব দীনবন্ধু দানে দেহি দয়াসিন্ধু
সবিশেষ উপদেশ সার।
শিব কর্ম্মে তুমি মূল হও শীঘ্র অনুকূল
আমি শিশু বঞ্চিত সংস্কার॥

রামরাম সেন নাম মহাকবি গুণধাম
সদা যারে সদয়া অভয়া।
তৎসুত রামপ্রসাদে কহে কোকনদ-পদে
কিঞ্চিৎ কটাক্ষে কর দয়া॥

সরস্বতী বন্দনা।

যত্নে পুটাঞ্জলি অতি বন্দে মাতা সরস্বতী
মহাবিদ্যা সরসিজাসনী।
কুচভর-নমিতাঙ্গী ভুবনমোহন ভঙ্গি
বিদ্যারূপা ব্রহ্মাণ্ডজননী॥
শ্বেতপদ্ম শ্রীচরণ হংসবধূ অনুক্ষণ
হৃদিমধ্যে বিহর মা নিত্য।
ক্ষুদ্র আমি ক্ষীণপ্রজ্ঞা পাল মাতা নিজ আজ্ঞা
কণ্ঠে বসি কহ সুকবিত্ব॥
নানা যন্ত্র তাল মাণ আলাপে মোহিত জ্ঞান
রাগ ছয় ছত্রিশ রাগিণী।
নবিদ্যা সংগীত পর যে গানে ত্রিপুরহর
দ্রব কৈলা দেব চক্রপাণি॥
সেই বস্তু এই গঙ্গা নির্ম্মল সুতুঙ্গ ভঙ্গা
কণা মাত্রে মহাপাপ হরে।
সত্য সত্য বেদে উক্তি দর্শনে কৈবল্য মুক্তি
স্নানফল কহিবে কি নরে॥
ব্যাস বাল্মীকাদি-চয় মহাকবি মহাশয়
তপ কৃপালেশে প্রাজ্ঞবান্।

বহু কষ্টে চিত্তে খেদ সঙ্কলন করি বেদ
নানা শাস্ত্র করিলা বিধান ॥
তব কৃপাদৃষ্টি যারে জগত জিনিতে পারে
ধরাতলে সেই জন ধন্য।
তুমি গো যাহারে বাম জিয়া তার কিবা কাম
মূঢ়মতি সে অতি জঘন্য ॥
তুমি বিশ্ব অন্তর্যামী স্তব কিবা জানি আমি
বেদাগমে অতুল্য মহিমা।
শ্রীপ্রসাদে বলে মাতা স্মরহর হরি ধাতা
কোনরূপে না পাইলা সীমা ॥

লক্ষ্মী বন্দনা।

কমলে কমলা বন্দে কোমল শরীর।
কমলচরণে শোভে মঞ্জুল মঞ্জীর ॥
গুরু উরু ডমরু-সুচারু মধ্যদেশ।
ত্রিবলী গভীর নাভি কি কব বিশেষ ॥
কান্তি মধ্যে উভ তটে গুপ্ত যুগ্মকোক।
তব রোমাবলী কুচকুম্ভ কহে লোক ॥
পঙ্কে বাস বিস সে কি বাহুদণ্ড অণু।
তুলা নহে বিসে কি সে ভেবে ক্ষীণ তনু ॥
নাসা তিলফুল তাহে বিলোল বেসোর।
পূর্ণচন্দ্র শোভা যেন পিবতি চকোর ॥
জিনিয়া আরক্ত মুক্তাফল দন্তশোভা।
বিম্বাধর প্রতিবিম্ব মুক্তা মনোলোভা ॥

খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি অঞ্জনে রঞ্জিত।
মনোহর মনোহর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ॥
নিন্দিয়া গৃধিনিশ্রুতি শ্রবণযুগল।
দরিদ্র-দ্রবিণ- আশা সুদীর্ঘ কুণ্ডল ॥
উপযুক্ত ভূষণ ভূষিত ঠাঁই ঠাঁই।
কি কব রূপের কথা ত্রিভুবনে নাই ॥
সর্ব্বগুণহীন যদি ধনবান্ হয়।
তৃণ তুল্য দ্বারে তার কত গুণালয় ॥
তব কৃপাপাত্র মাত্র ধরাতলে পূজ্য।
সত্ব দানে বিত্ত গুণে সে লভে সাযুজ্য ॥
যে গৃহিজনের প্রতি জন্মে তব কোপ।
কি তার ঐহিক ধর্ম্ম পূর্ব্ব ধর্ম্ম লোপ ॥
বিষম দারিদ্র্যদোষে গুণরাশি নাশে।
থাকুক আদর কেহ কথা না জিজ্ঞাসে ॥
কি আর কহিব বাড়া স্ত্রীপুত্র অবশ।
বিরস বদনে কহে বচন কর্কশ ॥
এ সর্ব্ব তোমার মায়া জানি গো জননী।
প্রসাদে প্রসন্না হও জলধিনন্দিনী।

কালী বন্দনা।

কলিকাল-কুঞ্জর-কেশরী কালী নাম।
জপিলে জঞ্জাল যায়, যায় যোগ্য ধাম ॥
কাল কর পৃথক চিন্তহ মনে এই।
লকারে ঈকার দীর্ঘ আসি বটে সেই ॥

রসনাগ্রে মুখ ভরে যত্ন করে লও।
ভক্তিগজ পৃষ্ঠে চড়ি যমজয়ী হও॥
ভয় নাহি ভয় নাহি ভয় নাহি আর।
শ্রীনাথ কহিলা তত্ত্ব বস্তু সারাৎসার॥
নাম নিত্যা নৃত্যতি নিখিল নাথ উরে।
বিপরীত কায লাজ পরিহরি দূরে॥
কাদম্বিনী জিনিয়া নির্ম্মল বর্ণ কালো।
কলেবর-কিরণ তিমিরপুঞ্জ আলো॥
কটিতটে করালি লম্বিত মুণ্ডমাল।
লোলজিহ্বা বিশালাক্ষী বদন বিশাল॥
হেরি বপু রিপুচয় ভয়ে কম্পবান।
বামে অসি মুণ্ড যাম্যে বরাভয় দান॥
অপরূপ শবযুগ শ্রবণযুগলে।
বিগলিত কুন্তল লোটায় ধরাতলে॥
বিবস্ত্রা যোগিনীঘটা দীর্ঘ জটা মাথে।
বিকট বদন সুধাপানপাত্র হাতে॥
সিত পীত লোহিত অসিত রূপ ছটা।
যুদ্ধে ক্রুদ্ধে ঊর্দ্ধমুখে গিলে রিপু ঘটা॥
হত রথী সারথি তুরঙ্গ করিবর।
শিবাকুলে শঙ্কুল শ্মশান শঙ্কাকর॥
একান্ত কাতর অতি মহী যায় তল।
অকালে প্রলয় সৃষ্টি মজিল সকল॥
অখিল জননী তব চরিত্র এমন।
হেদে গো করুণাময়ি এ আর কেমন॥

ধন্যা দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে।
আমি কি অধম এতো বৈমুখ আমারে ॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব।
কহিবার কথা নয় বিশেষ কি কব ॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ি ॥
আমি তুয়া দাস-দাস দাসীপুত্র হই ॥
অষ্টরসাধার জগদম্বা-পাদপদ্ম।
পরম রহস্য কথা শুন গুণসদ্ম ॥
বিলোকনে যে যে চিত্তে জন্মে যে যে রস।
বর্ণনা যোগ্যতা বটে কার্য্যকর্ত্তা যশ ॥
স্বকীয় সুন্দরী পাদপদ্ম হৃদে রাখি।
প্রোক্ত মাত্র সদাশিব বিঘূর্ণিত আঁখি ॥
মহাকবি পদ্ম প্রতি ঘৃণা জন্মে মনে।
কি গুণে তুলনা ছি ছি এ হেন চরণে ॥
দর্পে কহে মদন বিগত যুদ্ধ ভয়।
চির কালান্তরে পরিপূর্ণ পরাজয় ॥
চন্দ্র সূর্য্য এ কোন উদয় ত্রিভুবনে।
ক্রোধযুক্ত বিধুন্তুদ শক্র নিরীক্ষণে ॥
সতী সঙ্গি সভক্তি, হৃদয়পদ্মবৃন্দ।
নিতান্ত বিস্মিত বিরিঞ্চ্যাদি সুরবৃন্দ ॥
মহাভীতা ধরণী সুস্থির নহে প্রাণ।
চিন্তয়াতি কোন রূপে পাই পরিত্রাণ ॥
স্মেরমুখী সহচরীগণ মহাহ্লাদ।
নয়ন নিমিষহীন বিগত বিষাদ ॥

ত্রিগুণজননী তব নিরখিয়া পদ।
উথলে করুণাসিন্ধু অঙ্গ গদগদ॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই।

বিদ্যার পাত্রান্বেষণে মাধব ভাটের কাঞ্চিপুর গমন।

বীরসিংহ মহামতি হৃদয়ে চিন্তিত অতি
দুহিতার যোগ্য পতি কই।
রূপে গুণে কুলে শীলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এ সকলে
বিশেষত বিদ্যালাপে জই॥
সেজন তাহার প্রভু প্রতিজ্ঞালঙ্ঘন কভু
নহে কোথা-সুপাত্র এমন।
যত যত ভূপসুত, রূপেতে বটে অদ্ভুত
বিদ্যা নাই উপায় কেমন॥
নিকটে মাধব ভাট কত মত করে ঠাট
আমি মিলাইব যোগ্য পাত্র।
শুন শুন মহাশয় একথা অন্যথা নয়
কিন্তু কিছু কালগৌণ মাত্র॥
ভাটবাক্যে অট্টহাসে সুধাসিন্ধু মধ্যে ভাসে
শিরপা করিলা তাজি ঘোড়া।
ছিঁড়িয়া গলার হার নানা রত্ন দিলা আর
খাস পোষাকের খাসা যোড়া॥

বিদায় করিয়া ভাটে পুনরপি রাজপাটে
রাজকর্ম্মে মন দিলা ভূপ।
মিলিবে উত্তম বর সুপুরুষ গুণধর
মনে মনে জানিলা স্বরূপ॥
মাধব তুরঙ্গ চাপে গোঁফে পাক দিয়া দাপে
সেঁটে মারে পিছাড়ে চাবুক।
পবন গমনে যায় পাছু পানে নাহি চায়
প্রসাদেতে পরম কৌতুক॥
ভ্রমিল অনেক ঠাঁই উপযুক্ত মিলে নাই
শেষ কাঞ্চিদেশ উপনীত।
পাঠশালে পড়ুয়া সঙ্গে সুকবি সুন্দর রঙ্গে
রূপ দেখি ভট্ট হরষিত॥
কোন শাস্ত্রে নাহি ত্রুটি যে যে কহে দৃঢ় কোটি
ক্ষণ মাত্রে তাহার সিদ্ধান্ত।
মাধব জানিল দড় ভবানীর ভক্ত বড়
নিতান্ত বিদ্যার এই কান্ত॥
চিত্তে চমৎকার লাগে করযোড়ে খাড়া আগে
রায়বার পড়ি করে স্তব।
শিরে উঠাইয়া হাত কহিতেছে হিন্দি বাত
শুনি সুখী সুন্দর নীরব॥
বাবুজি কুর্নিস মেরা বর্দ্ধমান বিচডেরা
নাম তো হামারা মাধো ভাট।
আরজ করেঁ াগে পিছে ঘড়ী এক বৈঠে নীচে
আর তো লাগায় তোম হাট॥

আয়া হোঁ যো চড়ে ঘোড়ে তসদিয়া পায়া হোঁ বড়ে
ওঁ লেকেন ভুল গেয়া সব।
খেলাপ না কহো বাবু তোম্‌নে মুঝে কিয়া কাবু
মেই রোই তুঝে দেখা যব॥
চিন্ লিয়ে দেওকে এয়্‌সে আপ কে সুরত যেয়্‌সে
দুনিয়ামে পয়দা কিয়া সোহি।
দেখা হো মুলুক কেত্তা ছত্রিয়েমে রাজা যেত্তা
তেরা মোকাবিলা নাহি কোহি॥
বীরসিংহ নাম রাজা জাত্‌মে হ্যায়্ বড়া তাজা
শোন হোঁগে ওন্‌কা জেকের।
ওন্‌কা ঘর্‌মে লেড়্‌কি এক তারিফ করোঁমে কেত্তেক
রাত দেন সাদিকা ফেকের॥
কওল এত্না কি হেয়ও হজিমত্ হি দেগায়েও
শাস্ত্রমে ওহি ওস্‌কা নাথ।
তোমারা হোঁ এসা জান যো কহোঁ সো কহা মান
তোম সকোগে আও হামারে সাত॥
বিরলে ডাকিয়া নিয়া সুন্দর সুস্থির হৈয়া
শুনিলা বিশেষ আর কথা।
বিবাহ হইল বাই পক্ষী হৈয়া উড়ে যাই
নিবসি রমণিমণি যথা॥
পিয়া বিদ্যা নাম সুধা সুন্দরের গেল ক্ষুধা
রত্নাগারে করিলা শয়ন।
ঘোরতর নিশি শেষ ধরি কালী নিজ বেশ
সবিশেষ কহেন স্বপন॥

ভাব কেন ওরে ভক্ত আমি তব অনুরক্ত
সেও তো আমার দাসী বটে।
পরম রূপসী সেই একান্ত জানিবে এই
তরুণী তোমার তরে ঘটে॥
প্রথমেতে গুপ্ত কায় ব্যক্ত শেষে মহারাজ
কোটালে কহিবে কাটিবারে।
সে কিছু মানস নয় কেবল দর্শাবে ভয়
পরিচয় লইবার তরে॥
সন্ধান করিবে পুনঃ কারণ ইহার শুন
প্রাতে চল বীরসিংহ-দেশ।
একাকী যাইবা তুমি সঙ্গে সঙ্গে যাব আমি
কদাচ না ভাবিও রে ক্লেশ॥
দশম দিবস গৌণ এত বলি মাতা মৌন
স্বস্থানে প্রস্থান কৈলা শিবা।
শ্রীকবিরঞ্জনে কয় রজনী প্রভাতা হয়
নিদ্রাভঙ্গে দেখে ধীর দিবা॥

সুন্দরের বর্দ্ধমান যাত্রা।

স্বপ্নে শৈলসুতা আজ্ঞা সত্য মনে বাসি।
জায়া হেতু যোগে যাত্রা করে গুণরাশি॥
বিল্বপত্র আঘ্রাণ লইলা গুণধাম।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হেতু জপে দুর্গানাম॥
সেইক্ষণ মাহেন্দ্র কহিব বাড়া কিবা।
দক্ষিণে গো মৃগ দ্বিজ বামে শব শিবা॥

ধেনু বৎস প্রযুক্ত সম্মুখে বরাঙ্গনা।
পূর্ণকুম্ভ কক্ষে মত্তকুঞ্জরগমনা॥
বুঝিলা বিনোদবর বিদ্যাবতী লাভ।
প্রসন্না পর্ব্বতপুত্রী প্রকৃষ্ট প্রভাব॥
এড়াইলা স্বদেশ বিদেশ দিল দেখা।
মহারণ্যে মহাকবি প্রবেশিলা একা॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা নাহি চলে রাত্রদিবা।
কি ভয় সঙ্কটে সদা সঙ্গে সঙ্গে শিবা॥
পথশ্রমে যদ্যপি জন্মায় বড় ক্ষুধা।
শ্রুতিপথে পিয়ে বিদ্যানাম রসসুধা॥
বনে বনচর কত চরিয়া বেড়ায়।
তুষ্টতর তারা তারে ফিরে না তাকায়॥
ভক্তে ভয় দর্শাইতে দেবী ভগবতী।
মায়ায় সৃজিলা নদী বেগবতী অতি॥
ছিল না কাণ্ডারী তরী অত্যন্ত গভীর।
তালবৃক্ষ তুল্য ভাসে প্রলয় কুম্ভীর॥
সুতুঙ্গতরঙ্গরঙ্গ অঙ্গ কাঁপে ডরে।
ফাঁপর হইল ফিরে যেতে চাহে ঘরে॥
হেনকালে শুনহ অপূর্ব্ব এক কথা।
অকস্মাৎ মহাযোগী উপস্থিত তথা॥
বিভূতিভূষিত তনু কণ্ঠে অক্ষমাল।
তাম্রবর্ণ জটাভার দুই চক্ষু লাল॥
করোপরে ত্রিশূল শার্দ্দূলচর্ম্ম কক্ষে।
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষে॥

যোগী জেনে যতনে যুড়িয়া দুই পাণি ।
ধরা লোটাইয়া পড়ে চরণ দুখানি ॥
যোগী জিজ্ঞাসিলা কহ সত্য সমাচার ।
কি নাম কোথায় ধাম তনয় কাহার ॥
সুন্দর কহেন নিবেদন মহাশয় ।
কাঞ্চিদেশ ধাম গুণসিন্ধুর তনয় ॥
সুন্দর আমার নাম বিদ্যা-ব্যবসাই ।
বিদ্যা অন্বেষণে বীরসিংহদেশ যাই ॥
যোগী বলে একাকী বিষম ঘোর বনে ।
পথপ্রাজ্ঞ নহ তুমি যাইবা কেমনে ॥
পুনরপি কহে আমি পথপ্রাজ্ঞ নই ।
ভরসা কেবলমাত্র কালী কৃপাময়ই ॥
দনুজ-দলনী শ্যামা জননী যাহার ।
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ভয় কি তাহার ॥
আরবার যোগী বলে শুন হে বালক ।
শিবপদ ভজ তিনি জগতপালক ॥
আশুতোষ দেবদেব সুখমোক্ষদাতা ।
সঙ্কটে শঙ্কর বিনা কেবা ভয়ত্রাতা ॥
স্নান কর শুচি হও দণ্ড দুই রহ ।
কালীমন্ত্র পরিহর হরমন্ত্র লহ ॥
কোপে কাঁপে কলেবর কবি কহে কটু ।
বুঝিলাম আগমে নিগমে বড় পটু ॥
কেন নহিবেক চাহি এমনি যে ভক্তি ।
কোন্ গুরু কহেছেন শিব ছাড়া শক্তি ॥

শৈলপুত্রী মুক্তিকর্ত্রী জগদ্ধাত্রী কালী।
মূঢ়তা প্রকাশ কর একি ঠাকুরালী॥
তোমার বাতাসে সর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট হয়।
এত বলি অধোমুখে মৌনভাবে রয়॥
ক্ষণেক অন্তরে কবি ফিরে দেখে পাছে।
ঘুচিল মায়ার নদী যোগী নাহি কাছে॥
শুনিলা শ্রবণে কবি দৈববাণী এই।
মিথ্যা নহে স্বপ্নকথা সত্য সত্য সেই॥
ভয় নাই ভকত ভুবনে শীঘ্র যাবা।
গুণনিধে গুণবতী গত মাত্র পাবা॥
আনন্দসাগরে ভাসে কবি গুণধাম।
সেই নিশি সেইখানে করিলা বিশ্রাম॥
পোহাইল বিভাবরী উদয় তপন।
শ্রীদুর্গা স্মরণ করি করিলা গমন॥
কাঞ্চিপুর হইতে সহর বর্দ্ধমান।
ছয় মাসে আসে লোক কণ্ঠাগত প্রাণ॥
কেমন কালীর কৃপা কি কব বিশেষ।
দশম দিবসে কবি করিলা প্রবেশ॥
প্রসাদে প্রসন্ন হও কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

সুন্দরের বর্দ্ধমান প্রবেশ।

প্রভাতে উদয়াদিত্য   সুন্দর প্রফুল্লচিত্ত
প্রবেশিলা বীরসিংহদেশ।
স্বচ্ছন্দ সকল লোক   নাহি রোগ দুঃখ শোক
নাহি কোন অধর্ম্মের লেশ॥
দিব্য পরিচ্ছদ পরে   গান বাদ্য ঘরে ঘরে
তিলেক নাহিক তাল ভঙ্গ।
বালবৃদ্ধ যুবা কিবা   এই রসে রাত্রদিবা
রাগরঙ্গ উত্তম প্রসঙ্গ॥
পরস্পর সুকৌতুক   কাব্য ছাড়া একটুক
কদাচিত মুখে নাহি ভাষা।
গোধনরক্ষক যারা   সঙ্কীর্ত্তন ভাষে তারা
কে বুঝে পণ্ডিত কেবা চাসা॥
পরম পবিত্র রাজ্য   পরস্পর পূর্ণকার্য্য
সুরাচার্য্য সদৃশ অনেক।
কল্পতরু তুল্য ভূপ   আধিপত্য নানারূপ
দীন নাহি সে দেশে জনেক॥
চৌদিকে চৌপাড়িময়   পাঠ্ চায় পড়ুয়াচয়
দ্রাবিড়-উৎকল-কাশীবাসী।
কারো বা ত্রিহোত বাড়ী   বিদেশ স্বদেশ ছাড়ি
আগমন বিদ্যা অভিলাষী॥
দেবালয় ঠাঁই ঠাঁই   অতিথির সীমা নাই
ব্রহ্মচারী যতি বানপ্রস্থ।

আগমজ্ঞ ভূত-ভবিষ্যত-প্রাজ্ঞ
র্ম্মেতে নৈষ্ঠিক সমস্ত ॥
লক্ষ লক্ষ বাসনা সাযুজ্য-মোক্ষ
ণ কেবলমাত্র বায়ু।
তাপ-তর জ্যোতির্ম্ময় কলেবর
গবলে দীর্ঘ পরমায়ু ॥
াণ্ডিত বৈদ্য ঔষধ প্রয়োগে সদ্য
ধিমুক্ত কালেতে বিয়োগ।
ভূপাতর আস্থা আছে যাতায়াত নিত্য কাছে
চিরবৃত্তি সুখে করে ভোগ ॥
দেখিতে দেখিতে দূর দেখিলেন রাজপুর
অমরাবতীর প্রায় লাগে।
বাহিরে সহরখানা আগে নেওয়াতির থানা
ধমকে অমনি ভূতভাগে ॥
থামে বান্ধা কত বাজী ইরাণি তুরকি তাজি
মধ্যে গাজী বসেছে সবাই।
বুকেতে ঝাম্পান ঢাল যুগল লোচন লাল
গোরা গায় চিক্কণ কাবাই ॥
তার আগে দড় দড় পাঠানের চৌকী বড়
ফাটকে আটক আঁটাআঁটি।
বিদেশীর নয় ঝাড়া সেফাই আছয়ে খাড়া
হুজ্জতে ফেলায় মাথা কাটি ॥
আফিঙ্গে হামেশা মস্ত হুঁসিয়ার দরবস্ত
ঘুমে আঁখি কুমারের চাক।

ব্যাঘ্রতুল্য বসে আছে গোলাম দাঁড়ায়ে কাছে
গরবেতে গোঁপে দেয় পাক॥
কিবা কয়ে বিজিবিজি কুত বুঝি নাও বুঝি
বিষম মগজ সদা টেড়া।
ওরে বহিনা ভুরজারি এয়সারে শ্বশুরা গারি
বাঙ্গালিরে দেখে যেন ভেড়া॥
মগধী শোয়ার যারা বিষম কাটাও তারা
মহিমা অসীম পরাক্রম।
তাকাইতে একটুক ভয়ে প্রাণ ধুকধুক
কেবল সাক্ষাত তুল্য যম॥
তুরাণি মোগলঘটা চাপদাড়ী মেতীকটা
মাথার উপরে হেঁড়ে পাগ।
পারসি আরবি কয় কভু নাহি মৃত্যুভয়
সমরে প্রখর যেন বাঘ॥
মোল্লা মোকাদিমা কাজি আখিল এন্সাফ রাজি
ইয়ে হফীজকে কিয়ে আওয়াজ।
কোনরূপে নহে কাঁচা দিন এমানত সাঁচা
পাঁচ ওক্তে করয়ে নমাজ॥
কোহি দেলমে নাহি সুজে ক্যা হোগা আখের মুঝে
কিয়া হোঁ বহুত বুরা কাম।
সাহেব জি পানা দেও এল্লাই আরজ লেও
পড়াহোঁ নাচার বড়া হাম॥
তার আগে খোষখানা নানা রঙ্গে পক্ষী নানা
ময়না মদনা কাকাতুয়া।

টিয়া তোতা ফরিয়াদী কাজালা চন্দনা আদি
হিরামন লালমন শুয়া ॥
পাহাড়িয়া যত পাখী দেখিতে জুড়ায় আঁখি
ডাঁড়ের উপরে আছে ঝুলি।
শিবদুর্গা শিবরাম সদা রাধাকৃষ্ণ নাম
না পড়াতে পড়ে এই বুলি ॥
ফিলখানা তার আগে চিত্তে চমৎকার লাগে
নীলগিরি তুল্য করিবর।
হাজার হাজার আর ঠাঁই ঠাঁই কৃষ্ণসার
নীলগাও বাউট বিস্তর ॥
লোহার জিঞ্জির পায় চক্ষু পাকাইয়া চায়
পীঁজিরায় পোষা কত শের।
উল্লুক ভল্লুক মেড়া সেয়াগোস ভৈঁস গড়া
জোরায়রু জানোয়ার ঢের ॥
যাম্যে দামোদর নদ গড়ভুক্ত বাঁকা নদ
চৌদিকে বেষ্টিত বেঁড় বাঁশ।
বুরুজ বিষম উচ্চ পাহাড় তাহার তুচ্ছ
জলে চরে লক্ষ লক্ষ হাঁস ॥
তোপধ্বনি সীমা কিবা হুড় হুড় রাত্র দিবা
নিরন্তর ভূমিকম্প তথা।
নামজাদা মালগুলা গায় মাথা রাঙ্গা ধূলা
বিক্রমের কত কব কথা ॥
গাছে ডানা মারে আঁটী ধমকেতে মাটী ফাটী
গোড়াসুদ্ধ উপাড়ে অমনি।

পিছে হটে মারে তাল দেখিতে সাক্ষাত কাল
অকালেতে জলদের ধ্বনি ॥
বাহুযুদ্ধে বুঝে ভেলা ভূমে পড়ে করে খেলা
সন্ধান সভাই ভাল জানে।
পরস্পর ছিদ্র চায় যে যারে পালোটে পায়
হাঁ করিয়া একা চোট হানে ॥
কোটী কোটী তিরন্দাজ যে যা বিন্ধে একান্দাজ
রায়বাঁশে কেহ নহে টুটা।
বাঘে ও মহিষে লড়ে ধারা বয়্যা রক্ত পড়ে
কোমকে মান যুঝে জুটা ॥
সপ্ত গড় ক্রমে ক্রমে সুকবি সুন্দর ভ্রমে
কত ঠাঁই কত চমৎকার।
কালিকার পূর্ণ দৃষ্টি পুরী বিশ্বকর্ম্মাসৃষ্টি
সৃষ্টিতে তুলনা নাহি যার ॥
ধন্য ধন্য পুণ্য দেশ কি কহিব সবিশেষ
সাক্ষাতে শঙ্করী হেন বাসি।
কালী পাদপদ্ম-তলে শ্রীকবিরঞ্জন বলে
আনন্দিত কবি গুণরাশি ॥

বাজার বর্ণন।

তার আগে দেখে কবি রাজার বাজার।
বিদেশী বেপারি বৈসে হাজারে হাজার ॥
বণিজি দোকানি কত শত শত ঠাঁই।
মণি মুক্তা প্রবাল আদির সীমা নাই ॥

বনাত মখমল পটু ভূসনাই খাসা।
বুটাদার টাকাইয়া দেখিতে তামাসা॥
মালদই নলাটী চিকন সরবন্দ।
আর আর কত কব আমীর পছন্দ॥
বিলাতি বহুত চিজ বেস কিস্মতের।
খরিদার নাহি পড়ে পড়ে আছে ঢের॥
সুলভ সকল দ্রব্য যা চাই তা পাই।
বাজারে বেদাতি নাই রাজার দোহাই॥
হাতীর আমারি পিঠে বাঘাই কোটাল।
শমন সমান দর্প দুই চক্ষু লাল॥
চৌগোফা ব্রজাই দাড়ি খুলিয়াছে ভাল।
সফেদ পোসাক পরা কলেবর কাল॥
রক্তচন্দনের ফোঁটা বিরাজিত ভালে।
পূর্ব্বদিক প্রকাশ যেমত ঊষাকালে॥
ভবানীর বড় ভক্ত ভয় নাহি মাত্র।
যার পানে চায় তার কাঁপি উঠে গাত্র॥
দুই পাশে চৌরি ঝাড়ে হাবেশী গোলাম।
সরদার লোকে যত করিছে শেলাম॥
আগে ডঙ্কা সন্তার সন্তরি চন্দ্রবাণ।
বাজে দামা জগঝম্প ভেঁওরি বিশাণ॥
হাজার শোয়ার সঙ্গে পাঠান সকল।
ধমকে চমকে তনু ধরা যায় তল॥
নাকিব ফুকারে সদা হাজারির ভুর।
সহরে সোরত পড়ে যায় বাহাদুর॥

সুন্দর হাসেন মনে থাক দিনকত।
পাছে যাবে বুঝাপড়া বাহাদুরি যত॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালি কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

সরোবর বর্ণন।

তদন্তরে দেখে কবি দিব্য সরোবর।
স্ফটিকে নির্ম্মিত ঘাট পরম সুন্দর॥
তীরতরু সুবর্ণ নিবদ্ধ শাখামূল।
মঞ্জুল বৃঞ্জুলবনে মত্ত অলিকুল॥
নিরমল জল শতদল বিকসিত।
ঈষৎ পাণ্ডুর সিতাসিত রক্ত পীত॥
হংস হংসীসঙ্গে সঙ্গ রঙ্গরস ক্রীড়া।
বিয়োগীজনার চিত্তে জন্মে মহাপীড়া॥
শৈত্য ও সৌগন্ধ মান্দ্য ত্রিবিধ পবন।
তত্র মনোভব আবির্ভব অনুক্ষণ॥
ধন্য বস্তুস্থল সেই কি কহিব কথা।
এককালে মূর্ত্তিমন্ত ছয় ঋতু যথা॥
অতি চিত্র বিচিত্র শুনহ ক্রমে ক্রমে।
ক্ষণেক নলিনীশোভা হত হিমাগমে॥
ক্ষণে শীত বিপরীত কম্পমান তনু।
সুধাসম হিতকারী ভানু ও কৃশানু॥
বলবন্ত বসন্ত দুরন্ত অদভূত।
রতিপতি রথী রথ মলয়মরুত॥

এমত রহস্য কাম সে নিজে অনঙ্গ।
ধৃত পুষ্পধনু চারু গুণচয় ভৃঙ্গ॥
মহাপাত্র সুপাত্র স্বকীয়গণ ওই।
তথাপিও মনোরথ ত্রিজগত-জই॥
অলিকুল বিকল বকুলে পিয়ে মধু।
গুঞ্জরে মঞ্জিম রব পরভৃতবধূ॥
পুষ্করাগ্রে পুষ্কর করিতে লয় তুলি।
নিকটে করিণীমুখে যাচে কুতূহলি॥
চক্রবাক চক্রবাকী খেলে চঞ্চুপুটে।
খঞ্জন-খঞ্জনী প্রেম তিলেক না টুটে॥
ক্ষণে বিষতুল্য কর সুপাতিত মহী।
সুপ্ত শিখী তদঙ্কে নিঃশঙ্কে রহে অহি॥
মৃগেন্দ্রে গজেন্দ্রে নিবসতি এক ঠাঁই।
এমন জাতির ধর্ম্ম শাস্ত্রমধ্যে নাই॥
কষ্টতাপে চাতকচাতকী ঊর্দ্ধে তাকে।
বুঝা যায় সটীক ফটিকজল ডাকে॥
ক্ষণেক গগনে ঘন ঘোরতর রব।
সখি দেখি শিখী শিখি সঘনে তাণ্ডব॥
ডাহুকাডাহুকী ডাকে ভেকের কৌতুক।
প্রমদা প্রমদে নাহি ত্যজে একটুক॥
সারসসারসী নাচে দোঁহে মত্তজ্ঞান।
বিষম মকরকেতু তাহে বলবান॥
উচ্চতরু বিকসিত কদম্ব মঞ্জুল।
বিরহিণী কামিনীজনার নেত্রশূল॥

ক্ষণে ক্ষণে গুরুতর গরজে জলদ।
বিন্দুপাত নাহিমাত্র কেবল শবদ॥
প্রসাদ কহিছে কালী চরণকমলে।
বসিল বিনোদবর বকুলের তলে॥

সুন্দরদর্শনে নাগরীদিগের উক্তি।

কি মনোহর রূপপুঞ্জ সখি ঐ,
তুলনা কব কি বলনা সই।
নিকটে ব

কি মেরু
বিবেচনা
শিখরী অ
সপঙ্ক সম
কেহ কে
সৌদামি
আর জন
সৌদামি
কি রূপ-
বিধি কার জন্য গঠিল বটে।
কহে এক সতী সেই ভাগ্যবতী
সুন্দর এ পতি যারে লো ঘটে॥

হৃদয়মাঝারে রাখিয়ে ইহারে
নয়নদুয়ারে কুলুপ দিয়া।
রূপ নহে কালো নিরখিতে আলো
দেখ সখি আলো আঁখি মুদিয়া॥
কহে রামা আর গলে পরি হার
এ হার কি ছার ফেলি গো টেনে।
আশা পূরে তবে হেন দিন হবে
কোনজন কবে ঘটাবে এনে॥
কহে কোন আই আমি যদি পাই
পলাইয়া যাই এদেশে থেকে।
নারীকলা ফান্দে বান্ধি নানা ছান্দে
প্রাণ বড় কান্দে দেনা লো ডেকে॥
কেহ কেহ আজি ওকে করে্য রাজি
শেষে দিয়া বাজী না দিব ছেড়ে।
শাশুড়ি-শ্বশুর নাহি পতি দূর
শূন্য মোর পূর কে দিবে তেড়ে॥
কহে কোন নারী হয় আজ্ঞাকারী
ভুলাইতে পারি এ গুণ আছে।
বিধবা যেগুলা বিষম ব্যাকুলা
চক্ষে দিয়া ধূলা লবে গো পাছে॥
কেহ বলে চল দাঁড়ায়্যে কি ফল
হৃদয়ে বিকল হৈয়াছি মোরা।
কামানল চয় করিছে সঞ্চয়
তনু অপচয় হবে গো ত্বরা॥

তুমি মনোরথ বুঝেসুঝে ব্রত
আগুলিলা পথ না পারি যেতে।
পরস্পর বলে চরণ না চলে
আইলাম জলে আপনা খেতে॥
কত কুলদারা চকোরীর পারা
নিরখিছে তারা সে মুখশশী।
কে ভরে জলসে ভাসায়্যা কলসে
অতনু অলসে রহিল বসি॥
শ্রীপ্রসাদে ভণে পীড়া দিয়া মনে
নিজ নিকেতনে সকলে চলো।
শুন সার কই এ কবি বিজই
বিদ্যাহেতু ওই এসেছে ওলো॥
কুলের কামিনী কুঞ্জরগামিনী
কি অপরূপ রূপসী।
নাভি সরোবর পীন পয়োধর
বদন বিমল শশী॥
দশন মুকুতা মৃদুহাস্যযুতা
অমিয়া জড়িত ভাষা।
সুনীল উৎপল লোচন চঞ্চল
বেসোরে ভূষিত নাসা॥
কি ভুরুভঙ্গিমা দিঠী সুরঙ্গিমা
যোগীজন-মন হরে।
নিন্দিতপনীয় কান্তি কমনীয়
চপলা চমকে ডরে॥

চারু কৃশোদরী গর্ব্ব পরিহরি
হরি বনবাসী ওই।
রম্ভাতরু উরু অতিশয় গুরু
নিতম্ব তুলনা কই॥
যুবতী নবোঢ়া কত বেনে প্রৌঢ়া
স্নান হেতু চলে জলে।
যুবক সুন্দর রূপ মনোহর
বিশ্রাম বকুল তলে॥
জাগত অনঙ্গ ঘন কাঁপে অঙ্গ
কক্ষচ্যুত হেমঘট।
রূপ পানে চেয়ে ধৈর্য্যমাথা খেয়ে
হিয়ে করে ছটফট॥
কেহ কহে রাম কেহ কহে কাম
কহে অপর এক সতী।
রাম কাম নয় এই মহাশয়
অমরাবতীর পতি॥
কেহ কহে সই নাগো আমি কই
পুরুষের কালা কানু।
ইথে নাহি বাধা বিদ্যাবতী রাধা।
এবে দোঁহে গোরা তনু॥

মালিনীর সহ সুন্দরের পরিচয়।

মালাকারদারা হীরা পুষ্প দিয়া ঘরে ফিরা
যেতে পথে শুনে লোকমুখে।

তরুতলে রূপরাশি নিরখে নিকটে আসি
আপনা পাসরে রামা সুখে ॥
জিজ্ঞাসে জুড়িয়া কর হেদে হে পুরুষবর
কোথা ঘর কাহার নন্দন।
মনুষ্য শরীরছলে সহস্রাক্ষ ক্ষিতিতলে
কিবা হবে রোহিণী-রমণ ॥
অথবা মকরকেতু বিদ্যাবতী লাভ হেতু
আগমন কারণ বিশেষ।
পূর্ব্বে পোড়াইল হর হারাইলা পঞ্চশর
তথাপিও জয়ী সর্ব্বদেশ ॥
কিবা রূপ কি লাবণ্য জনক তোমার ধন্য
কত পুণ্যে জন্মে হেন পুত্র।
যে তব প্রসবস্থলী ভাগ্যবতী তারে বলি
সে ধনী সমান নাহি কুত্র ॥
হাসি কহে গুণধাম সুন্দর আমার নাম
গুণসিন্ধু রাজার নন্দন।
কিন্তু বিদ্যাব্যবসাই বিদ্যা অন্বেষণে যাই
বিদ্যা হেতু বিদেশে গমন ॥
অধিক কহিব কিবা বিদ্যা বিদ্যা রাত্রিদিবা
মনে মনে একান্ত ভাবনা।
সেবি বিদ্যা বিদ্যা লাগি হইয়াছি দেশত্যাগী
যদি বিদ্যা পূরাণ কামনা ॥
বুঝিয়া বাক্যের ছল হীরাবতী খল খল
হাসে ভাষে বটে হে বুঝেছি।

বিদ্যায় ভকতি আছে   বিদ্যালাভ হবে পাছে
আমি পরিচয় যে দিতেছি॥
হীরাবতী নাম ধরি   বাসে বঞ্চি একেশ্বরী
পতি পুত্র কন্যা কেহ নাই।
উদর উপায় মূল   রাজকন্যা লয় ফুল
যাতায়াত নিত্য সেই ঠাঁই॥
পরম রূপসী রামা   তুষ্টা শ্যামা গুণধামা
বিচারে জিনিবে যেই জন।
সেই তার হৃদয়েশ   খ্যাত ইহা সর্ব্বদেশ
বিষম ধনুকভাঙ্গা পণ॥
বাকি কোথা আছে কেটা   যতেক রাজার বেটা
এসে হাসাইয়া গেল মুখ।
আগে শুনি বড় ভূর   শেষে হয় দর্প চুর
কিন্তু নৃপতির নাহি সুখ॥
সে ধনী পাইবে যেই   বড় ভাগ্যবন্ত সেই
তুলনা তাহার কার সঙ্গে।
সমুদ্রমন্থনে নিধি   উপজিল যতবিধি
নিরমিল প্রতি অঙ্গে অঙ্গে॥
আর শুন গুণযুত   তব নামে ভগ্নীসুত
কহিতে বড়ই ভয়বাসি।
যদ্যপি না ঘৃণা কর   থাকহ আমার ঘর
ধর্ম্মত তোমার আমি মাসী॥
গুণরাশি কহে হাসি   ভাল গো ভাল গো মাসি
বল মাসি বাড়ী কতদূর।

মালিনী কহিছে দূর নহে বাপু ওই পুর
এসো মোর বাপের ঠাকুর ॥
মালি-মহিলার সঙ্গে চলিল পরম রঙ্গে
সেনারূপে পথ করে আলা।
কালীপাদপদ্ম তলে শ্রীকবিরঞ্জনে বলে
বাসা তো মিলিয়া গেল ভাল ॥

বিদ্যার রূপ বর্ণন।

সুন্দর কহেন মাসি মোর দিব্য লাগে।
বিদ্যার রূপের কথা কহ শুনি আগে ॥
আগো মেনে একি ঠাট ঠাটে কহে হীরা।
বালাই সেটের বাছা কেনো দেও কিরা ॥
সে রূপের সীমা কবে এত শক্তি কার।
সে পারে কহিতে কিছু শতমুখ যার ॥
পৃথিবীতে বড় আর কেবা তোমা বই।
না কহিলে নয় তাই যা জানি তা কই ॥
চাঁচর চিকুর জাল জলধর জিনি।
শ্রুতিযুগে পরাভব পাইল গিধিনি ॥
ডুবিল কুরঙ্গ শিশু মুখেন্দুসুধায়।
লুপ্ত গাত্র তত্র মাত্র নেত্র দেখা যায় ॥
নয়নের চঞ্চলতা শিখিবার তরে।
অদ্যাপি খঞ্জন নিত্য কর্ম্মভোগ করে ॥
অমিয়া জড়িত ভাষা নাসা তিলফুল ॥
বিম্বাধর দশনে মুকুতা নহে তুল ॥

পুষ্পধনু-ধনু অণু কি ভুরুভঙ্গিমা।
বাহুতুল নহে বিসে কিসের গরিমা॥
যৌবনজলধি মধ্যে মগ্ন মত্ত গজ।
উরে দৃষ্ট কুম্ভস্থল সে নহে উরজ॥
নাভিপদ্ম পরিহরি মত্ত মধু পান।
ক্রমে ক্রমে বাড়িল বারণকুম্ভস্থান॥
কিম্বা লোমরাজিছলে বিধি বিচক্ষণ।
যৌবন কৈশোরে দ্বন্দ্ব করিল ভঞ্জন॥
কেহ বলে মধ্যস্থল নাহি কি রহস্য।
কেহ বলে দেবসৃষ্টি থাকিবে অবশ্য॥
সূক্ষ্ম বিবেচনা তাহে বুঝিবে প্রবীণ।
বিজ্ঞ বট ভাব দেখি কি প্রকার ক্ষীণ॥
নিবিড় বিপুল চারু যুগল নিতম্ব।
কাম-পারাবার-পার-সার অবলম্ব॥
যদ্যপি অচিরপ্রভা চির স্থির হয়।
তবে বুঝি তনুশোভা হয় কিবা নয়॥
মন্দ মন্দ গমনে যদ্যপি বাঁকা চায়।
মনোভব পরাভব লইয়া পলায়॥
কোন্ বা বড়াই তার পঞ্চশর তূণে।
কতকোটি খরশর সে নয়নকোণে॥
পোড়াইয়া কাম নাম বটে স্মরহর।
তাঁহার অসহ্য বালা হানে দৃষ্টিশর॥
রূপবান্ বট বাপু গুণ কত ঘটে।
বিচারে জিনিতে পার তবে জানি বটে॥

হৃদয়ে সন্তোষ গুণরাশি কহে হাসি।
গুণ না থাকিলে মাসি এতদূরে আসি॥
কালী পাদপদ্মেতে যদ্যপি মন রহে।
অবলা বিচারে জিনা বড় কর্ম্ম নহে॥
ফিরে বলে হীরে শুন পুরুষরতন।
তরুণী তোমার তরে বুঝিলাম মন॥
ক্ষণেমাত্র উপনীত মালিনীনিলয়।
রন্ধন ভোজন করে কবিমহাশয়॥
বিনোদশয্যায় সুখে করিল শয়ন।
পোহাইল বিভাবরী উদয় তপন॥
শ্রীরামপ্রসাদ কহে কালীপদ তলে।
নিদ্রা ত্যজি সুন্দর উঠিলা কুতূহলে॥

মালঞ্চ বৃত্তান্ত।

অদূরে উদয় রবি নিদ্রা ত্যজি উঠে কবি।
শিরসি-কমলে দশ-শতদলে
চিন্তয়ে শ্রীনাথচ্ছবি॥
জপয়ে শ্রীদুর্গানাম পূর্ণ হেতু মনস্কাম।
প্রাতঃস্নান করি ধৌত ধূতি পরি
সসঙ্কল্প গুণধাম।
নিকটে মালঞ্চ শুষ্ক দেখি মনে বড় দুঃখ।
সেজন গমনে কুসুম-কাননে
বিকসিত হয় পুষ্প॥

কাঞ্চন কস্তুরী বক　অপরাজিতা চম্পক।
মালতী মল্লিকা　কুন্দ সেফালিকা
কেতকী বর্ণে কনক॥
জুতি গন্ধরাজ ফুল　নাগকেশর বকুল।
কিংশুক রঞ্জন　কদম্ব মঞ্জন
কামিনীনয়নশূল॥
সুন্দর সৌরভ ছুটে　মন্দ মন্দ বায়ু ঘটে।
নাসারন্ধ্রে, ঘ্রাণ　স্মরে দহে প্রাণ
চমকিয়া হীরা উঠে॥
গতি গজ জিনি মন্দ　হৃদয় পরমানন্দ।
কোকিল কূজিত　ভ্রমর গুঞ্জিত
ফুলে পিয়ে মকরন্দ॥
ভ্রমিতে কাননমাঝ　সম্মুখে যুবকরাজ।
পুটাঞ্জলি পাণি　মুখে মৃদু বাণী
কহে তব এই কায॥
সামান্য পুরুষ নহ　স্বরূপে আমাকে কহ।
পূর্ণ ব্রহ্ম হরি　নররূপ ধরি
কি হেতু তুমি ভ্রমহ॥
কত পুণ্যপুঞ্জ মম　ধন্য কেবা মম সম।
শুন মহাশয়　ধন্য মমালয়
অতিথি শ্রীনরোত্তম॥
গুণরাশি কহে হাসি　এ কথা না ভালবাসি।
হেদে শুন কই　সাপরাধি হই
তুমি গো ধর্ম্মত মাসী॥

হীরাবতী মনে হাসে সুধার সাগরে ভাসে।
শ্রীপ্রসাদ বলে কবি কুতূহলে
চলিল মালিনীবাসে॥

মালিনীর পুষ্পচয়ন ও হাটে গমন।

সুন্দর চলিয়া গেলা মালিনীনিলয়।
পরম কৌতুকে রামা তোলে পুষ্পচয়॥
তোলে বক চম্পক কস্তূরী সেফালিকা।
জাতি জুতি গন্ধরাজ মালতী মল্লিকা॥
শতদল স্থলপদ্ম সূর্য্যমণি ফুল।
কুন্দ জবা কৃষ্ণকেলি টগর বকুল॥
কাঞ্চন মাধবীলতা শোণ সর্ব্বজয়া।
অশোক অপরাজিতা নিশিগন্ধা কেয়া॥
সেঁউতি গোলাব নাগকেশর সুগন্ধ।
কিংশুক ধাতকি ঝিণ্টি তোলে মুচকন্দ॥
তুলিল কুসুম যত কত কব নাম।
পাঁচ সাত সাজি পূরি চলে নিজ ধাম॥
বার দিয়া বসিল বিনোদবর পাশে।
বাসনা বলিতে 'নারে ফিক্ ফিক্ হাসে॥
ভাবে কবি এ মাগী বয়সে দেখি পোড়া।
ভাবে দেখি এ প্রকার হয় নাই বুড়া॥
কটির কাপড় গাণ্টি কতবার খোলে।
ভুজপাশ উদাস গা ভাঙ্গে হাই তোলে॥

হেসে হেসে আরো এসে ঘনায় নিকটে।
কি জানি কপালে মোর কোন্‌খান ঘটে॥
কামাতুরা হইলে চৈতন্য থাকে কার।
বিশেষত নীচজানি নীচ ব্যবহার॥
ভয়ে অতি হীরাবতী প্রতি কহে হাসি।
গোটাকত টাকা নিয়া হাটে যাও মাসী॥
প্রমথপতির প্রিয়া পূজা ইচ্ছা আছে।
এত বলি বারো টাকা ফেলে দিল কাছে॥
আমি আজি গাঁথি মালা তোমার বদলে।
দেখদেখি নৃপতি-নন্দিনী কিবা বলে॥
ভাল বাপু বলিয়া আঁচলে বান্ধে তঙ্কা।
হাটে যায় মালিনী সংপ্রতি ঘুচে শঙ্কা
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালীপদ সার।
বিরলে বিনোদবর গাঁথে পুষ্পহার॥

সুন্দরের মাল্য গ্রন্থন।

বিনা সুত কি অদ্ভুত গাঁথে পুষ্পহার।
কিবা শোভা মনোলোভা অতি চমৎকার॥
জবা বক সুচম্পক কুন্দ সেফালিকা।
জাতিফুল ও বকুল মালতী মল্লিকা॥
গাঁথে বীর করবীর অশোক কিংশুক।
বাছি লয় পুষ্পচয় পরম কৌতুক॥
পদ্ম সঙ্গে গাঁথে রঙ্গে স্থলপদ্ম ভালো।
মাঝেমাঝে গন্ধরাজে আরো করে আলো॥

সমভাগ গাঁথে নাগ কেশর ধাতকী।
সর্ব্বশেষ গাঁথে বেশ কুসুম কেতকী॥
তুলা নাই কোন ঠাঁই একি অসম্ভব।
দৃষ্টিমাত্র কাঁপে গাত্র জন্মে মনোভব॥
কহে রাম মনস্কাম পূর্ণ কর কালী।
নৃপবালা পাবে জ্বালা এ গাঁথনী ভালী॥

কবির মাল্যসংক্রান্ত পরিচয় লিখন।

যতনে লইয়া কবি ফুল্ল সরসিজ।
প্রতি দলে দলে লিখে সবিশেষ নিজ॥
গুণসিন্ধু মহারাজা গুণের গরিমা।
প্রবলপ্রতাপ ধীর কি কব মহিমা॥
নির্ম্মল সুযশ দশদিগ করে আলো।
সেই অভিমানে চন্দ্র অন্তরেতে কালো॥
সে তেজ তুলনা হেতু ক্রোধযুক্ত রবি।
উদয়কালীন নিজ রক্তবর্ণ ছবি॥
ক্রমে সব তেজ প্রকাশিল নানারূপে।
তথাপিও কদাচ সমতা নহে ভূপে॥
হ্রী পাইয়া হ্রাস পুনঃ হৃদে জন্মে ভয়।
ভাস্কর ভাস্কর করে প্রদোষ সময়॥
রত্নাকর নাম বটে ধরয়ে সমুদ্র।
নৃপ-রত্নাকর কাছে সে সমুদ্র ক্ষুদ্র॥
অধিকন্তু দোষ তাহে অপেয় সে নীর।
ক্ষণজন্মা ক্ষিতিপতি নির্দ্দোষ শরীর॥

কর্ণে শুনি কর্ণ মহাদাতা লোকে কহে।
চক্ষে দেখি বুঝিলাম নৃপযোগ্য নহে॥
বিস্তারিত বার্ত্তা কি বদনে যায় কহা।
ক্ষমাগুণে সমা নন যিনি সর্ব্বসহা॥
সেই মহাশয় পিতা কাঞ্চীপুরধাম॥
শঙ্করীর কিঙ্কর সুন্দর কবি নাম॥
শ্রুতমাত্র পণপ্রাণ হেতু সে তোমার।
প্রমত্ত ইন্দ্রিয়গণ সকল আমার॥
কর্ণ কহে প্রথমে জন্মিল মম সুখ।
চক্ষু কহে দর্শন কর্ত্তব্য বিধুমুখ॥
কাতর রসনা কহে চিরদিন ক্ষুধা।
বাসনা বড়ই বিধু-বদনের সুধা॥
নাসা কহে পদ্মিনী সে তদঙ্গসুঘ্রাণ।
প্রাপ্তমাত্র যাবদীয় দুঃখপরিত্রাণ॥
বিকলে সকলে সাক্ষী করে কহে বাহু।
তনু হেম তব আলিঙ্গনে ইচ্ছা বহু॥
মন কহে মিথ্যা নহে সত্য কহি আমি।
তোমরা পশ্চাতে রহ হই অগ্রগামী॥
দেহরাজ্যে রাজা সেই কমলিনী শুন।
রহিল নিকটে তব না বাহুড়ে পুন॥
নপুংসক মন তবু সুখে করে ক্রীড়া।
পাণিনী ব্যবসা যার তার চিত্তে ব্রীড়া॥
কি গুণে বন্দিলা তারে চঞ্চলাক্ষী ধন্যা।
আ [illegible] কর কেন তুমি রাজকন্যা॥

সাঝির ভিতরে রাখে সাজাইয়া হার।
প্রসাদ কহিছে বালা যায় কোথা আর॥

মালিনীর হাট পরিচয়।

হাট করি হীরাবতী ফিরে এলো ঘরে।
কোঁথাইয়া বসিল কবির বরাবরে॥
হারামের হাড় মাগী কথা কহে ঠাটে।
মাটি খেয়ে বাপু আজি গিয়াছিনু হাটে॥
প্রথমেতে বণিকের হাতে দিতে টাকা।
টঙ্কারিয়া হাতে নিতে মুখ করে বাঁকা।
ছটা ছিল গরশাল ছটা ছিল মেকী।
হরেদরে বুঝিতে টাকার নাই সিকী॥
বাটাবাদে পাইলাম আড়কাট নয়।
কিনিতে বণিকদ্রব্য খোকে গেল ছয়॥
তবে বটে বাপু বাকি তিন টাকা থাকে।
মুখে মুখে লও লেখা দিতেছি তোমাকে॥
অগ্নিতুল্য দ্রব্য যত কব আর কি।
দু টাকায় লইলাম দুই সের ঘি॥
এক টাকা সবেমাত্র রহে অবশেষ।
কিনিলাম তাহে বলি উপযুক্ত মেষ॥
উপহারদ্রব্য কিছু কিনা যায় নাই।
হাতকর্জা লইলাম তেলিনীর ঠাঁই॥
তাও বুঝি হতে পারে সিকা ছয় সাত।
খুজরার লেখাজোখা বড়ই উৎপাত॥

স্নান করি খাইদাই লেখা দিব শেষে।
উচক্ক সময় এত মনে নাহি এসে ॥
পাঁচকড়া কড়ি বাপু খাই নাই মুই।
প্রত্যয় না কর বল গঙ্গাজল ছুঁই ॥
টাকাসিকা কোন্ বস্তু কতকাল খাব।
বিশ্বাসঘাতকী করে নরকেতে যাব ॥
পূর্ব্বজন্মপাপে এত পরিতাপ পাই।
দুকুলে এমন নাহি তার মুখ চাই ॥
বিধি গুণনিধি মিলাইল তোমা হেন।
চোরবাদ হবে মোর না মরিনু কেন ॥
এই যে তোমার মাসী বোধে নহে টুটা।
কে পারে ভুলাতে কার ঘাড়ে মাথা দুটা ॥
পুরুষের কান কাটে ধরে শক্তি হীরা।
ফাঁকী দিয়া চাল্কি ভুক্তে গায় করে ফিরা ॥
সুন্দর হাসেন মনে আমি এক চোর।
চাতুরী করিয়া মাগী কড়ি খায় মোর ॥
কবি বলে মরি পাইয়াছ বড় দুখ।
স্নানে যাও মাথা খাও শুকায়েছে মুখ ॥
হীরা বলে আরে বাছা স্নানে যাব কি।
না জানি কি করে মোরে নৃপতির ঝি ॥
বিবাদ ভাবিয়া হীরা করে লয় সাঝি।
প্রসাদ কহিছে কালী রক্ষা কর আজি ॥

পুষ্প লইয়া মালিনীর বিদ্যার নিকট গমন।

মনে বড় ভয় না জানি কি হয়
গগনে উঠেছে বেলা।
বীরসিংহ-সুতা আছে কোপযুতা
কহিবে করিল হেলা॥
যা করেন শিবা আর চারা কিবা
না গেলে এড়ান নাই।
দাঁড়াইল এই ত্বরা করি সেই
চলিল বিদ্যার ঠাঁই॥
দাঁড়াইল আগে সতী কহে রাগে
হেদে বা কোথায় ছিলা।
সকল যোগান করি সমাধান
কি ভাগ্য যে দেখা দিলা॥
ভুলিলা সে কাল একে ঠাকুরাল
গরবে উলসে গা।
কানে দোলে গেঁটে পথে যাও হেঁটে
ঠাহরে না পড়ে পা॥
তোরে বৃথা কই নিজে ভাল নই
এ পাপ চক্ষের লাজ।
নতুবা ইহার জানি প্রতিকার
যেমন তোমার কায॥
ভুমে সাজি রাখি ছলছল আঁখি
কৃতাঞ্জলি হীরা কহে।

কৃষ্ট নবগ্রহ বচননিগ্রহ
বিগ্রহ আমার দহে॥
ছিল উপরোধ ক্ষুদ্র দোষে ক্রোধ
এত কি উচিত তব।
বটি নিজ দাসী চিত্তে এই বাসি
ক্ষমহ বাড়া কি কব॥
এতেক বলিয়া চলিল কান্দিয়া
হীরা ফিরে যায় ঘরে।
কালীপদতলে শ্রীপ্রসাদ বলে
ত্রাহি মা নিজ কিঙ্করে॥

মালা দৃষ্টে বিদ্যার উৎকণ্ঠাবস্থা।

স্নান করি বিধুমুখী হৃদয়ে পরম সুখী
পূজে ইষ্টদেবতা শারদা।
চিকণ গাঁথনি ফুল অতিশয় চিন্তাকুল
অনিমিখে নিরখে প্রমদা॥
দেখিয়া পুষ্পের হার পূজা করে কেবা কার
ধ্যানজ্ঞান দুই গেল দূরে।
কাছে ডাকি সুলোচনা পাতি পড়ে বিচক্ষণা
অব্যাজে যুগল আঁখি ঝুরে॥
মনেতে জানিল এই পুরুষরতন সেই
দরশন পাইব কিরূপে।
তিলেক বৎসর প্রায় বুক ফেটে জিউ যায়
সখী প্রতি কহে চুপেচুপে॥

দেহে কি হইল সই দেখদেখি হীরা কই
ফিরা আমি পায় ধরি তার।
যদি ক্ষমা করে রোষ এতে কিছু নাহি দোষ
শুনি গো সকল সমাচার॥
কারে ঘরে দিলা ঠাঁই বুঝি বা তেমন নাই
বিদ্যাধর ধরণীমণ্ডলে।
বিরহিণী দেখি আমা প্রসন্না হইলা শ্যামা
বিধু মিলাইলা করতলে॥
সখী কয় ধৈর্য্য হও আজিকার দিন রও
প্রভাতে পাইবা দেখা হীরা।
এতই কেন উন্মত্ত মিলিবে সকল তত্ত্ব
জিজ্ঞাসা করিও দিয়া কিরা॥
বিদ্যাবলে বল বটে এখনি প্রমাদ ঘটে
আজি সে বাঁচিলে হৈবে কালি।
হের কণ্ঠাগত প্রাণ ঝাঁট কর পরিত্রাণ
সব শেষে যত দাও গালি॥
বুঝি হারা পুন তারা কহে সারা হও পারা
বাধ্য নহ সাধ্য কিবা আছে।
রাণীঠাকুরাণী যথা যাই তথা সব কথা
নিবেদন করি তাঁর কাছে॥
ভয় দর্শাইয়া নানা জনেজনে করে মানা
কষ্টেশ্রেষ্টে শান্তাইয়া রাখে।
শ্রীকবিরঞ্জন বলে জলনিধি উথলিলে
বালির বন্ধন কোথা থাকে॥

মালিনীর প্রতি বিদ্যার অনুনয়।

যথোচিত মনোভঙ্গ   দুঃখানলে দহে অঙ্গ
    হীরাবতী ভবনে চলিল।
সুকবি সুন্দরবরে   পাছু দিয়া ঢোকে ঘরে
    অনশনে রজনী বঞ্চিল ॥
কুহরে কোকিলকুল   ফুটে বনে নানা ফুল
    তুলি গাঁথে মনোহর মালা।
নৃপতি-নন্দিনী যথা   লঘুগতি চলে তথা
    বলে লও নৃপতির বালা ॥
রাখি হার পরিহার   করে করে ধরি তার
    বলে বিদ্যা বচন মধুর।
কন্যা প্রতি কর কোপ   বুড়ী নও বুদ্ধিলোপ
    মমতা সকল গেল দূর ॥
আদ্যোপান্ত এই ধারা   ক্রোধে হই জ্ঞানহারা
    ক্ষণেক সে ভাব নাহি থাকে।
অন্যকে ডরান পিতা   ততোধিক মাতা ভীতা
    জাননা গো তুমি কি আমাকে ॥
সহস্র মাথার কিরা   ওগো হীরা চাও ফিরা
    বুক চিরা হৃদে থুই তোরে।
যে কহি সে কথা মান   পুরুষরতন আন
    দুঃখে পরিত্রাণ কর মোরে ॥
হীরা কহে করি ছল,   ভাল পাইলাম ফল
    বাকি বল আর কিবা আছে।

মরি শোকে নিত্য মোকে হাসে লোকে কহে তোকে
বিদ্যা বিনোদিনী ডাকে কাছে ॥
তুমি মান্যা রাজকন্যা বট ধন্যা এত অন্যা-
সনে করিয়াছ কিবা কায।
রসময়ই শুন কই যুবা নই বৃদ্ধা হই
একা রই আই মা কি লাজ ॥
এতোকাল আছি নিষ্ঠা দেখ মিথ্যা অপ্রতিষ্ঠা
কহ কি শুনিলা কার ঠাঁই।
ক্ষমা কর ঠাকুরাণী ভব্যতা তোমার জানি
নির্লজ্জ আমার পর নাই ॥
পুনঃ রামা কহে ভাষ ছাড় হীরা পরিহাস
তোমার চিহ্নিত আমি বটি।
শ্রীকবিরঞ্জন কহে মিথ্যা নহে দেহ দহে
বিদ্যার ধরেছে ছটফটি ॥

মালিনী ও বিদ্যার কথোপকথন।

একান্ত কাতরা বুঝি বিদ্যা বিনোদিনী।
কহে হীরাবতী হাসি শুন কমলিনী ॥
জন্মেজন্মে নানা পুণ্যপুঞ্জ তব ছিল।
সেই ফল হেতু বর এমনি মিলিল ॥
দৃষ্ট নহে শ্রুত নহে রূপ হেনরূপ।
গুণসিন্ধু-সুত গুণসিন্ধুর স্বরূপ ॥
কাঞ্চীনামে দেশ ধাম সুধাময় হাস্য।
সুন্দর সুন্দর নাম পদ্মসুন্দরাস্য ॥

বদনে বিরাজে বাণী বিদ্বান্ বিপুল॥
পঞ্চবক্ত্রে পদ্মযোনি প্রায় সমতুল॥
দৃষ্টিমাত্র মম দেহ দহে দিবানিশি।
বৃদ্ধার বাসনা হয় বাঁচে কি রূপসী॥
অপরূপ কথা এই কে শুনেছে কবে।
কুটিল মালঞ্চ শুষ্ক যার অনুভবে॥
বিদ্যা বলে বাড়াবাড়ি কথায় কি কায।
স্নানছলে আমাকে দেখাও যুবরাজ॥
এ দুঃখসাগরে হীরা তুমি এক তরী।
হের দাঁতে করি কুটা ছুটা পায়ে ধরি॥
ইহা বলি ছিঁড়িয়া দিলেন গলহার।
হীরা কহে ঘটকের পাছে পুরস্কার॥
ধন্যা দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে।
আমি কি অধম এত বৈমুখ আমারে॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব।
কহিবার কথা নহে বিশেষ কি কব॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

সুন্দর নিকটে বিদ্যার বার্ত্তা কথন।

হার দিলা নৃপসুতা, হীরাবতী হাস্যযুতা
হৃষ্টমতি শীঘ্রগতি চলে।
যথা কবি গুণরাশি আসি হাসি কহে বসি
তব জন্ম ধন্য ধরাতলে॥

হীরা কহে শুন শুন যে করেছি নিবেদন
তার সাক্ষী হাতে হাতে এই।
জনে করে বহু যত্ন কোনরূপে মিলে রত্ন
রত্নজনে যত্ন করে সেই॥
সে ধনী রতন বটে, যতনে পুরুষ ঘটে
তার ইচ্ছা তুমি হও কান্ত।
চিত্তে বিবেচনা কর ভাগ্য কি ইহার পর
শিব-শিবা সদয় নিতান্ত॥
তব পত্র পাবামাত্র সিহরিল সর্ব্বগাত্র
চেতনা রহিত পড়ে মহী।
সখী ডাকে পরিত্রাহি রামা করে আইঢাহি
মরমে দংশিল কাম-অহি॥
ক্ষণেকে ক্ষণেকে জ্ঞান কহে দহে মোর প্রাণ
পরিত্রাণ কর মোরে সই।
বিলম্ব বিহিত নয় না জানি কি পরে হয়
ফিরাও ফিরাও হীরা কই॥
আমারে কহিল মন্দ চিত্তে বড় নিরানন্দ
প্রভাতে গেলাম তার কাছে।
বিনয় করিল যত এক মুখে কব কত
তাহা কি সকল মনে আছে॥
দশনে লইয়া কুটা যত্নে ধরে হাত দুটা
পুনঃ পুনঃ বলে মাথা খাও।
স্নানছলে সরোবরে সুপুরুষ গুণধরে
যাও যাও বারেক দেখাও॥

হীরাবতী যত ভাষে সুকবি সুন্দর হাসে
হাতে পায় আকাশের ইন্দু।
কালীপাদপদ্মতলে শ্রীকবিরঞ্জন বলে
তারিণী তরাও ভবসিন্ধু॥

বিদ্যাসুন্দরের পরস্পর দর্শন।

সুপুরুষ সুন্দর সুধীর ধীরে ধীরে।
মিলিল সঙ্কেত সেই সরোবর-তীরে॥
বিদ্যা বিনোদিনী বসি বাতায়ন-তলে।
বিদগ্ধ বিনোদ চলে বকুলের তলে॥
শুভক্ষণে উভয়ত মুখবিলোকন।
দৃষ্টি শর পরস্পর জরজর মন॥
মোহিতা মহীতে পড়ে মহীপাল-বালা।
শান্তি নাই বিষম কুসুম-শর-জ্বালা॥
উথলে বিরহ-সিন্ধু ভাঙ্গে শান্তিসেতু।
মনোমীন ধরিল ধীবর মীনকেতু॥
কলেবর কম্পিত কদলী যেন ঝড়ে।
বিদ্যার বাসনা জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে॥
সতী কহে কাম-অহি দংশিল মরমে।
লোমে লোমে পুড়ে উঠে প্রমাণ সরমে॥
নিকটে দশমদশা চেষ্টা কর সই।
কোথা সেই সোঝা ওঝা ধন্বন্তরি সেই॥
সখী কহে সুবদনি সাবধান হও।
হীরা ডেকে কিরা দিয়া ফিরা তত্ত্ব লও॥

সহসা এমত কার্য্য তুমি ত অভব্যা।
যদ্যপি পণ্ডিতা হও তথাপিও নব্যা॥
বিষম প্রতিজ্ঞা তব বিখ্যাত জগতে।
পরাস্ত নহিলে বল বরিবা কি মতে॥
ভূপতিকে জানাও আনাও বন্ধুচয়।
পশ্চাৎ যাহাতে লাজ কাজ ভাল নয়॥
বন-মত্ত-হস্তী মন দুষ্টাচারী বড়।
ক্ষমাঙ্কুশক্ষেপে কর কুম্ভে দড় দড়॥
রসময়ি কহে সই প্রতিজ্ঞা তাবত।
স্মরশরে ভেদ তনু নহেক যাবত॥
ক্ষমাঙ্কুশ খোয়া গেল অনঙ্গ-অলসে।
মনমত্ত বারণ বারণ হবে কিসে॥
কান্ততনু এ কান্ত একান্ত মোর বটে।
আর ইচ্ছা নাই সই স্বামী হেন ঘটে॥
সুন্দর স্বরূপ রূপ ভূপসুত কই।
যত্নরত্ন মিলাইলা কালী কৃপাময়ি॥
দেবীপুত্র দীপ্তিমানা মহাজন এই।
এজনে যে কহে মূর্খ মহা মূর্খ সেই॥
সুন্দর লইয়া কিছু শুন বিবরণ।
রূপস রূপসী-রূপ করে নিরীক্ষণ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে ঘনায়েছে দিন।
মিলিবে সুন্দর বর সকলে প্রবীণ॥

সুন্দরদর্শনে বিদ্যার সখী প্রতি উক্তি ।

সুন্দর সুন্দর বর এই বটে আলি ।
দড়দড় কি কব কহ কি শুনে আলি ॥
সুবর্ণ সুবর্ণ জিনি মুখকমলজ ।
কি রূপ কিরূপ করি কৈল কমলজ ॥
তনু তনু চিন্তায় কেমনে জ্বালা সই ।
জীবন জীবন মধ্যে ত্যজি মেনে সই ॥
মন্দ মন্দগ্রহ মোর বুঝেছি একান্ত ।
কালী কালী দিলা মনে না দিলা এ কান্ত ॥
বারণ বারণমন কদাচ না মানে ।
ক্ষপা ক্ষপাদিবা ছোটে কি করিবে মানে ॥
সর্ব্ব সর্ব্বকাল পূজি পাঁড়া এই ধারা ।
নিত্যা নিত্যাবধি দিলা দুনয়নে ধারা ॥
তারা তারাপতি যদি মিলাইলা করে ।
ফের ফের দিয়া বিধি বঞ্চনা বা করে ॥
হর হরবধূ দুঃখ তনয় প্রসাদে ।
বিদ্যা বিদ্যা কবিবরে করহ প্রসাদে ॥

বিদ্যা দর্শনে সুন্দরের মোহ ।

কি রূপসী অঙ্গে বসি অঙ্গ খসি পড়ে ।
প্রাণ দহে কত সহে নাহি রহে ধড়ে ॥
মধ্য ক্ষীণ কুচ পীন শশহীন শশী ।
আস্যবর হাস্যোদর বিম্বাধর রাশি ॥

নাসাতুল তিলফুল চিন্তাকুল ঈশ।
বাক্যসৃষ্টি সুধাবৃষ্টি লোলদৃষ্টিবিষ॥
দন্তাবলী শিশু অলি কুণ্ডকলি মাঝে।
ভুরু অনু কামধনু হেমতনু সাজে॥
নীলগিরি শুকপুরি তনুপরি ভৃঙ্গ।
মঞ্জুরব মনোভব মহোৎসব রঙ্গ॥
নৃপসুত মোহযুত এ অদ্ভুত দেখি।
কহে রাম অনুপাম গুণধাম একি॥

বিদ্যা কর্ত্তৃক ভগবতীর স্তব।

বিদ্যা রূপবতী সতী কৃতাঞ্জলি শুদ্ধমতি
কায়মনোবাক্যে করে স্তব।
তুমি নিত্যা পরাৎপরা জন্মজরা মৃত্যুহরা
তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু তুমি ভব॥
তুমি জল তুমি স্থল ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলাফল
তুমি সন্ধ্যা দিবা বিভাবরী।
তুমি কুলাচল সিন্ধু তুমি রবি তুমি ইন্দু
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী॥
তুমি শান্তি পুষ্টি সুধা তুমি লজ্জা তুমি মেধা
মহামায়া করালরূপিণী।
শক্তিরূপা সর্ব্বভূতে বিহরসি শৈলসুতে
কুণ্ডলিনী চক্রবিভেদিনী॥
ত্রিগুণা সচ্চিদানন্দ রূপিণী লিখনকন্দ
স্থূলসূক্ষ্মা ধরণী-ধারিণী।

অপর্ণা অভয়া উমা ভবানী ভৈরবী ভীমা
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণী ॥
কৃপা কর কৃপাময়ি কেহ নাহি তোমা বই
শঙ্করী কিঙ্করী তব ডাকে।
সুন্দর সুন্দর তনু অভিন্ন কুসুমধনু
সেই পতি দেহি মা আমাকে ॥
একান্ত কাতরা বিদ্যা তুষ্টা মহাবিদ্যা আদ্যা
পড়িলা প্রসাদ জবাফুল।
শ্রবণে শুনিল এই তোমার সন্দেশ সেই
আজি নিশি সকল প্রতুল ॥
পুলকিতা পঙ্কজিনী হাসি কহে মৃদুবাণী
কর সখি উচিত যে কায।
ভাগ্যের নাহিক লেখা নিশিযোগে হবে দেখা
ভেটিবে সুন্দর যুবরাজ ॥
বিদ্যার মনের কথা বুঝি সখিচয় তথা
কৌতুকে করয়ে চারুবেশ।
কালীপাদপদ্মতলে শ্রীকবিরঞ্জন বলে
দূর কর নিজ সুত ক্লেশ ॥

বিদ্যার বাসর সজ্জা।

সুন্দরীর সহচরী ভাল জানে চর্য্যা।
রতনমন্দিরে করে মনোহর শয্যা ॥
দুই দুই তাকিয়া খাটের দুই পাশে।
রূপবতী বিদ্যাবতী মনে মনে হাসে ॥

বড় এক গিরদা শিয়রে সখী রাখে।
এই বটে দেখ এসে হেসে হেসে ডাকে॥
ঢৌল ভাঙ্গি টাঙ্গাইল চিকণ মশারি।
ভৃঙ্গারে পূরিত রাখে সুবাসিত বারি॥
ভক্ষ্যদ্রব্য নানাজাতি মণ্ডা মনোহরা।
সরভাজা নিখতি বাতাসা রসকরা॥
অপূর্ব্ব সন্দেশ নামে এলাইচ দানা।
ফুল চিনি লুচি দধি দুগ্ধ ক্ষীর ছানা॥
সাজাইল বাটাতে কর্পূর সাঁচি বিড়া।
ভক্ষণে যুবকজনা সুখে করে ক্রীড়া॥
কৌটা ভরা ছাঁকা চূণ কর্পূরের সঙ্গ।
এলাইচ জায়ফল জইত্রে লবঙ্গ॥
কালাগুরু মৃগমদ কুঙ্কুম কস্তূরী।
সুগন্ধ চন্দনগন্ধে আমোদিত পুরী॥
মল্লিকা মালতী মালা সুবর্ণের পাত্রে
যুবকযুবতী দেহ দহে ঘ্রাণমাত্রে॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপামই।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

কবির ভগবতীর স্তব।

এথা কবিবর সুন্দর সুন্দর
নিরখি নৃপজারূপ।
ভাবে গদগদ নাহি চলে পদ
শর হানে স্মর ভূপ॥

কহ উপদেশ কিরূপে প্রবেশ
হইব বিদ্যাবতী বাসে।
দুরন্ত প্রহরী দিবা বিভাবরী
জাগে তনু কাঁপে ত্রাসে॥
নমো ভগবতি কিবা জানি স্তুতি
প্রধানা প্রকৃতি কালী।
শ্মশানবাসিনী দনুজনাশিনী
মুণ্ডমালী মা করালী॥
ত্রৈলোক্যবন্দিনী ভূধরনন্দিনী
অখিল-ব্রহ্মাণ্ড-মাতা।
সকল সিদ্ধিদা গিরীশ প্রমদা
তুমি হরি হর ধাতা॥
স্তব করে কবি পরিতুষ্টা দেবী
পুনরপি আজ্ঞা হয়।
ভয় নাহি বচ্ছ ইহা কোন্ তুচ্ছ
সুখে কর পরিণয়॥
অপরূপ কথা অকস্মাৎ তথা
হইল সুড়ঙ্গপথ।
প্রসাদের বাণী ভক্তের ভবাণী
পূরাইলা মনোরথ॥

কবির সুড়ঙ্গপথে গমনোদ্যোগ।

বিজ্ঞবর বরাবর বিবরবিশিষ্ট।
হ্রীরূপিণী হ্রীরাখিণী হৃদয়েতে হৃষ্ট॥

নিভৃতে নাগর নানা রস করে রঙ্গে।
চন্দনে চর্চ্চিত চারু চামীকর অঙ্গে॥
কম্বুকণ্ঠে কলিত কাঞ্চন কণ্ঠমাল।
মস্তকে মুকুট মণি-মুকুতা-মিশাল॥
মোহন মুকুরে মঞ্জু মুখ নিরখিয়া।
উথলে অমিয়া-সিন্ধু উল্লাসিত হিয়া॥
যামিনী যামার্দ্ধে যাত্রা জায়া হেতু কবি।
আলো করে আন্ধারে আপন অঙ্গছবি॥
ভাগ্য ভাল ভাবিতে ভাবিতে ভয় ভাগে।
চলিতে চঞ্চল চিত্ত চমৎকার লাগে॥
ধন্যা দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে।
আমি কি অধম এত বৈমুখ আমারে॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব।
কহিবার কথা নহে বিশেষ কি কব॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

বিদ্যার উৎকণ্ঠাবস্থায় সুন্দরের দর্শন।

ধন্য সে যামিনী মধু কুহরে কোকিলবধূ
পূর্ণবিধু উদয় গগনে।
মত্ত মধুকরবৃন্দ ফুলে পিয়ে মকরন্দ
মুখরিত কুসুমকাননে॥
গগনেতে মেঘ দেখি আনন্দ-অপার শিখী
মন্দ মন্দ মলয় সমীর।

বিদ্যার উৎকণ্ঠাবস্থায় সুন্দরের দর্শন।

সুচারু কুসুম ঘ্রাণ   স্মরশরে দহে প্রাণ
বিদ্যা বিনোদিনী নহে স্থির॥
রসমই কহে সই   কহ সে নাগর কই
তাহা বই মনে নাহি ভায়।
নাহি সুখ একটুক   মহাদুঃখ ফাটে বুক
প্রায় বুঝি মোর প্রাণ যায়॥
এই যুক্তি করে বসি   শরদ-পূর্ণিমা-শশী
হেনকালে উপস্থিত কবি।
রূপ তুল্য বটে নাম   মহাকবি গুণধাম
প্রচণ্ড প্রতাপে যেন রবি॥
সব-সখী-সম্বলিতা   চন্দ্রমুখী চমকিতা
নিরখই চঞ্চল নয়নে।
কিঙ্করী যোগায় বারি   পদযুগ ধৌত করি
বসিলা রতন-সিংহাসনে॥
ধনবন্ত মহাকুল   পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত   শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত
প্রসন্না কালিকা কৃপামই॥
সেই বংশসমুদ্ভূত   ধীর সর্ব্বগুণযুত
ছিল কত কত মহাশয়।
অনচির দিনান্তর   জন্মিলেন রামেশ্বর
দেবীপুত্র সরলহৃদয়॥
তদঙ্গজ রামরাম   মহাকবি গুণধাম
সদা যারে সদয়া অভয়া।

প্রসাদ তনয় তার কহে পদে কালিকার
কৃপাময়ি ময়িকুরু দয়া॥

বিদ্যা ও সুন্দরের বিচার।

কামদেব-ব্যাধ-তুল্য কুমার সুন্দর।
ভুরু ছলে ধৃত ধনু দৃষ্টি খরশর॥
কিঞ্চিৎ সন্ধানে হানে মানভঙ্গ-রঙ্গ।
কি আর করিবে বিদ্যা বিদ্যার প্রসঙ্গ॥
জ্ঞানহারা গোমধ্যা গোযুগে জল ঝরে।
ধূলায় ধূসর ধড় ধড়ফড় করে॥
চমাকতা চঞ্চলাক্ষী চেতনা জন্মিল।
সলজ্জিতা শশিমুখী সম্ভ্রমে বসিল॥
ক্ষণেক রমণী চাহে মৌনভাবে থাকে।
হেনকালে পর্ব্বতশিখরে শিখী ডাকে॥
হাস্যযুতা সখী প্রতি কহে কমলিনী।
সুলোচনা সুধাও কিসের রব শুনি॥
ভাব বুঝি গুণরাশি মন্দ মন্দ হাসে।
অমিয়া সদৃশ শ্লোকে অন্যোত্তর ভাষে॥

শ্লোকঃ।

গোমধ্যমধ্যে মৃগগোধরে হে
সহস্রগোভূষণকিঙ্করাণাং।
নাদেন গোভৃচ্ছিখরেষু মত্তা
নৃত্যন্তি গোকর্ণশরীরভক্ষাঃ॥

অস্যার্থঃ।

হে গোমধ্যমধ্যে বাল-কুরঙ্গলোচনি।
সহস্রগোভূষণ-কিঙ্কর-নাদ শুনি॥
গোভৃৎশিখরে মত্ত পরম উৎসব।
গোকর্ণ-শরীর-ভক্ষ করয়ে তাণ্ডব॥
সখী সম্বোধিয়া কহে বুঝা নাহি যায়।
পুনরপি হাসি কহে সুবিদগ্ধ রায়॥

শ্লোকঃ।

স্বযোনিভক্ষধ্বজসম্ভবানাং
শ্রুত্বা নিনাদং গিরিগহ্বরেষু।
তমোহরিবিম্বপ্রতিবিম্বধারী
রুরাব কান্তে পবনাশনাশঃ॥

অস্যার্থঃ।

স্বযোনিভক্ষকধ্বজ তাহাতে উৎপত্তি।
তার নাদে উন্মত্ত গিরিমধ্যে স্থিতি॥
তিমিরারি-বিম্ব-প্রতিবিম্বধারী যেই।
পবনভক্ষের ভক্ষ ঘন ডাকে সেই॥
চমৎকার কথা শুনি বটে গুণধাম।
পুনরপি হে সখি সুধাও দেখি নাম॥
কৃতাঞ্জলি সহচরী কহে পুনর্ব্বার।
কহ শুনি মহাশয় কি নাম তোমার॥

শ্লোকঃ।

বসুধা বসুনা লোভে বন্দতে মন্দজাতিজং।
করভোরু রতিপ্রাজ্ঞে দ্বিতীয়ে পঞ্চমেহপ্যহং॥

অস্যার্থঃ।

বস্থ হেতু সুমূর্খ মানব গুণযুত।
বন্দয়ে যে জাতি লোভে অনুগত॥
করভোরু রতিপ্রাজ্ঞে তিষ্ঠ মন্দ যাম।
চিন্তা কর দ্বিতীয় পঞ্চমে মোর নাম॥
এক বস্তু তিন কিন্তু একে তিন লাভ।
কহ কহ তরলাক্ষি এবা কোন ভাব॥
আদ্য অন্তে যেটা সেটা কামনা সদাই।
আদ্য অন্তে পাঠে তুল্য কৃপালেশ পাই॥
চারি মধ্যে সুবিখ্যাত বর্ণচারি সার।
আশ্রয়েতে চারি ফল পঞ্চ সুপ্রচার॥
কালীকিঙ্করের কাব্যকথা বুঝা ভার।
বুঝে কিন্তু সে কালী-অক্ষর হৃদে যার॥
হেসে বলে হরিণাক্ষী হারিলাম আমি।
সুপুরুষ সুন্দর সুধীর সত্য স্বামী॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালীকৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

বিদ্যাসুন্দরের বিবাহ।

মাস মধু ডাকে মধুকরবধূচয়।
কুলবধূ কামবধূ ইচ্ছা অতিশয়॥
সুশীতল সময় মলয় মন্দ বহে।
স্মর হানে খরশর ভর কত সহে॥

পরাভব মানি সুখী বীরসিংহ বালা।
স্বয়ম্বরা কান্তকণ্ঠে সমর্পিলা মালা॥
উত্তম ঘটক সুন্দরের গাঁথা হার।
বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তা চিত্ত দোঁহাকার॥
পুরোহিত হইলেন আপনি মদন।
বিদ্যালাপছলে বুঝি পড়ালা বচন॥
উলু দিছে ঘনঘন পিকসীমন্তিনী।
নয়নচকোরী সুখে নাচিছে নাচনী॥
বরযাত্র মলয়পবন বিধুবর।
মধুকরনিকর হইল বাদ্যকর॥
কান্তাকুচে জ্বলদগ্নি বিচারিয়া কবি।
করপদ্মে করে হোম স্নেহ করি হবি॥
উভয়ত কুটুম্ব রসনা ওষ্ঠাধর।
পরস্পর ভুঞ্জে সুধা মুখেন্দু উপর॥
যুগল নিতম্ব উরু জালালি ফকির।
বিজাতীয় শব্দ করে কাঁথায়ে মঞ্জীর॥
নূপুর কিঙ্কিণীজালে নানা শব্দ হয়।
দুই দলে দ্বন্দ্ব যেন চন্দনসময়॥
পুনরপি শুন বিবাহের সমাচার।
কামিনীর কঙ্কণা ভাটের রায়বার॥
সস্ত্রীক আইলা কাম দেখিতে কৌতুক।
দম্পতিকে পঞ্চশর দিলেক যৌতুক॥
দম্পতিরে তুষ্ট হয়ে দম্পতি চলিল।
দক্ষিণা পশ্চাতে হবে সম্প্রতি রহিল॥

পরাভব মান সুখি বীরসিংহ বালা ।
স্বয়ম্বরা কান্তকণ্ঠে আরোপিল মালা ॥
শুভক্ষণে অন্যান্য দর্শন কুতূহলি ।
সহচরীগণ রঙ্গে দেয় হুলাহুলি ॥
পতি প্রদক্ষিণ সতী করে সপ্তবার ।
সুধার সাগরে ভাসে-তনু দোঁহাকার ॥
সুন্দরীরে সমর্পিলা সুন্দরের হাতে ।
সুন্দর সিন্দূর দিলা সুন্দরীর মাথে ॥
এই তব দাসী গুণরাশি মিথ্যা নহে ।
আড়ালে আসিয়া অলি আড়ি পাতি রহে ॥
নানা উপহার করি করিয়া ভোজন ।
কর্পূর তাম্বুলে করে মুখের শোধন ॥
সুশীতল মরুত মলয় মন্দ বহে ।
স্মর হানে খরশর ভর কত-সহে ॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কৃপাময়ি ।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ।

শৃঙ্গার উপক্রমে বিদ্যার বিনয় ।

রমণীমণি নাগররাজ কবি ।
রতিনাথ-বিনিন্দিত চারু ছবি ॥
ধনি-মুখ-চিবুক ধরে যতনে ।
মুখ চুম্বতি সুন্দর হৃষ্টমনে ॥
নাগরী রসিকা রসিকপ্রবীণা ।
যুবতী সময়ে হৃদয়ে কঠিনা ॥

কুচপদ্মকলি করপদ্ম ধরে।
তনু লোমাঞ্চিত রস-রঙ্গভরে॥
চমকি চমকি কহে কি কর হে।
নখ-ঘাতন-যাতন খেদ কহে॥
যুবরাজ এ কায তোমার নহে।
নহি ধীর এ বক্তু, নহে পিব হে॥
দশনে জ্বলিছে সহেনা সহেনা।
পুন তো প্রাণ তো রহেনা রহেনা॥
বঁধু জীবন জীবন দান কর।
গুণরাশি এ দাসীর বাক্য ধর॥
রসকাল নহে হও কাল কেন।
দেহ মর্ম্মপীড়া ছিছি কর্ম্ম হেন॥
লাজ না বাস কি হাস বুক ফাটে।
কি করে পিরীতে এ রীতে না আঁটে॥
ছাড় কান্ত নিতান্ত অশান্তপনা।
প্রাণবল্লভ দুর্ল্লভ সুল্লভনা॥
কহ যে সহজে নহ যে সে ধারা।
এহি কায অকায কুকায করা॥
ধর হাত কি নাথ পুনঃ পুনঃ হে।
হৃদয়েশ বিশেষ কথা শুন হে॥
একি সাধ কি সাধহ বাধ কহি।
ভাব যেরূপ সেরূপ কিন্তু নহি॥
প্রভু মত্তকরী আমি পঙ্কজিনী।
করি-শৃঙ্গার-যোগ্য বটে করিনী॥

একবার প্রকার রূপে তরিলে।
হবেনা হবেনা হবেনা মরিলে॥
শুন আলি ত কালি কুগালি দিবে।
প্রভু চোর হবে কি তবে ছাড়িবে॥
মরিহে মরিহে ধরিহে চরণে॥
রমণে এমনে জানিহে কেমনে॥
রসিকঃ সুজনঃ প্রভুহে চতুর॥
মরি বালজনে কেন হে নিঠুর॥
বলে মুহু মুহু মুখে উহু উহু।
যথা কোকিলকূজিত কুহুকুহু॥
নয়নযুগল সলিলে গলিত।
কনক-মুকুরে মুকুতা রচিত॥
মদনজ্বর না কর ছাটফটী।
কবিরাজ কহে কবিরাজ বটি॥
কুচমর্দ্দনালিঙ্গন চুম্বন লো।
শুন এহি ত্রিদোষজ ভঞ্জন লো॥
যদি রোগ সুসম্যক সাম্য নহে।
রসনারস পানে কি রোগ রহে॥
শ্রমনীরে শরীর সমস্ত ভাসে।
করি ধরি সমীর সুধীর ভাষে।
কবিরঞ্জন তোটক ছন্দ ভণে।
করুণাঙ্কুর কালি সুদীন জনে।

শৃঙ্গারে পরস্পর উক্তি।

কাতর কামিনী বদন যামিনী
নাথ মলিন হি ভেল।
মুকুতা জৈসন সোহত ঐসন
সরম জল উপলেজ॥
সঘন রোদিতি বদতি পতি প্রতি
রহত বিদগ্ধরাজ।
বাল দুরবল ধরম কৈসল
নাহিক ভয় কটুলাজ॥
কোটি পরণাম হে প্রভু গুণধাম
সুরতরস দেহ ভঙ্গ।
হাম কৃশোদরী পুরুষ কেশরী
কৈসে সম তুহ সঙ্গ॥
কহই করিবর কুসুমশরবর
দহনে জরজর দেহ।
রমণীমণি ধনী নব সরোজিনী
সবহু চাতুরী এহ॥
কণতি পরভৃত মনহি কৃতহত
উয়ল নিরমল ছন্দ।
মধু বিভাবরী হে বর-সুন্দরী
মলয়ানিলগতি মন্দ॥
রসিক সো বিধি বিরহবারিধি
তরণী দেয়ল তোয়ে।

কপটকহেসি বিচেড়ু বয়েসি
কাহে নিকরুণ মোরে ॥

শৃঙ্গারে সখীদিগের ব্যাঙ্গোক্তি।

অকার হকার বর্ণে আকার সংযুক্ত।
উহু উহু মুহু মুহু কেশপাশ মুক্ত ॥
কাতরা কামিনী কান্দে কহে কণস্বরে।
দিয়া পীড়া ক্রীড়া ব্রীড়া না বাস অন্তরে ॥
চিরদিনে অনশনে ক্ষুধা বিপর্য্যয়।
আধার সহিত সুধা পান ভাল নয় ॥
যে পর্য্যন্ত কাননে কুসুম থাকে কলি।
তদবধি তাহে মধু নাহি পীয়ে অলি ॥
সময়ে সকল ভাল শুনহ নিশ্চিত।
অসময় জানিবা সে হিতে বিপরীত ॥
শীতে সুধাসম বহ্নি গ্রীষ্মেতে সে নহে।
বসন্তে ভ্রমণ পথ্য বর্ষাতে কে কহে ॥
হত্যা হই হউক মেনে হাস যুবরাজ।
ক্ষীণা আমি ক্ষমা কর ক্ষেপাপারা কায ॥
ভার্য্যা সঙ্গে চর্য্যা ইহা শুনি নাহি কভু।
আজি ঘর কালি কি পান্দাড় ভাব প্রভু ॥
আড়ে আলি হেস্যো পড়ে এ উহার গায়।
মলি লো গোল্লায় গেলি লাজ খেলি হায় ॥
ঘুম গেল ধূম বড় ঘর মেনে ছাড়ি।
বিয়ারাত্রে বেহায়া বড় না বাড়াবাড়ি ॥

মিথ্যা কন্যা অবলা অবলা বোল ছাড়।
নামমাত্র বালা দেখি ইচ্ছা বড় গাঢ়॥
মুখে মুখে ফাসফুস একি প্রেম ঈষ।
আমরাই হইলাম দুচক্ষের বিষ॥
কেহ বলে তুমি মেয়ে হানফেনে বড়।
যাগী বটে কত ঠাটে কথা দড় দড়॥
কেহ বলে থেকে থেকে পড়ে যেন চীল।
শুন নাই অচট ভূমের ভাঙ্গে খীল॥
মর্দ্দ বড় শক্ত সই কেহ কেহ বলে।
অনুমানি বুঝি ক্ষেতে সদ্য ফল ফলে॥
সহ্য নহে ক্রোধে কহে আলো আলি শোন।
হানিয়া খাঁড়ার চোট ঘস্যে দিস্ লোন॥
শিথিল অনঙ্গরস অঙ্গভঙ্গ দিয়া।
হস্ত পদ পাখালিল বাহিরেতে গিয়া॥
পুনরপি শয্যায় বিহরে দোঁহে রঙ্গে।
দোঁহে সমীরণ করে দোঁহাকার অঙ্গে॥
পরস্পর অঙ্গে রঙ্গে লেপয়ে চন্দন।
হেসে হেসে উভয়ত বদনচুম্বন॥
শ্রীকবিরঞ্জন এই কহে কৃতাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলালে মাতা দেহি পদধূলি॥

বিপরীত শৃঙ্গার।

ক্ষণেক অন্তরে কহে কবি মহামতি।
বিপরীত রতি দান দেহ লো যুবতি॥

নেকা ঢঙ্গ হয়্যে রামা কহে সেই কি।
প্রকার শুনিয়া লাজে দাঁতে কাটে জি॥
অন্তরে আনন্দ অতি সায় দিতে নারে।
পুরুষের কায প্রভু রমণী কি পারে॥
বিদগ্ধ বট হে প্রভো বিজ্ঞ নিজে হও।
কেমনে এমন কথা মুখ ভরে কও॥
সাঁতারে হাঁপায়্যে শেষে স্রোতে ঢাল পা।
সেইরূপ চেষ্টা পাও মনে আছে যা॥
এ কথা না ভুলি আর মরমে রহিল।
এখন সময় নহে কালেতে হইল॥
মিছা পরিহাস হাস কিবা প্রিয়ে ভায।
ভাবে বুঝি ভর্ত্তাবধে ভয় নাহি বাস॥
লঙ্ঘনে স্বামীর বাক্য জন্মে মহাপাপ।
সুধাংশুবদনে শীঘ্র শান্ত কর তাপ॥
বিদ্যা বলে পায় পড়ি সে কি এত মধু।
গণিকা ত নহি প্রভু হই কুলবধূ॥
কবি কহে যে কহ সে কহ প্রাণপ্রিয়া।
রক্ষা কর বিপরীত রতি দান দিয়া॥
নহিলে হে তাহা আমি যদি মরি আজি।
ভ্রান্ত কান্ত শান্ত হও হইলাম রাজি॥
লাজের দুয়ারে ধনী ভেজায়ে কপাট।
প্রবর্ত্ত প্রকৃত কার্য্যে তবু নানা ঠাট॥
বিগলিত জঘনে সঘনে বেণী দোলে।
যেন পূর্ণশশী পূর্ণশশী করে কোলে॥

অদ্ভুত চরিত্র চিত্তমধ্যে লাগে ধন্দ।
প্রফুল্ল কমলে মধু পিয়ে মকরন্দ॥
চকোর খঞ্জনে প্রেম আলিঙ্গন করে।
বিকচকমলে চান্দে বারিবিন্দু ঝরে॥
মনের বাসনা পূর্ণ তূর্ণ রসে ক্ষমা।
মুখে মন্দ মন্দ হাস বাস পরে রামা॥
রূপস-রূপসী নিশিশেষে নিদ্রা যায়।
প্রভাকর প্রকাশিল রজনী পোহায়॥
সুকবি সুন্দর গেলা মালিনীর বাসে।
কহিলা সকল কথা বসি তার পাশে॥
শ্রীকবিরঞ্জনে কালী হও কৃপামই।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই।

পরদিন মালিনীর ও বিদ্যার রহস্য কথোপকথন।

শুনিয়া নিশির কথা মনে মনে হাস্যযুতা
হীরাবতী প্রফুল্ল অন্তরে।
নানা ফুলে নানা ভাতি যেন মুকুতার পাঁতি
হার গাঁথি লইল সত্বরে॥
গেল নৃপসুতাপাশে রামা হাসে লাজ বাসে
অধোমুখে বিধুমুখ ঢাকে।
আগুসারি যত্ন করি মালিনীর হাতে ধরি
সমাদরে বসাইলা তাকে॥

হীরা বলে রও রও কেন গো উতলা হও
আজি এত কেন ঠাকুরালি।
হেদে বাছা ছাড় লাজ সারাসোরা হল্যো কায
দেহ পুরস্কার ঘটকালি॥
কুশল সম্বাদ কহ ভাব যদি ভিন্ন নহ
তুমি বধূ বটি গো শ্বাশুড়ী।
হবে গো দুলাল তোর সে দিন কেমন মোর
সে ডাকিবে কোথা আইবুড়ী
কাছে আসি হাসি আলি শিরে তৈল দিল ঢালি
আপনি আঁচড়ে বিদ্যা কেশ।
কত ঠাট জানে হীরা পুনরপি কহে ফিরা
বুড়ী আমি বৃথা কর বেশ॥
বিদ্যা বলে নহ বুড়ী মাসাস্ রসের গুঁড়ী
মর্ মাগী এত এসে তোরে।
ছাই কথা কি কহিস পুনঃ পুনঃ লজ্জা দিস
পায় পড়ি ক্ষমা কর মোরে॥
যেতে হবে ঠাঁই ঠাঁই ভুলিয়াছি মনে নাই
মালিনী কৌতূকে কহে হাসি।
হইল স্নানের কাল মিছা করি গল্পগাল
সকলি শুনিব কালি আসি॥
বিদ্যা দিল চালু কড়ী কলাই কুমুড়া বড়ী
হীরাবতী ঘরে যায় রঙ্গে।
কি কর শ্বাশুড়ে বসে কহে হেসে শুন এসে
যে কথা হইলা তার সঙ্গে॥

সদা পুটাঞ্জলি-পাণি শ্রীকবিরঞ্জন-বাণী
বিমুক্ত করহ মায়াপাশে।
ভবসিন্ধু পার হেতু অভয় চরণ সেতু
উমা আমা উরহ মানসে॥

বিদ্যার মানভঞ্জন।

কবি কহে বটে মাসি পরামর্থ পাকা।
হীরা বলে চাহি বাপু ঘটকালি টাকা॥
দেখাইল যে যে দ্রব্য পেয়েছিল তথা।
দণ্ড দুই বসি কহে নানা রসকথা॥
স্নান করি পূজে কবি শঙ্করঘরণী।
যে পদপঙ্কজ ভবসাগরতরণী॥
রন্ধন ভোজন করে রাজার নন্দন।
নিদ্রালস্যে কিছুকাল করিল শয়ন॥
নিশিযোগে নিজাঙ্গনাবাসে গেল রঙ্গে।
কৌতুকে রমণসুখ রমণীর সঙ্গে॥
দিবাভাগে নানা বেশ ধরে গুণধর।
ভ্রমণ করয়ে নিত্য রাজার সহর॥
কখন পরমহংস যতি ব্রহ্মচারী।
কখন বা বৈষ্ণব তিলককণ্ঠিধারী॥
নগরের লোক কেহ লক্ষিতে না পারে।
পরম পুরুষ জানি ভক্তি করে তারে॥
একদিন কৈল কবি ঔদাস্য উদয়।
না গেল সে দিন বিদ্যাবতীর আলয়॥

পতির বিরহে সতী অতি দুঃখযুতা।
জাগিয়া যামিনী পোহাইল নৃপসুতা॥
পরদিন উপনীত সুন্দরীর বাসে॥
কান্তমুখ হেরি মুখ যত্নেঢাকে বাসে॥
ধরি হাত দিয়া মাথে কত দিলা কিরা।
না কহে বচন রামা নাহি চায় ফিরা॥
নয়নসলিলে ভাসে অঙ্গের বসন।
মানভঙ্গ না হয় বিমর্ষ বিলক্ষণ॥
বিচারিল মনে মনে এক যুক্তি আছে।
কপটে নিকটে গিয়া তৃণ দিয়া হাঁচে॥
মৌনব্রত-ভঙ্গ-ভয়ে না কহিল জীব।
তাড়ঙ্ক দোলায়ে বালা চিন্তা করে শিব॥
অপ্রতিভ যুবরাজ অধোমুখে রহে।
মৃদু মৃদু হাসি পুনরপি কিছু কহে॥
রোদন করহ প্রিয়ে না করি নিষেধ।
আমার হৃদয়ে সবে এই মাত্র খেদ॥
গলিত সাঞ্জনধারা তাহে ম্লান মুখ।
চিরদুঃখ গেল চিত্তে চান্দের কৌতুক॥
সহজে কলঙ্কী সে তবাস্য সম নহে।
লজ্জা ভয় দুই হেতু দিবা গুপ্তে রহে॥
কদাচ না কহি কান্তে মিথ্যাকথাগুলা।
হের হিমকর প্রিয়ে ও বদনতুলা॥
ক্রোধে প্রিয়তমে তব তবে কিবা কায।
আহারে ও ব্যবহারে কার আছে লাজ॥

ফিরা দেহ মদর্পিত চুম্ব আলিঙ্গন।
আর কেন জানা গেল চরিত্র যেমন ॥
কবিবর বিনোদ বৈদগ্ধ্যগুণে ভাষে।
ফুরাইল মান ফিরে ফিক্ ফিক্ হাসে ॥
আবেশে অধিক আরো আঁটি ধরে গলা।
আলিগণ বলে মাগো এত জান ছলা ॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসী পুত্র হই ॥

বিদ্যার গর্ভ দৃষ্টে সখীগণের নানা যুক্তিচিন্তা।

কতকাল গৌণে বিদ্যা নবকুসুমিতা।
সুলোচনা প্রভৃতি সকলে পুলকিতা ॥
পুনর্ব্বিভা করে গুণসিন্ধুর তনয়।
রজোযোগে রূপবতী গর্ব্ভবতী হয় ॥
দুই তিন চারি পাঁচ মাসেতে প্রবর্ত্ত।
সহচরী বলে বড় হইল অনর্থ ॥
বিরলে বসিয়া যুক্তি করে জনে জনে।
কেহ বলে এই দায় এড়াব কেমনে ॥
কেহ বলে ভাবিয়া জন্মিল মোর বাই।
কেহ বলে চল দেশ ছাড়িয়া পলাই ॥
কেহ বলে নিরবধি ভয়ে কাঁপে প্রাণ।
ভূপতি শুনিলে কাটিবেক নাক কাণ ॥

কেহ বলে অকস্মাৎ হেদেঁ কি উৎপাত।
চেষ্টা কর কোনরূপে গর্ভ হয় পাত॥
কেহ বলে বিদ্যা মেনে কামগাতিশয়।
রাজপুরে একি কাল তনয়া উদয়॥
কেহ বলে মরুক গলায় দিয়া দড়ী।
রাতে দিনে পড়ে থাকে দুটা জড়াজড়ী॥
বিয়ারাত্রে দেখিলাম বর চান্দপারা।
ছুঁড়ীর হাঁপানে ছোঁড়া হল তন্তুসারা॥
কহিলাম কতমত ভূপতিকে বল।
তখন করিল তুচ্ছ এখন এ ফল॥
কেহ বলে স্ত্রীবুদ্ধিতে পরমাদ ঘটে।
কেহ কহে এই কথা শাস্ত্রসিদ্ধ বটে॥
স্ত্রীবুদ্ধে মরিল দশরথ পেয়ে শোক।
স্ত্রীবুদ্ধে মজিল লঙ্কা খ্যাত তিন লোক॥
লয়েছি সবাই শিরে কলঙ্কের ডালী।
কেহ বলে চারা নাই যে করেন কালী॥
কেহ বলে এত কেন চিন্তা কর সই।
রাণীর নিকটে গিয়া সবিশেষ কই॥
ভাল মন্দ তাঁর ঘাড়ে আরের তা কি।
উদরে ধরেছে কেন কুলখাকী ঝি॥
অতি বাম মো সবারে দূর করে দিবে।
পৃথিবীটা পড়্যা আছে ঠাঁই না মিলিবে॥
জীব দিয়াছেন কৃষ্ণ দিবেন আহার।
সে প্রভুকে লাগে সই সবাকার ভার॥

ভাল ভাল বলিয়া সখীরা উঠে ঝেড়ে।
কেহ বলে তোরে মেনে প্রাণ দিব কেড়ে॥
রাণীর নিকটে সব সহচরী যায়।
ভূমিষ্ঠ হইয়া তারা প্রণমিল পায়॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

সখীগণকর্ত্তৃক রাণীর নিকট বিদ্যার গর্ব্ভবার্ত্তা প্রদান।

আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসে রাণী সতী।
ভালতো গো আছে মোর বিদ্যা গুণবতী॥
চিরদিন দেখি নাই সে চাঁদবয়ান।
বড়ই দুরাত্মা আমি হৃদয় পাষাণ॥
তোমরাও ভাল মন্দ না কহ সংবাদ।
না জানি ঘটিল আজি কিবা পরমাদ॥
উষাকালে এসেছ অবশ্য হেতু আছে।
আমার শপথ লাগে সত্য কহ কাছে॥
বিরসবদনে কেন বসিলা নিকটে।
প্রাণ করে উড়ু উড়ু হেরে বুক ফাটে।
নিদ্রায় দুঃস্বপ্ন দেখি ডানি চক্ষু নাচে।
বড় ভয় বৃদ্ধকালে শোক পাই পাছে।
সহচরীগণ বলে শুন ঠাকুরাণী।
কি রোগ জন্মিল আর কারণ না জানি॥

এবে দেখি বিরূপ সে রূপ গেল দূর।
উদর ডাগর বড় বরণ পাণ্ডুর॥
শয়ন সতত ভূমে মৃত্তিকা ভক্ষণ।
মাথা ঘোরে উকি তোলে ইকি অলক্ষণ॥
রাণী বলে কি কহিলে সর্ব্বনেশে কথা।
বুঝি বা খাইল বিদ্যা অভাগীর মাথা॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে দেও সাদ ভেট।
সে বড় যোয়াল মেয়ে বাদায়েছে পেট॥

রাণীর বিদ্যা প্রতি ভর্ৎসন।

শুনি চমৎকার রাণী উঠে।
পাছে শোনে ভূপ চুপ বুক করে দুপ দুপ
কাঁপে কায় কলঘাম ছুটে॥
ভয়ে মুখে উড়ে ধূলা পাছে রহে সখী গুলা
উপনীত নন্দিনী নিকটে।
যে কহিল রামাচয় এ কথা অন্যথা নয়
গর্ব্ভের লক্ষণ যত বটে॥
পূর্ব্বরূপ ছার খার উদরের বড় ভার
ধরাতলে শুয়েছে রূপসী।
শিথিল কটির বাস ঘন বহে মৃদুশ্বাস
আস্য-আভা প্রভাতের শশী॥
সম্মুখে প্রসবস্থলী উঠে বিদ্যা কৃতাঞ্জলি
প্রণমিল লাজে নত মুখ।

কান্দে কথা কহে শুদ্ধ দেখিলাম মুখপদ্ম
কব কি জন্মিল যত সুখ ॥
অনাথিনী থাকি একা ছমাস বৎসরে দেখা
দিনেক তোমার সঙ্গে নাই।
জননী জীয়ন্ত যার এতেক খোয়ার তার
গর্ব্বে কেন দিয়েছিলে ঠাঁই ॥
হেদে এক কথা শোন যদি খাওয়াতিস নোন
ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মোরে।
বালাই যাইত তবে এত কথা কেন হবে
অনুযোগ কে করিত তোরে ॥
চর্য্যা বুঝিলাম আমি মানব-রাক্ষসী তুমি
যমের দোসর সেই বাপ।
আমার কপাল পোড়া বিধাতা নষ্টের গোড়া
পূর্ব্বজন্মে ছিল কত পাপ ॥
রাণী বলে পাপীয়সী প্রাণ ছাড় নীরে পশি
কিম্বা বিদ্যা খা লো তুই বিষ।
নহে খড়্গ কর্ ভর এইক্ষণে মর্ মর্
কলঙ্কিনি কোন্ সুখে জিস্ ॥
নির্ম্মল রাজার কুল তুই কলঙ্কের মূল
জন্মিলি আমার গর্ভে আলো।
এই রাজ্য ত্যজ্য করে যদ্যপি ভাতার ধরে
বেরুতিস সেও ছিল ভাল ॥
সদা পুটাঞ্জলি-পাণি শ্রীকবিরঞ্জন-বাণী
বিমুক্ত কর গো মায়াপাশে।

ভবসিন্ধু পার হেতু অভয় চরণ সেতু
উমা আমা উরহ মানসে ॥

রাণীসহ বিদ্যার বাক্‌চাতুরী।

বিদ্যা মর্‌লো কলঙ্কিণী ঝি।
আমার কপাল পোড়া তোর দোষ কি ॥
বাপের দুলালী ছিলি তাহে তিলাঞ্জলি দিলি
কুলে খোঁটা কুলটা হলি ছি ছি।
কার ঘরে নাই মেয়ে চক্ষু খেয়ে দেখ্ চেয়ে
পাপক্ষণে তোরে উদরে ধরেছি ॥
প্রসাদ কহিছে দড় হেন মেয়ে আইবড়
লাজে লোক দাঁতে কাটে জি ॥ ধূয়া ॥

আলো হেদে লো পাপিনি ঝি।
বিদ্যা বলে দোষ বা দেখিলে কি ॥
আলো কেমনে মিলিল স্বামী।
বিদ্যা বলে পুরুষ না দেখি আমি ॥
আলো কারে কর প্রতারণা।
বিদ্যা বলে চক্ষু নাই বুঝি কাণা ॥
আলো গর্ব্ভের লক্ষণ সর্ব্ব।
বিদ্যা বলে বাতাসে কি জন্মে গর্ব্ভ ॥
আলো উদর ডাগর তোর।
বিদ্যা বলে উদরি হয়েছে মোর ॥

আলো স্তনে ক্ষরে কেন পয়।
বিদ্যা বলে এ রোগে বাঁচা সংশয়॥
আলো কুচাগ্রভাগেতে কালী।
বিদ্যা বলে প্রলেপ দিয়েছি আলি॥
আলো শয়ন কেন ভূতলে।
বিদ্যা বলে নিরন্তর দেহ জ্বলে॥
আলো মুখে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম।
বিদ্যা বলে নিদাঘ কালের ধর্ম্ম॥
আলো পূর্ব্বরূপ গেল দূর।
বিদ্যা বলে দেখ লক্ষণ পাণ্ডুর॥
আলো ঘন ঘন উঠে হাই।
বিদ্যা বলে বলাধান মাত্র নাই॥
আলো ভক্ষণ যে পোড়া মাটি।
বিদ্যা বলে ছি মাগী তোরে না আঁটি॥
তারা মায় ঝীয়ে যত ভাষে।
আড়ে আসি বসি আলি হাসে॥
রস শ্রীকবিরঞ্জনে কহে।
কভু গর্ত্ত ছাপা নাহি রহে॥

রাণী সহ বিদ্যা ও সখীগণের পুনর্বাক্‌ছাল।

এতক্ষণ জিয়া আছ তাই আমি চাই।
বাসনা এমনি হয় আমি বিষ খাই॥
প্রাণসম বাসি পিতা পড়াইল তোকে।
গালে দিলি কালি চুণ হাসিবেক লোকে॥

সমুচিত শাস্তি বিদ্যা তুই পাবি কালি।
উল্টা চোরে গৃহী বান্ধে মোরে দিস্ গালি ॥
বিদ্যা বলে পুনঃ পুনঃ কত কটু কও।
চারা নাই মাগো তুমি গুরু লোক হও ॥
গলায় অঙ্গুলি দিয়া কেন তোল কাশ।
আপনিই আপনার কর সর্ব্বনাশ ॥
কাল বড় কুৎসিত আমাকে কর মাপ।
খুঁড়িতে কেচুয়া পাছে উঠে কাল সাপ ॥
কিবা ডাক ছাড় তুমি কিবা হাত নাড়।
ভাল বটে জীয়ন্ত মাছেতে পোকা পাড় ॥
বারে বারে যত কহি কথা নাহি মান।
যেমন আমার রীত সুন্দর তা জান ॥
অনাথিনীপ্রায় পড়ে থাকি এই ঠাঁই।
পুরুষ কেমন কভু চক্ষে দেখি নাই ॥
সবেমাত্র স্নেহভাবে দেখেছেন বাপ।
গর্ভ গর্ভ বলে কেন দেহ মনস্তাপ ॥
দুঃখের উপরে দুঃখ এ বড় উৎপাত।
কোথা বান্ধিবেক তাগা শিরে সর্পাঘাত ॥
রাণী বলে মর্-মেনে একি আর পাপ।
তবে বুঝি এ কর্ম্ম করেছে তোর বাপ ॥
তোর এ কথায় গায় কাটে যেন বিছা।
পেটে ছেলে লড়েচড়ে তবু বলে মিছা ॥
ক্রোধে কম্পবান তনু ঘূর্ণিত লোচন।
সখীগণ প্রতি কহে কর্কশ বচন ॥

জাতিরক্ষা হেতু আছ বিদ্যার নিকটে।
আপনারা ঘটক হইয়াছিলা বটে॥
তো সবার দোষ নাহি কাল নহে ভালো।
মাথায় করাত দিব কি ভেবেছ আলো॥
করযোড়ে কহে তারা কেন কর রোষ।
বিবেচনা করিলে কাহারো নাহি দোষ॥
জন্মাবধি দেখি নাই পুরুষ কেমন।
রাজরাণী বট কেন কথা গো এমন॥
বাহিরে প্রহরী থাকে দুরন্ত কোটাল।
মনুষ্যসঞ্চার নাহি একি ঠাকুরাল॥
উচিত কহিতে কিন্তু মনে পাবে পীড়া।
রমণী রমণী সঙ্গে নাহি করে ক্রীড়া॥
ভগীরথজন্মকথা শুনিয়াছি কাণে।
সে কালের মেয়ে তারা এ কালে না জানে॥
তবে কে করিল গর্ত্ত এত বড় রঙ্গ।
ছাড় মেনে ঠাকুরাণি এ পাপপ্রসঙ্গ॥
আপনার মান গো আপনি যত্নে রাখি।
লোকে বলে কাটা কান চুল দিয়া ঢাকি॥
আকাশে ফেলিতে ছেপ এসে গায়ে পড়ে।
বাড়া কিবা কহিব কথায় কথা বাড়ে॥
অবিচারে কর নষ্ট তার চারা কিবা।
যার রীত যেমন জানেন মাত্র শিবা॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে করি কৃতাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলালে মাতা দেহ পদধূলি॥

কোটালকে ধরিতে অনুমতি।

নহে সুখী সুমুখী নিরখি নন্দিনীরে।
অসম্বর অম্বর অম্বর পড়ে শিরে॥
জ্ঞানহারা তারাকারা ধারা শত শত।
গোযুগে গলিত ধারা তৃষ্ণানিষ্ঠা গত॥
বিগলিত কুন্তল জলদপুঞ্জছটা।
নিরানন্দ গতি মন্দ জিনিয়া বরটা॥
ভূপ উপে উপনীত মলিন বদন।
সম্ভ্রমে জিজ্ঞাসে শীঘ্র ধরণীভূষণ॥
বিমল কমলমুখ ম্লান কেন কবে।
অদ্য কান্তে কৃতান্তে নিশান্তে কারে লবে।
শিরে হানি পাণি রাণী বলে কব কি।
শুন পর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব গর্ভবতী ঝি॥
কি বল কাঁপিয়া উঠে মুখে উড়ে ফাক্কা।
ভাবনায় ভাতি ভিন্ন ভূপ যায় ভাক্কা॥
সমূলে রুষিল যেন মাতাল মাতঙ্গ।
সুষুপ্তিসময়ে যেন দংশিল ভুজঙ্গ॥
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত নিকটে যেমন।
সেইরূপ শুনি ভূপ মহিলাবচন॥
আপাদ পর্য্যন্ত অগ্নিশিখা যেন দহে।
কোটালের কর্ম্ম এই আর কারু নহে॥
আরবার দরবার মধ্যে গিয়া ভূপ।
কাঁপে গুরু উরু ওষ্ঠ লোচন বিরূপ॥

ক্রোধে কহে তোমরা সওয়ার দশ যাও।
এহি ওক্ত মেরে পাশ বাঘাই মাঙ্গাও ॥
যো হুকুম বলিয়া সওয়ার দশ লড়ে।
কেহ তাজি তুরকী টাঙ্গন পৃষ্ঠে চড়ে ॥
দড়বড় গড় পাড়ে উঠাইয়া ঘোড়া।
রজপুত যমদূত গোঁপে দেয় মোড়া ॥
ঘেরে কোটালের বাড়ী কহে বেহেসাব।
কাঁহা কোতোয়ালগিরি নেকাল সেতাব ॥
বৈঠকখানায় কোতোয়াল শুয়ে খাটে।
সোয়ারের ঘটা দেখি ভয়ে মাগ ফাটে ॥
ধুতি পরি লেঙ্গা শির হইল হাজির।
অমনি ঢেকায় করে বেড়ার বাহির ॥
পাছে থেকে মারে কেহ বন্দুকের হুড়া।
আকটে পাপোস মারে হাড় করে গুঁড়া
কোটালমহিলা কান্দে করে হায় হায়।
এক দণ্ডে নিয়া গেল রাজার সভায় ॥
নিকটে নকীব ছিল করিল জাহির।
নজর দৌলত এই বাঘাই হাজির ॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

কোতোয়ালের বিনয়।

মৌনরূপে ভূপ আছে কোতোয়াল খাড়া কাছে
কোপে কহে ঘন বাহু নাড়া।

কুকুরে প্রশ্রয় দিলে কান্ধে চড়ে এক তিলে
বিশেষ কহিব কিবা বাড়া॥
ক্রোধে কাঁপে মহীপাল কহে ওরে কোতোয়াল
বুঝিলাম তোর নাহি দোষ।
যেমন যুগের ধর্ম্ম তেমন উচিত কর্ম্ম
মিছামিছি আমি করি রোষ॥
কারে কব কাব্য কহ যে যাহারে সঁপে দেহ
সে নাকি তাহার কাটে শির।
করিয়া হারামখুরি পশিয়া আমার পুরী
রাজ্যে চুরী নাকে দিব তির॥
মনেতে আগুণ জ্বলে পুনঃ পুনঃ কটু বলে
শান্তি নহে আরো ক্রোধ বাড়ে।
বিষম বিষয়ে মত্ত না লও বিদ্যার তত্ত্ব
সবংশে গাড়িব এক গাড়ে॥
সুরাপানে রাগরঙ্গে থাক বারবধূসঙ্গে
অধর্ম্মে একান্ত পূর্ণ দৃষ্টি।
বিশ্বাসঘাতকী বেটা হেন কায করে কেটা
এই পাপে যাবে তোর সৃষ্টি।
কোতোয়াল বিদ্যমান থরথর কাঁপে প্রাণ
ধীরে কহে কি করেছি আমি।
ক্রোধ সম্বরণ কর সকলি করিতে পার
মহারাজ অপনি ভূস্বামী॥
বিষ খেতে দেন মাতা ধন লোভে বেচে পিতা
জাতিবাদ যদি দেয় দারা।

অবিচারে রাজদণ্ড গৃহ দহে বহ্নি চণ্ড
কি আছে ইহার আর চারা॥
কিন্তু শুন মহাশয় বিচার করিতে হয়
দোষ দেখে এক গাড়ে গাড়।
যদ্যপি না পাটী থাকে, প্রাণ লও মিছা পাকে
এ নহে বিহিত ক্রোধ ছাড়॥
আর শুন গুণধাম লইলা বিদ্যার নাম
তারে রক্ষা করি আমি সদা।
অন্তরে বিষম ভয় রাত্রে নাহি নিদ্রা হয়
সাক্ষী মাত্র কেবল শারদা॥
সতত সতর্ক থাকি দণ্ডে দশবার ডাকি
সখী কহে প্রবোধ বচন।
হুসিয়ারে আছি ভাই আমরা কি নিদ্রা যাই
সবে বিদ্যা ঘুমে অচেতন॥
পিপীড়ার নাহি সন্ধি নজরেতে হয় বন্দী
ইহাতে মনুষ্য কোন্ ছার।
তবে যদি যায় চোরে বিধাতা বিমুখ মোরে
নিতান্ত এ কর্ম্ম দেবতার॥
রাজা বলে সে যা হোক সাত দিন প্রাণ রোক
ইতিমধ্যে চোর দিবে ধরে।
ধরিয়া আনিলে চোর সম্মান করিব তোর
জায়গির দিব বহু করে॥
যো হুকুম এই বাত শিরে উঠাইয়া হাত
ঘরে যায় সংপ্রতি সুসার।

পিছে দিল মহাসিল সরিবারে এক তিল
নারে হুসিয়ার হুসিয়ার ॥
সদা পুটাঞ্জলি-পাণি শ্রীকবিরঞ্জন-বাণী
বিমুক্ত কর গো মায়াপাশে।
ভবসিন্ধু পার হেতু অভয় চরণ সেতু
উমা আমা উর গো মানসে ॥

কোটালিনীর অন্তঃপুরে গমন ও রাণীর সহ কথা।

কহিল বিরূপ ভূপ দুঃখে অঙ্গ দহে।
ঘৃণা বড় ঘরে গিয়া ঘরণীকে কহে ॥
সৃষ্টিলোপ হয় প্রিয়ে কার মুখ চাও।
এইক্ষণে রাণীর নিকটে তুমি যাও ॥
বিদ্যার মন্দিরে কিবা দ্রব্য গেল চোরে।
সেই দোষে সবংশে কাটিবে রাজা মোরে ॥
শ্রুতমাত্র বিলম্ব না করে একটুক।
অমনি চলিল ত্রস্ত ভয়ে কাঁপে বুক ॥
নানা উপহারদ্রব্য সংহতি লইল।
অবিলম্বে রাণীর নিকটে উত্তরিল ॥
ভূমে লুঠি প্রণমিল করি যোড় পাণি।
পরম দুঃখিতা রাণী না কহেন বাণী ॥
সে ধারা দেখিয়া তার হৃদে জন্মে ভয়।
সকরুণে কোটাল-মহিলা তবু কয় ॥

এক নিবেদন মাতা চরণে তোমার।
কৃপা করি কহ শুনি সত্য সমাচার॥
কি দ্রব্য হইল চুরী রাজকন্যাবাসে।
জীয়ন্ত জীবনে মরা কোটাল হুতাশে॥
বিশেষ জানিলে চোর তবে ধরা যায়।
নতুবা সবংশে নষ্ট হই এই দায়॥
অধোমুখে কহে রাণী কি মোরে সুধাও।
মিলিবে সকল তত্ত্ব সেইখানে যাও॥
সে বড় দারুণ কথা বাড়া কব কি।
অভিমানে মরমে মরিয়া রয়েছি॥
পুনঃ কহে যোড় হাতে নিশিনাথদারা।
বিড়ম্বনা কর যদি তবে নাই চারা॥
অবিচারে মহা প্রাণিহত্যা বড় পাপ।
কি কারণে ঠাকুরাণি দেহ মনস্তাপ॥
দুগ্ধপোষ্য নহি এত বুঝি কত কত।
ভাল ত না শুনি মাগো বল তুমি যত॥
চোরে গেল দ্রব্য তার এত খেদ কেন।
ভাবক্রমে বুঝি কিছু অপকর্ম্ম হেন॥
রাণী বলে সেই বটে কি জিজ্ঞাস আর।
বিদ্যাবতী গর্ব্ভবতী এই সমাচার॥
কহিবার কথা একি মৃত্যু ইচ্ছা হয়।
শুনিলা এখন তুমি যাও নিজালয়॥
দশনে রসনা চাপে চমকিয়া উঠে।
বাম্য-করাঙ্গুলী তুলি দিল নাসাপুটে॥

আর কিছু না কহিল গেল নিজ বাসে।
কোতোয়াল শুনি বার্ত্তা মনে মনে হাসে॥
ভূপতিকে হেয়জ্ঞান কৈল নিশিনাথ।
রাম রাম বলি দুই কর্ণে দিল হাত॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

কোটালের ভূপতির প্রতি নিন্দা।

ভূপতি কেবল অজা যে জন লুঠিল মজা
ভেড়াইল সেই আমি চোর।
কহিতে সরম করে কল্যাব ছিনালি ধরে
গরদান লৈতে চাহে মোর॥
রাজলক্ষ্মী থাকে যার সূক্ষ্ম বিবেচনা তার
সত্যাচার প্রতাপ প্রচণ্ড।
পূর্ব্ব পুণ্যপুঞ্জ হেতু কৃপান্বিত বৃষকেতু
তেঁই ধরে শিরে ছত্রদণ্ড॥
নতুবা কি কোন রূপে এ ছার অধর্ম্ম ভূপে
কমলার কৃপাদৃষ্টি হয়।
মনেতে জন্মেছে অগ্নি সে বিদ্যা ধর্ম্মত ভগ্নী
কেমনে এমন কথা কয়॥
গ্রামের সম্বন্ধে যারে যা বলিয়া ডাকে তারে
সেই ভাব করণ কর্ত্তব্য।
এ আমি নেমকে পালা হায় হায় একি জ্বালা
রাজা বেটা বড়ত অভব্য॥

বিতুষ্টা জননী কালী খেদমত কোতোয়ালী
গালাগালী লতায় ছুতায়।
নাহি গণে আগা পিছা যার যায় খড়্গাছা
প্রথমেতে আমাকে গুতায়॥
মারিয়া করিল ক্ষীণ দেখি পাঁচ সাত দিন
চোরের নাগাল যদি পাই।
মনেতে সকল আছে দিয়া নৃপতির কাছে
অধিকার ছাড়া হয়ে যাই॥
হইল সুন্দর শিক্ষা মেগে খাব মুষ্টি ভিক্ষা
এমন সম্পদে কায নাই।
প্রসাদ বলিছে রও এ দায় খালাস হও
তবে তুমি যাও অন্য ঠাঁই॥

কোটালিনীকর্ত্তৃক ভদ্রকালীর স্তুতি।

কোটাল-কামিনী হেথা পূজে ভদ্রকালী।
করপুটে কহে মাগো একি ঠাকুরালী॥
ভাল মন্দ কভু মোর প্রভু নাহি জানে।
অপরাধ করে কেহ কেহ মরে প্রাণে॥
দয়া কর দাসে দয়াময়ি দাক্ষায়ণি।
দনুজদলনি দুর্গে দুর্গতিনাশিনি॥
ধব তব ভব কব তার গুণ কিবা।
আশুতোষ আখ্যা এক শুন মাগো শিবা॥
সদাশিব সদাশিব সমূহ বিনাশে।
কৃপানাথ নামে কষ্ট নষ্ট অনায়াসে॥

শৈলরাজপুত্রি মাগো বিশ্ববিভুদারা ॥
কৃপণতা অনুচিত নাম তব তারা ॥
তবে যদি কাতর কিঙ্করে দয়া নহে ॥
তোমারে করুণাময়ী কেন লোকে কহে ॥
তুষ্টা মহামায়া তার ঐকান্তিক ভক্তি।
ভয় নাই শ্রবণে শুনিল দৈব উক্তি ॥
অচিরে অবশ্য ধরা পড়িবেক চোর।
সে কিন্তু মনুষ্য নহে বরপুত্র মোর ॥
দেবী-অনুকূল ফুল পাইল প্রসাদ।
হাস্যযুক্তা বিধুমুখী হৃদয়ে আহ্লাদ ॥
যত্নে সেই ফুল দিল প্রাণনাথ হাতে।
ভক্তি করি কোতোয়াল রাখে নিজ মাথে ॥
প্রমদার প্রিয়বাক্যে প্রাণ পায় ধড়ে।
হুঁকে উঠে হুপ বাড়ে হুহুঙ্কার ছাড়ে ॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপামই।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

কোটালের চোর অন্বেষণে সজ্জা।

সাজে কোতোয়াল লে খঞ্জন ঢাল দো আঁখিয়া লাল
সোবাণ পতঙ্গ চড়ে গজতুঙ্গ ঘুমাওত অঙ্গ
সেতাব করি।
যোযায়ত সাত তুঝে দেওমে হাত কহে মিঠি বাত
পিছে হোক আও কোহি মত যাও মোর সের খাও
হো পাঁও পরি ॥

দেখো এহি যাও ওঁহি চোর পাও মেনে গারি গাও
কহে মুঝে ভূপ সো বাত সরূপ আবি রহ চুপ
জি এক ঘরি।
চলে কেত্তে ঠাট হাঁকে কাট কাট ভরে পুর বাট
খেলাওব যোহি লই ধূলি তৌঁহি পড়ে সোকাঁহি
হাম চোর ধরি॥
হো ফৌজ হাজার জাপাএটে বাজার লোক হোয়ে লাচার
ফুকারে দোহাই কাহে লুট ভাই হুজুরমে যাই
ক্যাকিয়া হোঁ চুরী।
কহি কহে আঁট ইসে আগু হাঁট মুড়ায়ে গা
হারাম কি হাড় আভি ফাড় মারো উস্কা
দোহাই তেরি॥
কহে কবি রাম হোঁ পামর হাম তারা তোরে নাম
পড়া হোঁ লাচার ওহি পদ সার মুঝে কর পার
গমন কো ডরি॥

চোর ধরণার্থ কোটালের দৌরাত্ম্য।

চোর হেতু ঘরে ঘরে বিষম বেদাতি করে
বিদেশীকে বেন্ধে মারে কোড়া।
যাহার বাটীতে থাকে ইটে খাড়া করে তাকে
কোটালিয়া বিনষ্টের গোড়া॥
স্তব্ধ হয় সব লোক দিবারাত্রি ভাবে শোক
উৎপাতের সীমা কিছু নাই।

শিষ্ট লোক যত ছিল আগে আগে পলাইল
দূরাদূরে গেল ঠাঁই ঠাঁই॥
গাদাও সহর তায় কত লোক আইসে যায়
সদা দেখা পথিকের সাতে।
ফাটকেতে রাখে বন্দী কে বুঝে তাহার ফন্দী
সাবল তাওইয়্যা দেয় হাতে॥
মেগে খায় যারা যারা তা সবার অন্ন মারা
ভয়ে কেহ সহরে না ঢোকে।
পড্যা পড্যা থাকে মাঠে কত বা নদীর ঘাটে
তল্লসারা মাছি পড়ে মুখে॥
নিশিতে প্রহর বাজে তার পর কেহ কাযে
দুই চারি দণ্ড যদি থাকে।
সে যেন প্রকৃত চোর দুঃখের না থাকে ওর
সারা রাত্রি হাড্যা ঠুক্যা রাখে॥
যে বেটারা ছেঁচা বোঁচা বড় বড় লম্বা কোঁচা
হয় কোটালের হরকরা।
বুকে টোকা দিয়া কয় বসে থাক মহাশয়
একে দিনে যাবে চোর ধরা॥
হর্ষযুক্ত কোতোয়াল মাথায় জড়ায় শাল
পিট ঠুক্যা কহে ভাই রহ॥
চোর ল্যানে সকো যব আর ভি ইলাম তব
দেওঙ্গা ফেকের এক্কা কহ॥
হজুরে নালিশ রোজ রাজা ভাবে বুঝি খোজ
কোনরূপে পেয়েছে বাঘাই।

নতুবা কি এত জোর হামেসা হাঙ্গামা সোর
তথা কারু কথা লাগে নাই ॥
এথা চোরচূড়ামণি দণ্ড-কমণ্ডলু-পাণি
কখন বা ব্রহ্মচারি-বেশ।
অবধৌত কোন দিন আসন শার্দ্দূলাজিন
দীপ্যমান দ্বিতীয় দিনেশ ॥
কোতোয়াল করপুটে স্তব করে সন্নিকটে
নিজ দুঃখে বিশেষ রোদন।
পুরীসুদ্ধ হই নষ্ট আশীর্ব্বাদ কর কষ্ট
দূর হউক রহুক জীবন ॥
হাসি কহে গুণনিধি অচিরে তোমাকে বিধি
অবশ্য হবেন অনুকূল।
বাক্য মিথ্যা নহে মোর ধরা পড়িবেক চোর
ভয় নাই হের ধর ফুল ॥
পুলকিত নিশীশ্বর ফুল নিল পাতি কর
পুনরপি প্রণিপাত করে।
কালীপাদপদ্ম ভাবি রচিল প্রসাদকবি
কোটাল চলিল স্থানান্তরে ॥

চরসমূহের ছদ্মবেশে চোর অন্বেষণ।

কূটবুদ্ধি কোতোয়াল তঞ্চ করে নানা।
ঠাঁই ঠাঁই বসাইল মজবুত থানা ॥
বিড়া উঠাইল পাঁচশত হরকরা।
বুক ঠুক্যা কহে চোর জানা গেল ধরা ॥

কত পাটনির ঠাটে খেয়া দেয় ঘাটে।
কত বা দানির ছলে দান সাধে মাটে॥
দশ বিশ জনে ধরে ব্রজবাসি-বেশ।
কত সবচুল কত মুড়াইল কেশ॥
কটিতে কৌপীনমাত্র তাহাতে গিরস।
সদা করে কেবল ভক্ষণ নামরস॥
গৌড়রাজ্যে গোঁড়াগুলা চলে যে যে ঠাটে।
সেরূপে ভ্রময়ে কত হাটে ঘাটে মাটে॥
খাসা চীরা বহির্ব্বাস রাঙ্গা চিরা মাথে।
চিকণ গুধড়ী গায় বাঁকা কোঁৎকা হাতে॥
মুঞ্জ-গুঞ্জ-ছড়া গলে ঠাঁই ঠাঁই ছাব।
দুই ভাই ভজে তারা সৃষ্টিছাড়া ভাব॥
পৃষ্ঠদেশে গ্রন্থ ঝোলে খান সাত আট।
ভেকা লোকে ভুলাইতে ভাল জানে ঠাট॥
এক এক জনার ধুমড়ী দুটি দুটি।
দুই চক্ষু লাল গাঁজা ধুনিবার কুটী॥
ভুগলামি ভাবে ভাব জন্মে থেকে থেকে।
বীরভদ্র অদ্বৈত বিষম উঠে ডেকে॥
সে রসে রসিক নবশাক লোক যত।
উঠে ছুটে পায় পড়ে করে দণ্ডবত॥
সমাদরে কেহ নিয়া যায় নিজ বাড়ী।
ভালমতে সেবা চাই পড়ে তাড়াতাড়ি॥
গোষ্টীসুদ্ধ খাড়া থাকে বাবাজির কাছে।
মনে মনে ভয় অপরাধী হয় পাছে॥

নানা রস ভুঞ্জায় শোয়ায় দিব্য খাটে।
শেষে মেয়ে পুরুষেতে পত্রশেষ চাটে॥
বৈষ্ণববন্দনা গ্রন্থ সকলে পড়ায়।
ছত্রিশ আশ্রমং নিয়া একত্র জড়ায়॥
কেমন কলির কর্ম্ম কব আর কি।
মজাইল গৃহস্থের কত বহু ঝী॥
শতাবধি জনে হয় খাসা রামানন্দী।
অঙ্গ সঙ্গোপনে তারা ভাল জানে সন্ধি॥
পাঁচ হাতিয়ার বান্ধা বিষম দুরন্ত।
জনেক তাহার মধ্যে প্রাচীন মহান্ত॥
দেবল দেখিলে যেন পায় ভক্ষ লাড়ু।
ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়া কেড়ে লয় গাড়ু॥
মার পিটে ধূমধাম করয়ে লহর।
ভয় নাই লুট্যা খায় রাজার সহর॥
কেহ বা বিষম বাঁকা জালালি ফকীর।
কাঁকালে কুঠার গাঁথা পায়েতে জিঞ্জির॥
বাঁ হাতে লোহার খাড়ু শিরে পাগ কালা।
কান্ধে ঝুলী গলে কত তর তর মালা॥
যার বাটী যায় তার নাকে আনে দম।
কয়েফেতে চুরচুর নদারদ গম॥
কত অবধৌত কত যতি ব্রহ্মচারী।
হাজারে হাজারে ফিরে নানা ভেকধারী॥
হেকমতে কতগুলা হইল কাঙ্গালি।
মরা পারা পড়্যা পড়্যা থাকে গলী গলী॥

লোকে জিজ্ঞাসিলে কেহ নাহি কাড়ে রা।
দুই চক্ষু বুজে থেকে থেকে করে হা॥
মেয়ে হরকরা গৃহস্থের ঘরে ঘরে।
চোর অন্বেষণ করে কত মায়া ধরে॥
নিদ্রা নাহি যায় লোক কোটালের ডরে।
খেতে শুতে শান্তি নাই কখন কি করে॥
সন্ধ্যার সময় বড় পড়ে তাড়াতাড়ি।
রজনীতে কেহ নাহি যায় কারু বাড়ী॥
পূর্ব্বমত গানবাদ্য নাহি রাগরঙ্গ।
মহাভয়যুক্ত লোক সদা রঙ্গ ভঙ্গ॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপামই।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

বিদু ব্রাহ্মণীর বৃত্তান্ত।

না মিলে চোরের তত্ত্ব গেল পঞ্চদিন।
ভয়যুক্ত কোতোয়াল বদন মলিন॥
হীরা রায় নামে এক কোটালের খুড়া।
বয়স বিস্তর বড় বুদ্ধিমান্ বুড়া॥
কহে বাপু কেন হাপু গণ যুক্তি আছে।
সঙ্গোপনে যাও বিদু ব্রাহ্মণীর কাছে॥
তাহার অসাধ্য কর্ম্ম ভূমণ্ডলে নাই।
অবশ্য চোরের তত্ত্ব পাবে তার ঠাঁই॥
এ কথা শুনিয়া কোতোয়াল কুতূহলী।
শিরে বন্দে প্রযত্নে পিতৃব্যপদধূলি॥

চলিল বাঘাই একা মধ্যাহ্নসময়।
উপনীত সেই বিদুব্রাহ্মণী-নিলয়॥
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলি রহে।
বৈস বাপু বিদু মৃদু হেসে হেসে কহে॥
কোন্ ঘাটে মুখ আজি ধুয়েছিনু মুই।
বৌও বেটা বুঝেছি নিষ্ঠুর বড় তুই॥
ভাগ্যধর হবে বাপু কুড়ায়েছি ফুল।
সুবচণ্ডী পূজে কত ছিঁড়িয়াছি চুল॥
পঞ্চম বৎসরে তোর মা মরে যখন।
মৃত্যুকালে হাতে হাতে সুঁপেছে তখন॥
এবে বাছা ঠাকুরালী দেশের ঠাকুর।
আমি সেই ভাব ভাবি তুমি সে নিষ্ঠুর॥
কোতোয়াল কহে মাসি মিছা কথা থো।
বিপাকে পড়িয়া তোর মরে বহীন-পো॥
শুনিয়া থাকিবে গো বিদ্যার সমাচার।
এ ঘোর সঙ্কটে মোকে করহ নিস্তার॥
তোমা বই গতি নাই পৃথিবীতে মোর।
পূজিব চরণ দুটি যদি পাই চোর॥
বিদু বলে হাসি হাসি এত বড় দায়।
আজি যাও কালি চোর মিলিবে তোমায়॥
বাহু তুলি কুতূহলী নাচে নিশিনাথে।
আকাশের চাঁদ যেন পায় নিজ হাতে॥
কোটাল চলিয়া গেল আপনার ঘর।
বিদু যায় বিদ্যা বিনোদিনীর গোচর॥

প্রণাম করিয়া বিদ্যা বসিতে বলিল ।
ব্রীড়ায় বদনবিধু বসনে ঝাঁপিল ॥
কৌতুকে কপট কথা কহে বিদ্যু হাসি ।
শুনেছি সকল তত্ত্ব শুন গো রূপসি ॥
চিন্তা কি গো চন্দ্রমুখি চুপ করে রও ।
কিবা লাজ কার কায তার নাম লও ॥
তার হাতে ঔষধ খাইয়া শীঘ্রগতি ।
যাবে গো উৎপাত গর্ব্ভপাত হবে সতি ॥
একান্ত চিহ্নিত বটি শঙ্কা নাহি মাত্র ।
তুমি গুণবতী দেখি সে কেমন পাত্র ॥
কোটালের জানিত এ বুঝি বিনোদিনী ।
সখীগণ প্রতি কহে বড় আপ্ত ইনি ॥
ইহাঁর গুণের কথা কহা নাহি যায় ।
পুরস্কার দেও সখি মনে যেবা চায় ॥
ইঙ্গিত পাইয়া উঠে ঊষা নামে আলি ।
এক গালে চূণ দিল আর গালে কালী ॥
ঠেসে ধর্যা ঠোনা মারে ঠগিনী বলিয়া ।
ঘন ঘন মুখ ঘসে মাটিতে ফেলিয়া ॥
কেবল ব্রাহ্মণী হেতু জীবন রহিল ।
ঢেকা মেরে বাড়ীর বাহির করে দিল ॥
হাঁইফাঁই করে দুই চক্ষে পড়ে জল ।
মনে ভাবে অসৎকর্ম্মে বিপরীত ফল ॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপামই ।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

বিদুর নিকটে কোটালের নিরাশ্বাসে মাধাইর হিতোপদেশ।

অৰ্দ্ধ ক্রোশ পথ চারি দণ্ডে গেল চলি।
অমনি পড়িল শেষে মরি মরি বলি ॥
আমলিল শরীর উঠিতে শক্তি নাই।
কেন্দে কহে এত দুঃখ দিলা হে গোঁসাই ॥
প্রভাত হইল নিশা নিশানাথ আসি।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে কহে কি কর গো মাসি ॥
কোঁথায়ে কোঁথায়ে কহে আরে বাপু মরি।
অতি বৃদ্ধে পোঁদে দড়ি তার ভোগ করি ॥
স্বার্থ নাহি পরার্থে যে করে পরানিষ্ট।
দেবতা তাহারে দেন বিধিমত কষ্ট ॥
যে জাতীয় দুঃখ দিল নৃপতির ঝি।
মেয়ে জাতি পাপমুখে কব আর কি ॥
সেটে ধরে আঁটে কিল মর্ম্মে পাই পীড়া।
কর্ম্মকারে পিটে যেন বড় লোহা ভিড়া ॥
গালে গুঁতা গণে গণে গোটা বিশ গায়।
শরীরেতে সহে কত কাষ্ঠ ফেটে যায় ॥
অস্থানে গস্তানগুলা শাস্তি দিল বড়ি।
স্বস্থানে প্রস্থান ইচ্ছা শক্তি নাই নড়ি ॥
বিদুবাক্যে বিস্তর হাসিল নিশানাথ।
ক্ষমা কর মাসি বল্যে ধরে দুটি হাত ॥
বস্ত্র দিল একখানি টাকা দিল দুটি।
বিদায় মাগিল কিন্তু লাগে ছটফটী ॥

কেন্দে কহে কি কর মা কৃপাময়ি কালি।
আজ্ঞা তব বৃথা হয় একি ঠাকুরালি॥
যদ্যপি না মিলে চোর রাজা প্রাণ লবে।
দুর্গতিনাশিনী দুর্গা নাম কেন তবে॥
ছয় দিন গেল কালি কালি সপ্ত দিবা।
মরণ নিকটে মাগো বাড়া কব কিবা॥
চিন্তাযুক্ত বৃক্ষতলে বসিল বাঘাই।
করপুটে কহে কিছু তার ছোট ভাই॥
বুদ্ধির সাগর তুমি বট মহাশয়।
বিপদে বিশিষ্ট লোক বুদ্ধিহারা হয়॥
ভার্য্যাবাক্যে ভগবান্ ভুলিলা আপনি।
কনককুরঙ্গ পাছে গেলা রঘুমণি॥
নল হেন মহারাজ বিপদে পড়িয়া।
ঘোর বনে পলাইলা ঘরণী ছাড়িয়া॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির হৈয়া বুদ্ধিহারা।
পাশায় করিলা পণ আপনার দারা॥
যত বুদ্ধি পাও দাদা মনে নাহি ধরে।
সবে মেলি যাই চল রাজকন্যা-ঘরে॥
সিন্দূরে মণ্ডিত কর রাজকন্যা-গৃহ।
নিতান্ত মিলিবে চোর নাহিক সন্দেহ॥
কুতূহলে কোতোয়াল কোলে করে ভাই।
ভাল কথা বলেছিস্ ভাইরে মাধাই॥
অনুমতি হেতু কোতোয়াল কহে ভূপে।
রাজা বলে ভাল চোর ধর কোনরূপে॥

ধরাতলে ধন্য সে কৃষ্ণচন্দ্র গ্রাম।
তত্র মধ্যে সিদ্ধপীঠ বামকুণ্ড নাম॥
শ্রীমণ্ডপ জাগ্রত শৈলেশপুত্রী যথা।
নিশাকালে চরিতার্থ শ্রীরঞ্জন তথা॥
কিঞ্চিৎ তিষ্টিলে ফলাপেক্ষা ছিল কিবা।
ক্ষীণ পুণ্য দেখি বিড়ম্বনা কৈলা শিবা॥
শ্রীমতী পরমেশ্বরী সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সুতা।
শ্রীকবিরঞ্জনে ভণে কবিতা অদ্ভুতা॥

চোর ধরণার্থ বিদ্যার মন্দিরে সিন্দূর লেপন।

তখনি পঞ্চাশ দোণ আনিল সিন্দূর।
পাঁচ সাত জন গেল রাজকন্যা-পুর॥
কোটালে সম্মুখে দেখি চমকিত রামা।
সখীসঙ্গে স্থানান্তরে গেলা গুণধামা॥
কূটবুদ্ধি কোতোয়াল কত জানে ফন্দী।
সিন্দূরে মণ্ডিত কৈল না রাখিল সন্ধি॥
খট্টাদি যতেক ছিল বিচিত্র ভূষণ।
সিন্দূরে মাখিয়া রাখে রজনী-রাজন॥
মুহূর্ত্তেকে পুনরপি হইল বাহির।
বন্ধুবর্গ সঙ্গে রঙ্গে যুক্তি করে স্থির॥
বাপীতটে রজকে যথায় বস্ত্র কাচে।
অলক্ষিতে অনুচর রাখে তার কাছে॥

কোতোয়াল গেল জানি বিদ্যা বিধুমুখী।
প্রবেশিলা নিজ গৃহে সঙ্গে যত সখী॥
গৃহ খট্টা যাবদীয় বিচিত্র বসন।
সকলি সিন্দূরমাখা উচাটিন মন॥
কিবা তঙ্ক করে গেল কাল কোতোয়াল।
প্রাণনাথ লৈয়ে পাছে ঘটায় জঞ্জাল॥
ছিলা হর্ষ হরিণাক্ষী হুতাশে শুকায়।
কি আছে কপালে মোর কহা নাহি যায়॥
ভাবিতে চিন্তিতে গেল নিশি অর্দ্ধযাম।
হেনকালে উপস্থিত কবি গুণধাম॥
ভার্য্যাকে ভাবিতা দেখি ভয় পেয়ে মনে।
যতনে জিজ্ঞাসে কবি মধুর বচনে॥
কহ লো কমল মুখি কি নিমিত্ত হেন।
পেয়েছ পরমপীড়া প্রায় বুঝি যেন॥
বিদ্যা বলে প্রাণনাথ খেলে মোর মাথা।
কে কহিল তোমাকে আসিতে আজি হেথা॥
কি তঙ্ক করিয়া গেল কোটাল চতুর।
সকল গৃহেতে হেদে দেখনা সিন্দূর॥
অকস্মাৎ কান্দে প্রাণ নাচে বাম্য আঁখি।
পড়িবে প্রমাদ প্রভু এই তার সাক্ষী॥
হেসে কহে কবি হরি এ জন্যে ভাবনা।
কোন চিন্তা নাহি শুন কুরঙ্গনয়না॥
সহস্র বৎসর যদি ভ্রমে নিশানাথ।
তথাচ কদাচ তার নাহি হব হাত॥

রমণী লইয়া সুখে বঞ্চিলা রজনী।
উষাকালে উঠে গেলা কবিশিরোমণি॥
বসনে সিন্দূরমাখা দেখি কবিবর।
হীরা প্রতি কহে মাসি এক কর্ম্ম কর॥
নিশিযোগে বস্ত্রখানা দিও ধোপা-বাড়ী।
সংগোপনে কাচে যেন দুনা দিব কড়ি॥
এত বলি স্বীয় কর্ম্মে চলিলা সুন্দর।
সন্ধ্যাকালে যায় হীরা রজকের ঘর॥
চুপে চুপে কহে কথা বিরলে ডাকিয়া।
গুপ্তে একখানি বস্ত্র দিবে হে কাচিয়া॥
অন্য ঠাই যে পাও দ্বিগুণ দিব আমি।
প্রকাশ না হয় যেন বুদ্ধিমান্ তুমি॥
ভাল ভাল বলিয়া রজক দিল সায়।
হেসে হেসে হীরাবতী হাত নেড়ে যায়॥
ধন্য দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে।
আমি কি অধম এত বৈমুখ আমারে॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব।
কহিবার কথা নয় বিশেষ কি কব॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

সুন্দরের সুড়ঙ্গপথে পলায়ন।

প্রভাতে রজক গেল সরোবর-তীর।
আগে ভাগে সেই বস্ত্র করিল বাহির॥

কোটালের অনুচর আছিল নিকটে।
সিন্দূরের চিহ্নে বুঝে চোরের এ বটে॥
দৌড়ে যেয়ে ঘাড় ধরে দেয় পাকনাড়া।
তখনি কাপড় দিয়া বান্ধে পিঠমোড়া॥
ঢেকাইয়া নিল যথা কোতোয়াল আছে।
সিন্দূরে চিহ্নিত বস্ত্র ফেল্যে দিল কাছে॥
কোপে কোতোয়াল কহে মুখে লাগে থুবী।
কাঁহা চোর সেভাব বাতাওগে বে ধুবী॥
কোই কহে সাহেব জি রহো এক সাত।
হকীকৃত বুঝা জাগা কহনে দেও বাত॥
করপুটে সম্মুখে রজক কহে বাণী।
কার বস্ত্র ভালমন্দ আমি তো না জানি॥
কালি রাত্রি মোর বাড়ী এসেছিল হীরা।
বস্ত্র দিয়া বিস্তর দিলেক মাথা কিরা॥
যে পাও দ্বিগুণ তার পাবা মোর ঠাঁই।
লুকায়ে কাচিবা যেন কেহ দেখে নাই॥
ইহা বই আমি নাহি জানি মহাশয়।
অবিচারে নষ্ট কর উপযুক্ত নয়॥
বাত এস্‌কা এহি হ্যায় চল ওস্‌কা পাশ।
বে তক্সির বেচারা কো দেওজী খালাস॥
ওকে নিয়া মাথায় বান্ধিয়া দিল চিরা।
যাও শীঘ্র কি জানি পলায় পাছে হীরা॥
কালান্তক যম যেন করি-পৃষ্ঠে উঠে।
মুখপানে তাকাইতে গায়ে ঘর্ম্ম ছুটে॥

লেঙ্গা তরোবার হাতে রাঙ্গা দুটি আঁখি।
কাঁহা হীরা হীরা ডাকে করে হাঁকাহাঁকি॥
সরদার গেল যদি তবে থাকে কে।
ঝাঁটায়ে চলিল পাছে বাকি ছিল যে॥
ঘোড়া উড়াইল বেগে সোয়ার হাজার।
কাঁপে মাটী ডাকে হাঁকে রাজার বাজার॥
ঘোরঘটা ঘেরে ঘরবাড়ী মালিনীর।
ডেকো হেঁকে হীরা বুড়ী হইল বাহির॥
হীরাবতী সম্মুখে কোটাল কোপে জ্বলে।
অগ্নিতে ফেলিলে ঘৃত যেমন উথলে॥
কেঁওরে হারামজাদী এহি কাম তেরা।
সাত রোজ ফাক্কা লবেজান হুয়া মেরা॥
কাঁহাসে লেয়াও চোর কৌন জাতি ওহি।
কহ তুঝে কেত্তা মালিয়াৎ দিয়া সোহি॥
খেলাপ কহগী বাত শের মোড়াওঙ্গা।
গাদ্ধামে চড়াওকে হিমাইত তোড়ঙ্গা॥
কোটালের কটুবাক্যে কুপিল অধীরা।
ভয় নাহি চোটপাট কথা কহে হীরা॥
এই সি রাঁড় নহি হোঁ দাবায় জাওগে।
বেহেসাব কহগে তব্ সাজাই পাওগে॥
মুসামালো খুব নাহি কর বের বের।
রাজা কি সহরমে বেটা তেঁই হুয়া সের॥
কোতোয়াল কহে খান্দী তওভি কর্তি সোর।
ঝুট নাহি কহো মেই তেরে ঘরমে চোর॥

হাত নেড়ে হীরা বলে থাক মেনে থাক।
বুঝা গেল আর মেনে বাড়া কথা রাখ॥
আমি ঘরে চোর পুষি কহগে রাজারে।
ওরে বেটা ঠেটা এটা কহে কেটা মোরে॥
লাফ দিয়া কোতোয়াল চুলে ধরে তার।
দেখ্‌তো হারামজাদী এ কাপড়া কার॥
মজাইতে কুল ফুল যোগাইতে নিত্য।
এ কলঙ্ক রহিল যাবৎ চন্দ্রাদিত্য॥
নির্ম্মল রাজার কুলে তুই দিলি কালী।
আরো করো আঁটুান কুটনী মাগী শালী॥
পয়জার চট চট কিল গুম গুম।
আঁকপাঁক ঘুরাইল আর কোথা ঘুম॥
মারণের চোটে বটে ভয়ে ভূত ছাড়ে।
বুকে হাঁটু দিয়া ঠেঙ্গ তুল্যে বান্ধে ঘাড়ে॥
তখনি কাঁন্দিয়া কহে ভাইরে বাঘাই।
নারীহত্যা করিওনা জল দেও খাই॥
কাতর দেখিয়া তার বন্ধন খুলিল।
হাসিয়া কোটাল তায়ে ধরিয়া তুলিল॥
রাখিল নজরবন্দী সোয়ার হাওয়ালে।
কই চোর চোর বলি চৌদিকে নেহালে॥
ফুলের বাগান ভেঙ্গে তচনচ করে।
নেজা হাতে কোতোয়াল ঢুকে তার ঘরে॥
সুন্দর সানন্দে জপে মহাকালী মন্ত্র।
কোন কিছু নাহি জানে কোটালের তন্ত্র॥

ওই চোর চোর করি ধরিতে চলিল।
ধ্যান ভঙ্গ কাঁপে অঙ্গ সুড়ঙ্গে পশিল॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসী পুত্র হই॥

চোর ধরণার্থ কোটালের সুড়ঙ্গ খনন।

অনিমিখে নিরখে বিবর নিশানাথ।
অদ্ভুত মানিয়া চিত্তে নাকে দেয় হাত॥
কেহ বলে এই চোর নাগলোকে থাকে।
কেহ বলে তবে ধরা না গেল ইহাকে॥
ঈষৎ হাসিয়া কহে কোটাল বাঘাই।
আমি যাহা বলি তাহা শুনহ সবাই॥
এই পথে আসে যায় বিদ্যার নিকটে।
সায় দেয় সবাই স্বরূপ কথা বটে॥
দেউড়ি জানিয়া কেহ প্রবেশে বিবরে।
হাত পাঁচ সাত গিয়া হাঁপাইয়া মরে॥
আকুরে হুকুরে পুনঃ উপরে উঠিল।
বাপু বাপু এখনি পরাণ গিয়াছিল॥
যে পার সে যাও ভাই খাও জায়গীর।
বিদ্যার মন্দির নহে চোরের মন্দির॥
খন্দক খনিতে করে কোটাল হুকুম।
সহরে পড়িল বড় বেগারের ধুম॥
যারে পায় তারে ধরে গালে মারে চড়।
পলাবে বলিয়া রাখে কাড়িয়া কাপড়॥

তখনি হাজার তিন আনিল কোদালি।
মজুরের নিষাবানা পাঁচ শত ঢালী॥
খোষ তত্ত্ব কোতোয়াল ঘন ঘন ডঙ্কা।
নগরনিবাসী লোক পায় বড় শঙ্কা॥
কেহ বলে ধরা গেল কেহ বলে মিছা।
কেহ বলে কে ভাই উহার করে পিছা॥
সহরে গুজব উঠে একে একশত।
গল্প ঝাড়ে বড়ই আঠারমেসে যত॥
দরজায় বস্যে কেহ মণ্ডলের ঠাট।
পথের মানুষ ডেকে লাগাইছে হাট॥
এক শরা ভরা টিকা হুঁকা চলে দুটা।
পোয়া দেড় গুড়াকু তামাকু ঢেঁকি-কুটা॥
হেসে কহে তোমরা শুনেছ ভাই আর।
শুনিলাম এখনি আশ্চর্য্য সমাচার॥
হাতকাটা একটা মানুষ গেল কয়ে।
চোরের সহিত নাকি ছিল দুটা মেয়ে॥
পরম রূপসী তারা স্বর্গবিদ্যাধরী।
বিপুল নিতম্ব হরিণাক্ষী কৃশোদরী॥
চোর কাটা গেল যদি কোটালের হাতে।
সেই ক্ষণে তারা পুড়ে মৈল তার সাতে॥
এথায় খন্দক খনে মজুর সকল।
বড় বড় গৃহস্থের বাড়ী গেল তল॥
সীমা মুড়া পর্য্যন্ত কাটিল খাই যদি।
দেখিয়া ডরায় লোক যেন এক নদী॥

অতি পুরাতন লোক গ্রামে ছিল যারা।
শুনি নাহি জন্মে কভু হেন কহে তারা॥
কতকাল খন্দক খুদিল দিবা রেতে।
কেহ বলে কুমার কুমার হবে জেতে॥
জ্ঞানী কহে থাকিবেক গূঢ় কিছু মর্ম্ম।
মনে নাহি বুঝি ইহা সামান্যের কর্ম্ম॥
পরম পুরুষ সেই চোররূপে ছলে।
দেবকন্যা বিদ্যাবতী শাপে ধরাতলে॥
কেহ কহে মিথ্যা নহে সত্য বটে ভাই।
এখনি সভার কাছে কয়েছে বাঘাই॥
চকিতে দেখেছে চোর বলেছে সমস্ত।
সুড়ঙ্গে পাশিল যেন সূর্য্য গেল অস্ত॥
প্রথমে যে দেখিল সে কহে শুন এই।
ইহাতে কে কহিবে সামান্য ব্যক্তি সেই॥
কেহ কহে সে যে হোক এ বড় লহর।
খন্দক খনিতে গেল চৌঠাই সহর॥
কেহ কহে এত দিনে গেল মেনে ভয়।
কেহ কহে দেখ ভাই আরো কিবা হয়॥
ওথা কবি উপনীত প্রমদার পাশে।
বিমল কমল মুখ মলিন হুতাসে॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে বালা স্থির হও।
ভয় কি ভবানী বাণী বদনেতে কও।

বিদ্যা বাক্যে সুন্দরের নারিবেশ ধারণ।

নিরখিয়া পতি সতী অতি দুঃখযুতা।
সজলনয়নে কহে বীরসিংহসুতা॥
অমনি কোটাল আসি দেখিবে তোমারে।
রমণী নিমিত্তে কিছু না কবে আমাকে॥
ধরিবে মারিবে প্রাণ একান্ত ভূপাল।
পশ্চাতে উপায় নাহি গর্ব্বে মোর কাল॥
তুমি নষ্ট হবে নষ্ট জন্ম অভাগীর।
বিজ্ঞ বট প্রভু বিবেচিয়া কর স্থির॥
এক নিবেদন করি অবধান কর।
দোষ নাহি প্রভু তুমি নারিবেশ ধর॥
আপনি ঈশ্বর ধরি মোহিনীর বেশ।
ভুলাইল কামরিপু ঠাকুর মহেশ॥
ভীম পরাক্রম ভীম শমন দোসর।
নারীবেশে বধিলা কীচক বীরবর॥
সূর্য্যবংশে জন্মে দশরথ নামে ভূপ।
বিপদ সময়ে রাজা ধরে নারীরূপ॥
জাতি প্রাণ হেতু লোক তঞ্চ করে নানা।
পরিণামদর্শী যেবা কি তার যন্ত্রণা॥
সধর্ম্মিণী বাক্য শুনি সায় দিলা রায়।
সুন্দরী সমুহ সুখে সুন্দরে সাজায়॥
আঁচড়ে চিরুণে চারু চাঁচর চিকুর।
ললাটে সিন্দুর শোভা তম করে দুর॥

সহজে সুন্দর মুখ বিনির্ম্মল ইন্দু ।
চন্দ্র মধ্যে চন্দ্রদীপ্ত সুচন্দন বিন্দু ॥
দশন মুকতাবলি ওষ্ঠ বিম্বফল ।
শতনরী হার গলে শ্রবণে কুণ্ডল ॥
চঞ্চল নয়ন কোণে কত কামশর ।
বস্ত্রাবৃত দাড়িম্ব যুগল পয়োধর ॥
ভূষণে ভূষিত তনু যেখানে যা সাজে ।
হেরি রূপ রূপবতী নতমুখ লাজে ॥
সুন্দরী বলিয়া বড় ছিল অভিমান ।
সুন্দর সুন্দর রূপে গেল সেই ভান ॥
বসনে ঢাকিয়া মুখ কহে সহচরী ।
কাহার রমণী গো নিছুনি লয়ে মরি ॥
নিশিযোগে যদ্যপি পুরুষ করে বিধি ।
বুক ছাড়া কে করে এ হেন রসনিধি ॥
কহে হাসি গুণরাশি সত্য বটে সই ।
ইচ্ছা হয় কিছুকাল এই দেশে রই ॥
বাঘাই কোটাল উপস্থিত হেন কালে ।
সসৈন্য ঘেরিল পুরী চৌদিক নেহালে ॥
সকলি রমণী ঘটা পুরুষ না দেখে ॥
বুদ্ধিহারা ভাকা পারা ধূলা উড়ে মুখে ॥
সাহসে করিয়া ভর বিচারিল মনে ।
নারীরূপে আছে চোর সহচরী সনে ॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপাময়ি ।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

খন্দক লঙ্ঘন পরীক্ষা।

তক্ক করে নিশানাথ দীর্ঘে কাটে দশ হাত
 পরিসর হাত তিন সাড়ে।
করে ধরে খড়্গ ঢাল হাঁটু পাতি কোতোয়াল
 থামটি করিয়া বৈসে পাড়ে॥
ক্রোধে কহে পুনঃ পুনঃ সহচরীগণ শুন
 তোমরা সকলে হও ধীরা।
মাতিয়া যৌবন মদে রমণী দক্ষিণ পদে
 লঙ্ঘিবে যে তার বড় কিরা॥
অথবা পুরুষ যেই লঙ্ঘিবে পরীক্ষা এই
 কদাচিত বাম পদে কেহ।
সারোদ্ধার কহি আমি হইবে রৌরবগামী
 সপ্তম পুরুষ শুদ্ধ সেহ॥
কহিলাম আগে ভাগে শত ব্রহ্মহত্যা লাগে
 ধর্ম্মপথে থাকিলে মঙ্গল।
জন্মিলে মরণ আছে ভোগাভোগ হয় পাছে
 নারকির জনম বিফল॥
কোটালের কটু কথা কবি করে হেঁট মাথা
 বিচারিল ধরিল কোটাল।
পূর্ব্ব জগদম্বাদেশ কদাচ না রবে ক্লেশ
 কিন্তু দুঃখ সম্প্রতি জঞ্জাল॥
যা করেন কৃপাময়ি যাম্য পদে পার হই
 কতকাল হৈয়া রব চোর।

যদি তরি বাম পায় কোটাল সবংশে যায়
ইহা কি উচিত কর্ম্ম মোর॥
শশীমুখি শকুন্তলা সত্যবতী শশীকলা।
সর্ব্বাণী, সুশীলা সত্যভামা।
রাধিকা রুক্মিণী রমা রাজেশ্বরী রম্ভা উমা
অপর্ণা অম্বিকা উষা শ্যামা॥
দময়ন্তী যশোদা জয়া মহেশ্বরী মহামায়া
হৈমবতী হীরা হরিপ্রিয়া।
একে একে সহচরী বাম পদে গেল তরি
ও কুলেতে দাঁড়াইল গিয়া॥
যম তুল্য নিশানাথ কখন দাড়িতে হাত
কখন বা গোঁপে দেয় পাক।
সবাকার কাঁপে বুক প্রাণ করে ধুক ধুক
কখন গভীর ছাড়ে ডাক॥
সদা পুটাঞ্জলি-পাণি শ্রীকবিরঞ্জন-বাণী
বিমুক্ত কর গো মায়াপাশে।
ভবসিন্ধু পার হেতু অভয় চরণ সেতু
উমা আমা উরহ মানসে॥

সুন্দরের বামপদে খন্দক লঙ্ঘনার্থ বিদ্যার সহ কথা।

একে একে পার হয় যত সহচরী।
গদগদ কহে বিদ্যা কান্ত করে ধরি॥

শুন শুন প্রাণনাথ বাক্য সারোদ্ধার ।
বাম পদে একান্ত খন্দক হও পার ॥
ধরা গেলে কাটা যাবে নৃপতি দুর্জ্জন ।
তোমার মরণে মোর নিশ্চয় মরণ ॥
নহে শাস্ত্র সম্মত সসত্বা সহমৃতা ।
দুরাত্মা দুর্ব্বোধ বিবেচনা শূন্য পিতা ॥
অপমৃত্যু হবে তার যে করুন কালী ॥
তুমি তো পণ্ডিত প্রভু একি ঠাকুরালী ॥
পূর্ব্বাপর শ্রুত বটে রাজনীতি ধর্ম্ম ।
জাতি প্রাণ হেতু সাধু করে দুষ্টকর্ম্ম ॥
ভার্য্যা হেতু রামচন্দ্র সুগ্রীবে মিতালী ।
বধিলা নিরপরাধে বানরেশ বালী ॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির তাঁর শুন কার্য্য ।
অশ্বথামা হত বাক্যে হত্যা দ্রোণাচার্য্য ॥
সুন্দরীর কথা শুনি কবি বিচক্ষণ ।
হাসি কহে শুন ইতিহাস রামায়ণ ॥
কাল করে মুক্তি প্রশ্ন রামচন্দ্র সনে ।
কেহমাত্র সঙ্গে নাহি দোঁহে সঙ্গোপনে ॥
কহে কৃপাময় কিন্তু কর সত্য পণ ।
এথানে দেথিবা যারে করিবা বর্জ্জন ॥
কালবাক্যে কমলাক্ষ প্রতিজ্ঞা স্বীকার ।
লক্ষ্মণ ঠাকুরে দিলা রক্ষা হেতু দ্বার ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু খণ্ডান না যায় ।
দুর্ব্বাসা নামেতে মুনি মিলিলা তথায় ॥

ভক্তিযুক্ত প্রণমিলা মুনীন্দ্র চরণে।
মুনি বলে যাব শীঘ্র রাম সম্ভাষণে॥
মুনিবাক্যে মহাবীর কম্পিত শরীর।
কোনরূপে চিত্তে বিবেচনা নহে স্থির॥
যদি দ্বার ছাড়ি মুনি যান সম্ভাষণ।
শ্রীরামের আজ্ঞা তবে হইবে হেলন॥
একান্ত বিহিত নহে গমনাবরোধ।
বংশ নষ্ট হবে মুনি যদি করে ক্রোধ॥
ত্যজ্য হব যদ্যপিচ আমি যাই তথা।
সেই ভাল প্রভুকে জানাই এই কথা॥
মুনি প্রবোধিয়া গেলা রঘুনাথ কাছে।
কাল কহে প্রভু তব আজ্ঞা পূর্ব্ব আছে॥
এইক্ষণে ত্যাগ কর ঠাকুর লক্ষ্মণ।
মহা শোকাকুল চিত্ত কমললোচন॥
সত্যবন্ধ হেতু প্রভু বর্জ্জিলা লক্ষ্মণ।
সরযুর নীরে বীর ত্যজিলা জীবন॥
সৌমিত্রেয় শোকে প্রভু সম্বরিলা লীলা।
রামায়ণে মহামুনি বাল্মীক রচিলা॥
সত্য সত্য পুনঃ সত্য শুন প্রাণপ্রিয়া।
প্রাণ গেলে সল্লোকে কি করে দুষ্ট ক্রিয়া॥
সেই রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর শুন কর্ম্ম;
বকরূপে যেকালে ছলিলা তাঁরে ধর্ম্ম॥
প্রশ্ন যদি কহিলেন কুন্তীর নন্দন।
তথাপি কপটে প্রভু কহেন বচন॥

তুষ্ট হইলাম তুমি বর মাগো যাই।
যারে ইচ্ছা তাহে চাহ জীবে এক ভাই॥
ধর্ম্মবাক্য শুনি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।
পরিণামদর্শী রাজা করিলেন স্থির॥
সহদেব নাহি জীয়ে অথবা নকুল।
তবে তো নৈরাশ তাঁর মাতামহকুল॥
কিঞ্চিৎ থাকিয়া কহে সর্ব্ব গুণযুত।
বাঁচাও জনেক প্রভু ভাই মাদ্রীসুত॥
ধর্ম্মনিষ্ঠ বুঝি ধর্ম্ম দিলা সাধুবাদ।
চারি ভাই জীয়া উঠে ঘুচিল প্রমাদ॥
জমদগ্নি সুত জামদগ্ন্য মহাবীর।
জনক আজ্ঞায় কাটে জননীর শির॥
পিতৃতুষ্টে পুনরাপ পাপপুঞ্জে মুক্ত।
মিথ্যা কথা নহে মহাভারতেতে উক্ত॥
সত্যবাক্য রক্ষা পায় যদি যায় প্রাণ।
সেও ভাল পরকালে পায় পরিত্রাণ॥
সত্য হীন ধর্ম্ম হীন বৃথা জন্ম তার।
যতো ধর্ম্ম স্ততো জয় বাক্য সারোদ্ধার॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপামই।
আমি তুয়া দাস-দাস দাসীপুত্র হই॥

চোর ধরণ।

অশ্বথামা হত প্রিয়ে কহিলে বচন।
সেই পাপে নৃপতির নরক দর্শন॥

অবিচারে রঘুনাথ বালী কৈলা বধ।
ব্যাধরূপে তার শোধ লইল অঙ্গদ ॥
কর্ম্মভোগ কার খণ্ডে ধরণীমণ্ডলে।
অন্য কে কোথায় থাকে রামচন্দ্রে ফলে ॥
মম হেতু নষ্ট হবে সবংশে কোটাল।
কহ প্রিয়ে কিরূপে রহিবে পরকাল ॥
বিদ্যা কহে প্রাণনাথ যে কহ সে বটে।
কি কথা কহিবে গেলে ভূপতি নিকটে ॥
সুন্দরীর বাক্য শুনি সুন্দরের হাস।
সহজে বালিকা তুমি গণিছ হুতাশ ॥
ভবিষ্যৎ কর্ম্ম এইক্ষণে কেন ভাবি।
তখনি তেমন কব যে কহান দেবী ॥
কোন চিন্তা নাহি মত্ত-কুঞ্জর-গামিনী।
দুঃখ দূর করিবেন পুরারি কামিনী ॥
ভক্তিভাবে ভাব ভয়-রাঙ্গা ভাঙ্গা পদ।
শক্তি কার কালিকার দাসে করে বধ ॥
করাল-বদনী বলি বাড়াইল পা।
হেরি পতি রূপবতী ভয়ে কাঁপে গা ॥
দক্ষিণ চরণে তরি দাঁড়াইল পাড়ে।
ব্যাঘ্রপ্রায় কোটাল পড়িল গিয়া ঘাড়ে ॥
সুরত্ন ভূষণ যত টানি ফেলে দূরে।
কৌতুকে কোটাল নাচে সিংহনাদ পূরে ॥
কেহ বা বড়শি হানে কেহ তরোয়ার।
ঘিরিল কোটাল ঠাট নাহিক নিস্তার ॥

কেহ বলে বহু দুঃখ পেয়েছি হে ভাই।
ঘাড় ভেঙ্গে এ বেটার রক্ত আমি খাই॥
কেহ বলে লাঠীতে মাথার ভাঙ্গি খুলি।
কেহ বলে থাক তুমি আমি করি গুলী॥
কেহ বলে চোর বটে তবে কেন ছাড়।
কাকালি পর্য্যন্ত চল মৃত্তিকাতে গাড়ি॥
তীরে তীরে জয়জয় করি হে ইহারে।
পোড়াইয়া মার রাজা কি করিতে পারে॥
পটুকা খুলিয়া কোতোয়াল বান্ধে হাত।
বিদ্যা কহে ধর্ম্ম কোথা ওহে প্রাণনাথ॥
মর্ম্ম দহে স্থির নহে উঠে ডাক ছাড়ে।
বুক চিরা মাণিক্য লইল কেবা কেড়ে॥
সহচরীগণ কান্দে কুমারের হেতু।
তোমা পেয়েছিল বিদ্যা সেবি বৃষকেতু॥
পূর্ব্বের কঠোর পাপে বামদেব বাম।
হারাইল তোমা হেন রূপ গুণধাম॥
কুপিল সুন্দর মুক্ত করে নিজ করে।
ঢেকা মেরে দূরেতে ফেলিল নিশাশ্বরে॥
তখনি পরিল বস্ত্র পুরুষের ছান্দে।
চুল ছিল এলো শীঘ্র দুই করে বান্ধে।
পলাইতে পারে কবি কে রাখিতে পারে।
মনোসাধে ধরা দিল ভৎসিতে রাজারে॥
মদনমোহনরূপে সবে মোহ যায়।
অনিমেষে বাঘাই সুন্দর পানে চায়॥

কেহ বলে সামান্য মানুষ নহে চোর।
বিদ্যা বলে পরাণ-পুতলি বটে মোর॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে করি কৃতাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলালে মাতা দেহি পদধূলি॥

সুন্দরের বন্ধনে বিদ্যার খেদোক্তি।

দয়িত দুর্গতি দেখি দগ্ধ দ্বিজরাজ-মুখী
দুঃখসিন্ধু উথলিয়া উঠে।
ধরাতলে ধনী পড়ে ধীহারা ধূচয় বাড়ে
ধড়ে প্রাণ নাহি ঘর্ম্ম ছুটে॥
মণিহারা ফণি পারা জীয়ন্তে মরমে মরা
মোহযুতা মুনি মনোহরা।
নয়নে নির্গত নীর নিশায় নিম্নগাতীর
নাথার্থে পদ্মিনী যেন জরা॥
স্বপ্নে সতী স্বামী সঙ্গে সরস চাতুরী রঙ্গে
সুখে মুখে মুখ দিয়া রয়।
বিদ্যা বিনোদিনী বালা বিনোদ বকুলমালা
বিভু গলে দিতে জ্ঞান হয়॥
বিদ্যা কহে হে মা কই কি করিলা কৃপামই
কোথা যাব কি হবে উপায়।
এই যে ছিলাম সুখে একি দশা এক টুকে
আত্মহত্যা দিব গো তোমায়॥
বিষম বিরহানলে বপু বিপরীত জ্বলে
বিদগ্ধ বল্লভ দিলা আনি।

রোপিলাম প্রেমতরু   না ফলিল ফলচারু
উপাড়িলা অঙ্কুরে আপনি ॥
প্রভু পূর্ব্বে প্রাণ বলে   পশ্চাৎ পাবকে ফেলে
পলাইলা পাপে দিল মন ।
তোমার তুলনা তুমি   তরুণ তরুণী আমি
ত্যাগ কর ত্বদঙ্গজ জন ॥
জনক যমের তুল্য   জননী যাতনা মূল
জামাতা জীবনে করে বধ ।
ভাবিয়া ভরসা সার   ভুবনে না দেখি আর
ভয় ভাঙ্গা ভবানীর পদ ॥
ফাঁপরে ফেপর রূপা   ফলত কর গো কৃপা
ফিকিরে ফিরাও প্রাণনাথ ।
শ্রীকবিরঞ্জন কহে   এমত উচিত নহে
দূর কর দাসের উৎপাত ॥

কোটালের প্রতি বিদ্যার বিনয় ।

ভূতলে আছাড়ে গা   কপালে কঙ্কণ ঘা
বিন্দু বিন্দু বয়ে পড়ে রক্ত ।
তাহে শোভা চমৎকার   অশোক কিংশুক হার
গাঁথা চান্দে দিল যেন ভক্ত ॥
যথোচিত স্বামী দণ্ড   কোতোয়াল ভানুচণ্ড
প্রকৃষ্ট প্রকাশ সন্নিকটে ।
রাকা সুধাকরমুখী   ফুল্ল ইন্দিবর আঁখি
এবে কর্ম্মে ব্যক্ত সেই বটে ॥

বিদ্যা বলে প্রভু ভাল না বুঝিয়া কালাকাল
দেখ যুগ ধর্ম্ম এ সকল।
পরিণামে তব দৃষ্টি অভাগীর মজে সৃষ্টি
তার তো সাক্ষাতে এই ফল॥
হেদে হে কোটাল ভাই ভগ্নী আমি ভিক্ষা চাই
ছাড়হ আমার প্রাণনাথ।
ধর্ম্ম পথে দৃষ্টি কর বারেক বচন ধর
হের এই যোড় করি হাত॥
প্রাণ মোর নহে চোর এ তো জোর মিছা সোর
এতে তব লাভ আছে কি।
পরিত্রাণ কর প্রাণ দেহ দান রাখ মান
পুণ্যবান তুমি শুনিয়াছি॥
মম কান্ত শিষ্ট শান্ত রাজা ভ্রান্ত কি দুর্দ্দান্ত
আদ্যোপান্ত কৃতান্ত সমান।
শুন ওহে মিথ্যা নহে তনু দহে কত সহে
সৃষ্টি রহে বল হে বিধান॥
কোন্ ধর্ম্ম হেন কর্ম্ম পোড়ে মর্ম্ম গাত্র চর্ম্ম
দিয়া দিব পাদুকা চরণে।
হৃদয়েশ এই বেশ পায় ক্লেশ কৃপালেশ
কর ভাই অকাল মরণে॥
চক্ষু লাল কোতোয়াল কহে ভাল ঠাকুরাল
এই কাল জঞ্জালের মূল।
জান আমা ওগো রামা গুণধামা কর ক্ষমা
ভাব শ্যামা হইবে প্রতুল॥

তুমি সতী গুণবতী ভগবতী প্রতি মতি
সামান্য মানুষ নহে এহ।
রঘুবর হলধর পুরন্দর সুধাকর
পঞ্চশর ইতিমধ্যে কেহ॥
এত বলে বাক্য ছলে যায় চলে রামা টলে
পুনরপি পড়ে মহীতলে।
কহে রাম দুর্গানাম অর্দ্ধ যাম জপকাম
পূর্ণ হবে দেবী অনুবলে॥

চোর দৃষ্টে রাণীর বিদ্যার প্রতি বিলাপ।

শুনি লোক মুখে রাণী মনোদুঃখে
গেল বিদ্যাবতী বাসে।
নন্দিনীর পতি নিরখিয়া সতী
নয়নসলিলে ভাসে॥
অভিন্ন মদন পূর্ণেন্দু বদন
কনকচম্পক কান্তি।
এ নহে তস্কর শশী কি ভাস্কর
পামর লোকের ভ্রান্তি॥
রূপ কব কিবা চারু কম্বু গ্রীবা
শুক চঞ্চু তুল্য নাসা।
নিন্দি কুন্দ কলি শোভে দন্তাবলী
সুধাধিক মৃদুভাষা॥
আজানুলম্বিত বাহু সুললিত
করি কর দর্প হর।

ফুল্ল কোকনদ মঞ্জু যুগপদ
নাভি ভূধর বিবর ॥
বিদ্যাবতী মুখে মুখ দিয়া দুঃখে
ডুগরিয়া কান্দে রাণী।
জন্মে জন্মে পাপ হেন মনস্তাপ
ভুঞ্জিব স্বপ্নে না জানি ॥
কি বিদগ্ধ বিধি রসময় নিধি
নিরমিল তোর লাগি।
অনেক যতনে লভ্য এ রতনে
হারালি ছি ছি অভাগী ॥
আরাধিলি বিদ্যা ত্রিভুবনারাধ্যা
মহাবিদ্যা ভদ্রকালী।
পূর্ব্ব কর্ম্ম ভোগ স্বামীর বিয়োগ
যত তাঁর ঠাকুরালি ॥
কিবা কব তোরে না কহিলি মোরে
গুপ্তে কণ্ঠে দিলি মালা।
বিধির লিখন না হয় খণ্ডন
এখন কে পায় জ্বালা ॥
ভূপতি দুর্ব্বার নাহিক নিস্তার
নিতান্ত কাটিবে চোরে।
হয়ে থাক রাঁড়ী পোড়াইতে নাড়ী
এতেক দুষ্কর্ম্ম তোরে ॥
শ্রীপ্রসাদ কহে কথা মিথ্যা নহে
কালীর কিঙ্কর যেই।

তার দুঃখ কিবা সদা সঙ্গে শিবা
ভুবনবিজয়ী সেই ॥

বিদ্যার স্তবে কালীর অভয় প্রদান।

স্নান করি শুচি হয় নৃপতিনন্দিনী।
মুদ্রিত লোচনে ভাবে রূপ কাদম্বিনী ॥
কৃতাঞ্জলি কহে কৃপা কর কৃপাময়ি।
দাস তব দয়িত দুঃখিনী দাসী হই ॥
আজ্ঞা ছিল তব সে আসিবে এথা একা।
এখন এ দশা একি অদৃষ্টের লেখা ॥
ক্ষিতিপতি ক্ষুদ্র দোষে ক্ষয় করে স্বামী।
ক্ষেমঙ্করি ক্ষম দোষ ক্ষীণা দীনা আমি ॥
নিতান্ত দেখিনু দুর্গা মন্ত্র জপে যেই।
হেদে গো করুণাময়ি তার দশা এই ॥
কি কব মহিমা সীমা পদতলে ভব।
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি কটাক্ষেতে তব ॥
তপস্বিনী ত্রিনয়নে তারা ত্রাণকর্ত্রী।
যশোদা-জঠোরজাতা জায়া জগদ্ধাত্রী ॥
পার্ব্বতি পরমেশ্বরি পশুপতিদারা।
প্রভাকর পুত্র পীড়া হরা পরাৎপরা ॥
বিদেশে বল্লভ বীরসিংহ করে নষ্ট।
দনুজদলনি দেবি কেন দেও কষ্ট ॥
দৈববাণী শুনে রামা ভয় নাহি তোর।
সুন্দর সামান্য নহে বরপুত্র মোর ॥

প্রহরের পরে পুনঃ পতি পাবে সতী।
কি করিতে পারে বীরসিংহ নরপতি॥
এ কথা কহিলা যদি শঙ্কর-ঘরণী।
জলধিতরঙ্গে যেন মিলিল তরণী॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

চোর দর্শনে নাগরিকজনের খেদ।

ধরা গেল চোর সোর পড়িল নগরে।
বাল বৃদ্ধ যুবা ধায় নাহি রয় ঘরে॥
স্তনপান করে শিশু কোলে যে ধনীর।
মৃত্তিকায় ফেলি ধায় হৃদয় অস্থির॥
রন্ধনশালায় রামা রন্ধনে যে ছিল।
মাথার উপরে হাঁড়ী রাখিয়া চলিল॥
বেগে ধায় নাহি চায় পিছুপানে ফিরা।
কেহ কহে দাঁড়া লো মাথার আগে কিরা॥
এক জন প্রতি আর জন বলে কই।
সে কহে অঙ্গুলি ঠারি ওই দেখ্ ওই॥
হেরি হেরি বদন মদনে অঙ্গ দহে।
কুলবধূ চিত্রিত পুত্তলী যেন রহে॥
কেহ বলে এত রূপ নিরমিল বিধি।
হারাইল অভাগিনী বিদ্যা হেন নিধি॥
সজল নয়নযুগে কোন ধনী বলে।
আমাকে কাটুক রাজা চোরের বদলে॥

রাজা লবে প্রাণ সই কোন্ মূর্খ কহে।
সাধ্য নহে তার যার দেহে আত্মা রহে ॥
নিরখিয়া নরপতি এ রূপ বিচিত্র।
না হবে নিতান্ত রূপ বিরূপ চরিত্র ॥
আছাড়ি পাছাড়ি মহী কেন্দে কহে হীরা।
ও চাঁদ মুখের কথা শুনিব কি ফিরা ॥
পতিপুত্র হীনা দীনা শুন গুণরাশি।
কে কহিল তোমাকে কহিতে মোরে মাসী ॥
দ্বাদশ বৎসর বাছা খেয়েছি গোঁসাই।
তারপর কিছুমাত্র শোক জানি নাই ॥
মৃত্যু প্রতি কারণ হইলে তুমি মোর।
লোকে বলে হীরা মাগী রেখেছিল চোর ॥
কেন বাড়াইলে প্রেম রাজকন্যা সনে।
তোমাকে ছাড়িয়া বিদ্যা বাঁচিবে কেমনে ॥
তব মৃত্যুকথা তব শুনিলে মা বাপ।
তখনি ত্যজিবে প্রাণ পেয়ে মনস্তাপ ॥
বয়স্যতা তব যার যার সঙ্গে আছে।
ছাড়িবেক প্রাণ তারা বার্ত্তা গেলে কাছে ॥
তোমার মরণে এত লোকের মরণ।
কি জানি বিধির লিপি ললাটে কেমন ॥
দরবারে বার দিয়া বসেছে ভূপাল।
হেনকালে চোর নিয়া গেল কোতোয়াল ॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে করি পুটাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলালে মাতা দেহি পদধূলি ॥

রাজার সহ চোরের ব্যাঙ্গোক্তি।

সিংহাসনে নরসিংহ বীরসিংহ রায়।
তপ্ত তপনীয় তনু তারাপতি প্রায়॥
প্রমথেশ প্রিয়া পূজা প্রসাদ চন্দন।
ভালে বিন্দু বিধু মধ্যে বালার্ক যেমন॥
প্রচণ্ড চণ্ডার্চ্চি চয় চতুর্দ্দিকে দ্বিজ।
পুরোহিত বেষ্টিত যেমন মখভুজ॥
কিঙ্কর নিকরে করে চামর ব্যজন।
মস্তকে ধবল ছত্র কিবা সুশোভন॥
তদুপরি চন্দ্রাতপ তমঃ করে দূর।
বামভাগে মহাপাত্র পরম চতুর॥
পাঠ করে পুরাণ পাঠক নিত্য নিত্য।
যন্ত্রিগণ যন্ত্রে গান করে হরে চিত্ত॥
দুদিকে সোয়ার খাড়া বুকে ধরে ঢাল।
কারো নাহি মৃত্যুভয় যুদ্ধে যেন কাল॥
সেলাম করয়ে হাতি সম্মুখে মাহুত।
পদাতিক দুরন্ত সাক্ষাৎ যমদূত॥
চোপদার নকীব হজুরে খাড়া আছে।
বাঘাই কোটাল চোরে নিয়া গেল কাছে॥
গরীব নেওয়াজ বলি আদবে সেলাম!
নজর দৌলত এই চোর লেয়া হাম॥
ভূপতিকে প্রণিপাত করিলেন কবি।
সদত নির্ভয় দীপ্যমান যেন রবি॥

অপাঙ্গ লোচনে নিরখিয়া রূপ ভূপ।
পরমপুরুষ চিত্তে জানিলে স্বরূপ ॥
ধন্যা কন্যা অন্বেষণে মিলাইল পতি।
বররূপে কোন্ দেব ভ্রমে বসুমতি ॥
রেবতী-রমণ কিম্বা কিম্বা বৃষকেতু।
কিম্বা নারায়ণ নিজে রামরম্ভা হেতু ॥
কেমন পণ্ডিত বাপা জানা কিন্তু চাই।
রাজা বলে কাট চোরে মসানে বাধাই ॥
আঁখি ঠারে আরবার করে নিবারণ।
মিছামিছি করে কত তর্জ্জন গর্জ্জন ॥
পর্ব্বতজা পাদপদ্ম মানসে প্রণাম।
হাসি হাসি সুধাভাষা কহে গুণধাম ॥
কাট রাজা তিলার্দ্ধ না করি মৃত্যুভয়।
গোটাকত কথা কহি শুন মহাশয় ॥

অদ্যাপিতাং কনকচম্পকদাম গৌরীং
ফুল্লারবিন্দবদনাং তনুরোমরাজিং।
সুপ্তোত্থিতাং মদনবিহ্বল লালসাঙ্গীং
বিদ্যাং প্রমাদ গণিতামিব চিন্তয়ামি ॥

অদ্যাপি সা কনকচম্পকদাম তনু।
প্রফুল্ল কমলমুখী ভুরু কামধনু ॥
নিদ্রা ভঙ্গে অলসাঙ্গী মদন বিহ্বল।
চিন্তয়ামি নিরন্তর বিদ্যার কুশল ॥

কথা শুনি কাঁপে তনু কুপিত ভূপাল।
কহে মসানেতে চোরে কাটরে কোটাল॥
কবি কহে কিছুকাল থাক রে বাঘাই।
গোটাদুইচারি কথা আরো কহা চাই॥

অদ্যাপিতাং শশিমুখীং নবযৌবনাঢ্যাং
পীনস্তনীং পুনরহং যদি গৌরকান্তিং।
পশ্যামি মন্মথশরানল পীড়িতানি গাত্রাণি
সংপ্রতি করোমি সুশীতলানি॥

অদ্যাপি সে শশীমুখী সুলভ যৌবনা।
পীন পয়োধরা বাল কুরঙ্গনয়না॥
তদঙ্গ পরসে অঙ্গ সদা সুশীতল।
চিন্তয়ামি নিরন্তর বিদ্যার কুশল॥
কাট কাট শব্দ রাজা করে পুনঃ পুনঃ।
কবি কহে গোটা দুই কথা আরো শুন॥

অদ্যাপিতাং মলয়পঙ্কজ গন্ধলুব্ধ
ভ্রাম্যন্দ্বিরেফ চয়চুম্বিত গণ্ডদেশাং।
কেশাবধূত করপল্লব কঙ্কণানাং
তাং নোদপৈতি নিচয়ঃ সুরতং মদীয়ং॥

অদ্যাপি মুখারবিন্দ সুগন্ধবিশেষ।
অলিকুল ব্যাকুল চুম্বিত গণ্ডদেশ॥

কম্পিত চিকুর কর কঙ্কণ সুধ্বনি।
মন মম মোহিত স্মরতি নিতম্বিনী॥
রাজা বলে নিয়া যাও মসানে বাঘাই।
কবি কহে গোটাদুই বচন শুনাই॥"

অদ্যাপি বান গৃহতো ময়ি নীয়মানে
দুর্ব্বার ভীষণ করৈর্যমদূত কল্পৈঃ।
কিং কিং তয়া বহুবিধং ন কৃতং মদর্থে
কর্ত্তুং ন পার্য্যত ইতি ব্যথতে মনোমে॥

অদ্যাপি আমাকে বাসগৃহ হতে চর।
কেশে ধরে নিল যেন শমনকিঙ্কর॥
কি কি চেষ্টা না পাইল মদর্থে কামিনী।
কিবা কব দহে দেহ দিবসরজনী॥
অদ্যাপি সা বিদ্যা মম হৃদে বিহরতি।
নিরখি মুদিলে আঁখি বিদ্যার সুরতি॥
সুপ্ত পতি মৃতপ্রায় বাক্য নাহি মুখে।
বিপরীত কাযে বিদ্যা চড়ে তার বুকে॥
নগ্ন বিদ্যা মুক্তকেশী দন্তে কাটে জি।
নয়ন নিকটে দেখ নিবেদিব কি॥
থরথর কাঁপে ভূপ ক্রোধভাবে চায়।
রাজা বলে কাট চোরে খরখড়্গ ঘায়॥
কবি কহে কন্যা তব পরম রূপসী।
তাহার চঞ্চল দৃষ্টি খরতর অসি॥

পুনঃ পুনঃ হানে প্রাণে বক্র নিরখিয়া।
জীয়ায় যুবতী বিম্বাধরামৃত দিয়া॥
ঘূর্ণিত লোচন বীরসিংহ কহে রাগে।
এ বেটাকে ধর শীঘ্র কামানের আগে॥
কবি কহে কামান বিদ্যার যোড়া ভুরু।
সতত নিকটে ধরা বটি কল্পতরু॥
তাহাতে নয়নবাণ বিষম সন্ধান।
শশীমুখী হাসি ভস্মরাশি করে প্রাণ॥
কি জানি কিমন্ত্র জানে বিদ্যা গুণবতী।
পুনরপি প্রাণদান পাই নরপতি॥
বাক্যপীড়া মহা ব্রীড়া বীরসিংহ বলে।
এ বেটাকে ফেল নিয়া করি পদতলে॥
মনোমত্ত কুঞ্জর মাহুত্ত পুষ্পধনু।
সতত হুলায় হাতী কমলিনী অনু॥
তার তলে পড়ে রাজা প্রাণ যায় মোর।
চোর চোর বলে তুমি মিছা কর সোর॥
আপনি সাক্ষাৎ যম মৃত্যুরূপা কন্যা।
রাণী ঠাকুরাণী বুঝি এইরূপ ধন্যা॥
মৃত্যু প্রতি ভূপতি কারণ কহে যা।
বিদ্যায় ঘটায়ে কবীশ্বর কহে তা॥
রাজা বলে মিথ্যা বাক্যছলে কায নাই।
মসানে কাটহ শীঘ্র তস্কর জামাই॥
হাসি হাসি গুণরাশি সভা সাক্ষী করে।
জামাতা কহিলা সত্যবাদী নৃপবরে॥

অদ্যাপি নোজ্ঝতি হরঃ কিল কালকূটং
কূর্ম্মো বিভর্ত্তি ধরণীং নিজপৃষ্ঠকেন।
অম্ভোনিধির্ব্বহতি দুর্ব্বহ বাড়বাগ্নি
মঙ্গীকৃতং সুকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি ॥

অদ্যাপিও হলাহল নমুঞ্চতি হর।
অদ্যাপিও পৃষ্ঠে ধরা ধরে কুর্ম্মবর ॥
অদ্যাপিও বাড়বাগ্নি জলনিধি বহে।
সাধুর বচন কদাচিৎ মিথ্যা নহে ॥
রাজচক্রবর্ত্তী কিন্তু রীতি কদাচার।
লোক ভয় ধর্ম্ম ভয় না দেখি তোমার ॥
মম বীর্য্যে ভূপতি যে জন্মিবে সন্তান।
পরম দুর্ল্লভ সে দিবেক পিণ্ডদান ॥
জামাতা স্বীকার তুমি করিলে ভূপাল।
তথাপিও শাম্য নহ একি ঠাকুরাল ॥
একান্ত লজ্জিত রাজা কুমার বচনে।
অধোমুখে রহে বাক্য না সরে বদনে ॥
ভূপতির ভাব বুঝি কহে পাত্র ধীর।
দুরক্ষর বাক্য কহ নির্ভয় শরীর ॥
সত্য কথা কহ চোর থাক কোন্ গ্রাম।
কাহার তনয় কোন্ জাতি কিবা নাম ॥
দেহ পরিচয় সত্য দেহ পরিচয়।
যদি মিথ্যা কহ তবে জীবন সংশয় ॥

কহে গুণরাশি হাসি পাত্র তুমি মূঢ়।
খাও হে বাপের কলা দিয়া ঝোলা গুড় ॥
দাড়ি ভুঁড়ি সার কোন জ্ঞান নাহি মাত্র।
হবচন্দ্র রাজা যেন গবচন্দ্র পাত্র ॥
বন-পশু বুঝেছি বলিয়া দেন তুড়ি।
রাঙ্গা বট যেন সার কাঁঠালের গুঁড়ি ॥
ছয়মাস গতে কর্ম্ম সুধাও কি জাতি।
কেন না হইবে তুমি নিজে হও কাতি ॥
তব চর্য্যা চর্চ্চিলাম আলাপে ক্ষণেক।
দ্বিপাদ পশুর মধ্যে তুমি হে জনেক ॥
কদাচিৎ মিলে যদি তোমার দোসর।
চাসায় পরশ পায় ভুনা বাড়ে দর ॥
অপমানে অঙ্গ দহে অঙ্গার সমান।
সভাস্থ পণ্ডিতগণ হন হতজ্ঞান ॥
দ্বিজগণ কহে কহ রূপগুণযুত।
কোন্ কুলে জন্ম ধাম নাম কার সুত ॥
কহে গুণরাশি হাসি শুন ধীরচয়।
তোমা সবাকারে কহি নিজ পরিচয় ॥
জনম মানবকুলে শম্ভুধাম ধাম।
পিতামাতা শিবশিবা কালিদাস নাম ॥
কোনরূপে নিভ্রান্ত না পরিচয় মিলে।
কোতোয়াল সঙ্গে রাজা বসিলা বিরলে ॥
হেদে নিশানাথ সুতানাথ এই বটে।
এমন সুপাত্র বহুভাগ্য হেতু ঘটে ॥

বধ করা মত নহে দিব কন্যাদান।
কিন্তু তুমি নিয়া যাও দক্ষিণ মশান॥
কোতোয়াল কহে ভাল এই বটে যুক্তি।
কৌশলে কোটালে রাজা কহে কটু উক্তি॥
পুনঃ পুনঃ কহি যত কাটিবারে চোর।
রেয়াতি করিস্ বেটা ওকি বাপ তোর॥
ভূপতিভারতী শুনি কুপিল কোটাল।
দুই চক্ষু ঘুরায় ঘুরায় খড়্গ ঢাল॥
চল বল্যে কোতোয়াল পাছে মারে ঠেলা।
কবি কহে কৃপাময়ি কালি কোথা গেলা॥
ক্ষণমাত্র উত্তরিল দক্ষিণ মসানে।
কেহ চড় মারে কেহ চুল ধরে টানে॥
বড়শি হানিতে বুকে চাহে কেহ কেহ।
ফাঁফর হইল থরথর কাঁপে দেহ॥
মার্মার্ কাট্কাট্ করে মহাধুম।
ফাঁকি ফুঁকি সার নাই কাটিতে হুকুম॥
কিছু কাল ছিল কবি ডরেতে নীরব।
কৃতাঞ্জলি কায়মনোবাক্যে করে স্তব॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

সুন্দরের চৌত্রিশাক্ষরে কালীস্তুতি।

কৃতাঞ্জলি কহে কবি কালি কপালিনি।
কালরাত্রি কঙ্কালমালিনি কাত্যায়নি॥

কাটে কাল কোটাল কর মা প্রতিকার।
কপর্দ্দি-কামিনি কিবা করুণা তোমার ॥
খ ভবে ভ্রমহ মাগো হের হর ভয়।
খগেশবাহিনি শক্তি খনিকে প্রলয় ॥
খরখড়্গ করে ধর্য্যে খলখল হাসি।
খলে বধে খেচরপালিনি রক্ষ আসি ॥
গিরিবরসুতা গৌরি গণেশ-জননি।
গগনবাসিনি বিদ্যা গিরীশ-গৃহিণি ॥
গয়া গঙ্গা গৌতমি গোমতি গোদাবরি।
গুণত্রয় গুণময়ি গোকুল শঙ্করি ॥
ঘনাঘনরূপা দেবি ঘননিনাদিনি।
ঘেরিল কোটালঘটা ঘোর শব্দ শুনি ॥
ঘৃণায় ঘরণী কিন্তু ত্যজিবেক দেহ।
ঘরে ঘরে ঘোষণা কুযশ তব এহ ॥
চামুণ্ডা চণ্ডিকা চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনি।
চতুর্দ্দলচক্রে চক্রচয়বিভেদিনি ॥
চঞ্চলচরণভরে চমকিত ফণী।
চাঁচর চিকুর চারু চুম্বিত ধরণী ॥
ছার রিপু ছলেতে নাশ গো শীঘ্র শিবা ॥
ছাওয়ালেরে ছেড়ে দেহ কর মাগো কিবা।
ছলছল চক্ষু ছাতি ফাটে গো বন্ধনে।
ছটফট করে প্রাণ ছাড়িবে কেমনে ॥
জন্মভূমি জননী জনক জনার্দ্দন।
জাহ্নবী জকারপঞ্চ দুর্ল্লভ বচন ॥

জন্মিলাম কোথায় জীবনে হেথা মরি।
জয়ঙ্করি রক্ষা কর জগতঈশ্বরি ॥
ঝিকিমিকি খড়্গা করে ঝেকে উঠে ঢালি।
ঝাটা পড়ে গায় ঝাট রক্ষা কর কালি ॥
ঝাড়া ঝাড়ে কোটালিয়া ঝাড়া লয়্যে হাতে।
ঝিমাইতে মন গো ঝঞ্ঝনা পড়ে মাথে ॥
টঙ্কার ধনুক শব্দ টোটাই মা বলে।
টল টল কাঁপে দেহ টাঙ্গী মারে গলে ॥
টিকি ধর্য্যে টানে টনটন করে শির।
টলে পড়ি টাটাইল সকল শরীর ॥
ঠকগুলা ঠেসে ধরে ঠোঁটে এল প্রাণ।
ঠাকুরাণি ঠাকুরালি ছাড় কর ত্রাণ ॥
ঠাহর না পাই ঠাট ঠাটে কত ধায়।
ঠেঁটা দায় ঠেকিলাম ঠাঁই দেহ পায় ॥
ডুকরিয়া কান্দি ভয়ে বান্ধা দুটি হাত।
ডরাইয়া উঠি ডাক ছাড়ে নিশিনাথ ॥
ডিঙ্গিয়া ডাইন পায় মারা যাই প্রাণে।
ডাকিনী সহিত শীঘ্র উর গো মসানে ॥
ঢক্কা বাজে ঢোল বাজে ঢেকা মারে ঢালি।
ঢঙ্গ বেটা ঢেমন বলিয়া দেয় গালি ॥
ঢাল খাঁড়া ঘুরিয়া ঢুলিয়া পড়ে গায়।
ঢলঢল করে আঁখি আড়ে আড়ে চায় ॥
তপস্বিনি ত্রিনয়নে তারা ত্রাণকর্ত্রি।
ত্রিপুরারি-ত্রিপুরা তারিণি জগদ্ধাত্রি ॥

তব তত্ত্ব ত্রিলোচন সবে মাত্র জ্ঞাত।
তথাপি তাঁহার তরে মায়া কর কত॥
থরথর কাঁপি স্থির কর মহামায়া।
স্থান দেহ পদপদ্মপদে শম্ভুজায়া॥
স্থাবরজঙ্গম তোমা ভিন্ন কিছু নহে।
স্থান দিলে মোরে কৃপামই নাম রহে॥
দিগম্বরি দনুজদলনি দাক্ষায়ণি।
দুর্গতিহারিণি দুর্গে দুরিতমোচনি॥
দাসে দুঃখ দেখ মা কিরূপ দয়ামই।
দাসীপুত্র দাসীর দয়িত দৈবে হই॥
ধূর্জ্জটিধামনি ধরাধরেশকুমারি।
ধীমান ধিয়ায় ধাম ধৈর্য্য মানা করি॥
ধরণীভূষণ ধীর ধর্ম্ম কিছু নাই।
ধিক্ ধিক্ ধরে বধে বলিয়া জামাই॥
নমো নিত্যে নারায়ণি নৃমুণ্ডমালিনি।
নবীননীরদনীলনিন্দিতবরণি॥
নলিননির্জ্জিতে নেত্রকোণে চাও শিবে।
নতুবা নিশ্চয় নরহত্যা মা লাগিবে॥
পতিতপাবনি পরা পর্ব্বতনন্দিনি।
প্রমথেশপ্রিয়া পাপপুঞ্জবিমর্দ্দিনি॥
পদ্মযোনি প্রভৃতি পঙ্কজপদভারে।
পার নাই মহিমার পামর কি পারে॥
ফাঁপরে ফিরিয়া চাও ফণীন্দ্ররূপিণি।
ফের দিয়া বান্ধে ফেলে বধে গো জননী॥

ফট ফরে কটু কহে ফিক্ ফিক্ হাসে।
ফুৎকারে কোটাল মারে রক্ষ নিজ দাসে॥
বিশ্ববিভূদ্বারা গো বারেক দয়া কর।
বিধির বিধাতা বট বিঘ্নরাশি হর গো॥
বলিতে বদন এক বাক্য কব কি।
বিবেক বিদরে বুক ব্যস্ত হইয়াছি॥
ভবানি ভৈরবি ভীমা ভবের বনিতা।
ভেশ ভয়ঙ্করা রাজ্ঞি ভূধরদুহিতা॥
ভগবতি ভারতি গো ভবের ভাবিনি।
ভক্তজনবৎসলা মা ভুবনপালিনি॥
মহেশ্বরি মহামায়া মহেশমোহিনি।
মূঢ়মতি মানব মহিমা কিবা জানি॥
মহীপতি মন্দমতি মত্ত ধনমদে।
মহিষমর্দ্দিনি মাগো স্থান দেহি পদে॥
যোগরূপা যশস্বিনি যশোদানন্দিনি।
যোগেন্দ্রযোষিতা যক্ষসমূলঘাতিনী॥
যুগল চরণপদ্মে যদি দেহ স্থান।
যশ থাকে যদি মা করগো পরিত্রাণ॥
রণরসে রত রমা রুক্মিণি রোহিণি।
রাক্ষসসংহারকর্ত্রি রাঘবরমণি॥
রঙ্গিণি রুদ্রাণি রক্ষ দক্ষিণ মশানে।
রাজা করে বধ রাখ আসিয়া আপনে॥
লহলহ লোলজিহ্ব ললিত বদন।
লীলায় বধিলা যত দুষ্ট দৈত্যগণ॥

লক্ষিতে না পারি মাগো চরিত্র তোমার।
লক্ষ্মীরূপা ক্ষম দোষ যতেক আমার॥
বিধিমত বিদ্যাবতী বিচারে হারিল।
বাপে না বলিয়া বিদ্যা বিরলে বরিল॥
বিপাকে বিদেশে বধে বীরসিংহ রায়।
বিরহিণী বিনোদিনী কি তার উপায়॥
শিবে শবাসনা শবশিশু শোভে কানে।
শত্রুগণে শিরে ধরি বধে গো শ্মশানে॥
শঙ্করি শরণমাত্র তোমার চরণ।
শীঘ্র শান্ত কর শ্যামা নিকট মরণ॥
সংসারসাগরে সার সবেমাত্র তুমি।
স্মরণ লয়েছি সরসিজপদে আমি।
সবে সুখসম্পদদায়িনি সনাতনি।
সমর্পিলা শত্রুহস্তে শিবসীমন্তিনি॥
শঙ্করসুন্দরি সত্য তব ঠাকুরালি।
সুন্দর শ্বশুরপুরে সারা হয় কালি॥
হত্যা হই হুতাশে হিংসার তুমি মূল।
হরপ্রিয়ে হৈমবতি হও অনুকূল॥
হা করিয়া হান হান কাট কাট ডাকে।
হুহুঙ্কারে হিয়া ফাটে পড়েছি বিপাকে॥
ক্ষীণ দেখি ক্ষিতিপতি ক্ষমা নাহি করে।
ক্ষেমঙ্করি ক্ষুদ্র দোষে ক্ষয় করে মোরে।
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষোভ পাই ক্ষুণ্ণ মন সদা।
ক্ষপাদিবা জ্ঞান নাহি ক্ষম মা শারদা।

শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালি কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

সুন্দর প্রতি কালীর অভয় দান।

চতুস্ত্রিংশাক্ষরে স্তব করি কহে কবি।
দক্ষিণ শ্রবণে শুনি পরিতুষ্টা দেবী॥
কহেন করুণাময়ী কেন ভয় পাও;
নৃপতিপূজিত হৈয়া নিজ দেশে যাও॥
ভয় নাহি ভয় নাহি বাছারে সুন্দর।
কার শক্তি কাটে তুমি কালীর কিঙ্কর॥
পর্ব্বত চালিতে পুত্র পারে কি পতঙ্গ।
ছায়ারূপে সদা আমি থাকি তব সঙ্গ॥
ভাবরে ভকত নর কালী কল্পতরু।
তারা নাম তরী তাহে কাণ্ডারী শ্রীগুরু॥
চতুষ্পদ চতুষ্পদ না লভে একান্ত।
আজ্ঞা কিন্তু আজ্ঞাপেক্ষা এ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত॥
ব্যতিক্রমে বিস্তর বিপদ পদে পদে।
ক্ষিপ্ত সেই স্বধর্ম্ম খোয়ায় খোসামোদে॥
শিষ্ট কষ্ট রাষ্ট্র শ্রেষ্ঠ লোকে কেহ কহে।
দ্বিতীয় ব্যক্তিতো সামান্য সাধ্য নহে॥
হলাহলামৃতামৃত রস হলাহল।
ক্রিয়া ক্রিয়া কলিকালে শীঘ্র ফলাফল॥
পরম সংস্কৃত বিদ্যা গুরুরতিগম্যা।
বীর্য্যবন্ত সাধকজনার মনোরম্যা॥

সল্লোক পথগামী সেই পথে পথ।
কহে কবিরঞ্জন আমার এই মত॥
কিরূপ কালীর কৃপা কহা নাহি যায়।
মাধব নামেতে ভট্ট মিলিল তথায়॥
জরির পোষাক পরা বেশ চিরা মাথে।
কনকে জড়িত হীরা নবরত্ন হাতে॥
চিক্কণ পাথর শিরে চকমক করে।
বহুমূল্য তরুণতপনতেজো ধরে॥
ডোরে লট্‌কা তলোয়ার কোমরে খঞ্জর।
চাঁদমুখে চাঁপদাড়ি পরম সুন্দর॥
বুকেতে চাপ্পানি ঢাল তুরকীর পৃষ্ঠে।
বাঘাই কোটাল পানে চাহে কোপদৃষ্টে॥
ক্রোধেতে আরক্ত বক্ত্র, দেহ স্থির নহে।
কোটালের প্রতি কোপে কটু কথা কহে॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালি কৃপামই।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

কোটালের প্রতি মাধব ভট্টের উক্তি।

ভট্টভাথা। থর থর দেহ কোপযুত ঘন ঘন
নিরখই যামিনীনাথবয়ান।
রকত রদ ছদ বদহি রাজন দারুণ
দরপ ছোড়ল তুহু জ্ঞান॥
লালন সুন্দর বিগ্রহ নিগ্রহ
হোয়ত রোয়ত ভাট।

ধৃত করপর খর খঞ্জন ঝাঁকই
হাঁকই বে পহেলা মুঝে কাট॥
ছুঁন্দর ছো গুণসিন্ধু কি নন্দন
ক্যা কহুঁ যাকো ভয়ানী ছহায়।
জাকর লাগি জাগি বহু যামিনী
চিরদিন পূজন পড়নি ধেয়ায়॥
পরমনরবর তুহ বি মুরখ বুঝা
হাম বাতমে ছাত মেরা আও।
রাজাকি পাছ খালাছ করো যাকর
সুন্দরকো গজরাজ ঠাহরাও॥
দো আঁখিয়া ঘোমাইয়া বের বের কোটালিয়া
দেওতোর মুঝে গারি।
মট দোহাই লাগে তুঝে ভট্ট সেতাব কাঁহা
চোর কোতোয়াল তোহারি॥
ভট্ট কহে কোতোয়ালরে এয়ছারে
গারি মত দিজিয়ে।
ঘড়ি এক বিচমে গাধি জান খোয়ায়ে গা
বুঝ ছমুজ্‌কে বাত কিজিয়ে॥
জৈছন হেরবি ঐছন কবি ছবি
বদন বিরাজিত নিরমল চান্দ।
কহে পরসাদ যো চোর কহে ছো মূঢ়
কুলরমণী মনমোহন ফান্দ॥

মাধবের প্রতি কোটালের কটুবাক্য।

কহো কোতোয়ালরে হুকুম কেন্নে দিয়া।
ভয়ানী ছেবক কো এস্তরে হাল কিয়া॥
মহারাজকে বেটা বিদ্যা পূজকে মহাদেও।
সুন্দর কো খসম পায়া মেরে বাত লেও॥
ছবকা খয়ের হোগা বের বের কহোঁ মেই।
মেরে বাত না শুনেগা সাজা পাওগে তেঁই॥
ছোড় দিজে কানলাল কো চল সাত।
আপকে বরোবর যাকে কহো এহি বাত॥
কোপে কহে কোতোয়াল মৌত লাগা পাজি।
ফের এয়ছা কহেগা করোঙ্গা জুতি বাজী॥
চোরকো ছরদার তেঁই বুঝা গেয়া এহি।
রাজা কি দোহাই ভাই ছোড় মত কহি॥
কোহি কহে বেলফেয়াল মোচতো উখাড়ো।
কোহি কহে চোরকে সামিন লেকে গাড়ো॥
কোহি কহে চোরকো গাধেমে চড়াও।
এহি ওক্ত ছের মুড়ায়েকে সহর ঘুমাও॥
কোহি কহে জানে দেও জি জৈয়ছা ফিঁয়া আয়া।
বুঝা গেয়া বাতমে ছাজাই তেয়ছা পায়া॥
মান ভঙ্গ মলিন মাধব মনোদুখে।
কাষ্ঠবৎ কায় কথা নাহি সরে মুখে॥
পদ্য দেখি গদ্য কথা যদ্যপিহ করে।
বৈদ্যগ্রন্থে সদ্য ফল বৈদ্যক হা করে॥

নব্যলোক ভব্য হয় সভ্যসঙ্গে বটে।
গুণ যেন দ্রব্য যোগ দিব্য গুণ ঘটে ॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপামই।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

ভূপতির সভাসুদ্ধ মশানে গমন।

কোটালিয়া কটু বলে রাজার নিকটে চলে
ভাট কহে নির্ভয় উত্তর।
শুন শুন মহারাজ বিপরীত তব কায
যথোচিত উঠে যেয়ে কর ॥
গুণসিন্ধু ধরাধিপ খ্যাত নামে জম্বুদ্বীপ
কলিযুগে যেন রঘুবীর।
নির্ম্মল যাহার যশ প্রকাশিত দিগ্ দশ
তাঁর পুত্র সুন্দর সুধীর ॥
পূর্ব্ব পুণ্যপুঞ্জ হেতু কৃপান্বিত বৃষকেতু
জামাতা মিলিল তেঁই হেন।
তুমি বিচক্ষণ ভূপ চরিত্র এমন রূপ
পেয়ে নিধি ঘৃণা কর কেন ॥
বিদ্যা বিনোদিনী কন্যা ধরণীমণ্ডলে ধন্যা
শাপভ্রষ্টা জন্ম তব ঘরে।
সুন্দর সামান্য নর না জানিও নৃপবর
সত্য কহি তোমার গোচরে ॥
জানকী-জীবন রাম কিম্বা শ্যাম কিম্বা কাম
কিম্বা পুরন্দর কিম্বা শশী।

সন্দেহ নাহিক মাত্র ভুবনে এমন পাত্র
দৃষ্ট নহে শুন গুণরাশি॥
ভট্টমুখে সুধাভাষ নৃপমুখে মৃদুহাস
উঠে দিল প্রেম আলিঙ্গন।
খুলিয়া অঙ্গের যোড়া বাছিয়া তুরুকি ঘোড়া
আর দিল বহু রত্ন ধন॥
সভাসুদ্ধ নিয়া সঙ্গে ভূপতি পরম রঙ্গে
উপস্থিত দক্ষিণ মশানে।
কালীর কিঙ্কর যেই ভুবনবিজয়ী সেই
মহিমা তাহার কেবা জানে॥
রাজ্যসুদ্ধ ভেকধর সবাই সাধক নর
মুখে কহে রাধাকৃষ্ণ বাণী।
চিত্তে বান্ধা কালীপ্রিয়া আজ্ঞামত করে ক্রিয়া
এইরূপে কাল কাটে প্রাণী॥
বৈশ্য ক্ষত্র বৈদ্য শূদ্র নিত্যানন্দ বীরভদ্র
কর্ম্ম ভাল নহে যেবা কহে।
তার কিন্তু নাহি স্বর্গ শুন কহি ধীরবর্গ
সেও পাপী সে সঙ্গে যে রহে॥
সদা পুটাঞ্জলিপাণি শ্রীকবিরঞ্জন বাণী
বিমুক্ত কাহার মায়াপাশে।
ভবসিন্ধু পার হেতু অভয় চরণ সেতু
উমা আমা উরহ মানসে॥

সুন্দরের প্রতি ভূপতির বিনয়োক্তি।

শীঘ্রগতি নৃপবর ধর্য়ে জামাতার কর
মুক্ত কৈল নিগড়বন্ধন।
গলে বস্ত্র ত্রস্ত উঠে নিকটে অঞ্জলিপুটে
সবিনয় কহে সুবচন॥
যেমন গোকুলপুরী কৌতুকে নবনি চুরী
কৈলা প্রভু ত্রিভুবনপতি।
গোপীমুখে শুনি বাণী রজ্জু বান্ধে যুগপাণি
তমোগুণে রাণী যশোমতী॥
অথবা অজ্ঞাত বাসে বিরাটভূপতিপাশে
বৎসরেক ছিলা যুধিষ্ঠির।
বিধাতা বিমুখ তাঁরে অক্ষপাটী ফেলে মারে
ফুট্যে ভালে পড়িল রুধির॥
শেষে পেয়ে পরিচয় হৃদয়ে বিষম ভয়
সকরুণে কহে গদগদ।
চিত্তে না জন্মিল রোষ ক্ষমা কৈল তাঁর দোষ
ধর্ম্মপুত্র শাস্ত্রবিশারদ॥
যেমত বিরাটরাজ না জানিয়া কৈল কায
আমি সেইরূপ জ্ঞানহত।
তুমি গুণসিন্ধুসুত ধীর সর্ব্বগুণযুত
মর্য্যাদা করহ দোষ যত॥
মাণিক নীচের ঠাঁই যেন মূর্খে বুঝে নাই
দুরদৃষ্ট হেতু জন্মে হেলা।

কিম্বা শিশু বুদ্ধিহীন বান্ধা থাকে রাত্রিদিন
শিলাপুত্র সঙ্গে রঙ্গে খেলা॥
শুন শুন কল্পতরু পর্য্যায় পরম গুরু
বটি বাপা তোমার শ্বশুর।
অধিকন্তু কব কিবা মনে কিছু না করিবা
তুমি মোর বাপের ঠাকুর॥
শ্বশুর বিনয় শুনি মহাকবিশিরোমণি
কহে কেন হেন ঠাকুরালি।
নিজ নিজ কর্ম্মভোগ পরে বৃথা অনুযোগ
সকলি করেন ভদ্রকালী॥
যেন রথচক্রাকৃতি নরভাগ্য নরপতি
চিরকাল সমান না যায়।
দুঃসময়ে ধীর যেবা তারে নিন্দা করে কেবা
উগ্রমতি মূর্খ কহি তায়॥
ধন হেতু মহাকুল পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত
প্রসন্না কালিকা কৃপাময়ী॥
সেই বংশসমুদ্ভব পুরুষার্থ কত কব
ছিলা কত কত মহাশয়।
অনচির দিনান্তর জন্মিলেন রামেশ্বর
দেবীপুত্র সবলহৃদয়॥
তদঙ্গজ রামরাম মহাকবি গুণধাম
সদা যাঁরে সদয়া অভয়া।

তদঙ্গজ এ প্রসাদে কহে কালিকার পদে
কৃপাময়ি ময়ি কুরু দয়া ॥

রাণীর বিদ্যার প্রতি বিনয়।

বাঁচিল সুকবি সুন্দর চোর।
সাধুচিত্তে নাহি সুখের ওর ॥
বিদ্যার গোচর সকলে কহে।
কমলিনি কথা মিথ্যা এ নহে ॥
বাঁচিল তোমার জীবননাথ।
নিকটে নৃপতি যুড়িয়া হাত ॥
সজল যুগল লোচন লোল।
গদগদ কহে মধুর বোল ॥
সখীমুখে শুনি সুন্দর বাণী।
নন্দিনী নিকটে চলিল রাণী ॥
ধূলা ঝাড়ি তোলে কোলেতে করি।
চুম্বতি বদন চিবুক ধরি ॥
বারেক বদন তুলিয়া চাও।
অভাগী মায়ের মাথাটি খাও ॥
রাগে কত কটু কয়েছি তোরে।
জননী জানিয়া ক্ষমহ মোরে ॥
এ মহীমণ্ডলে বটি গো ধন্যা।
উদরে ধরেছি তো হেন কন্যা ॥
বিনোদিনী কহে ঈষৎ হাসি।
আগো মাগো আমি তোমার দাসী ॥

কন্যাকে বিনয় কি হেতু কর।
গুরু কেবা মোর তোমার পর ॥
মন্ত্র দিয়া শুন করুণাময়ি।
গোটা দুই কথা তোমারে কই ॥
পুনরপি ধরাজন্ম লভিলে।
তোমা হেন যেন জননী মিলে ॥
হাসি হাসি কহে যতেক আলি।
সকলি কেবল করেন কালী ॥
কাতর শ্রীকবিরঞ্জনে কয়।
তরাও তারিণী শমনভয় ॥

বিদ্যার উল্লাস।

মান করি শশিমুখী মহাহৃষ্ট মনে।
ভবানী ভাবয়ে ভীমা মুদ্রিত নয়নে ॥
পূজে পর্ব্বতেশ-পুত্রী পরম কৌতুকে।
মেষ মহিষাদি বলি দিল মুহূর্ত্তেকে ॥
বদনে রসনারব যত সীমন্তিনী।
শঙ্খঘণ্টাকোলাহল করে জয়ধ্বনি ॥
সঙ্গোপনে জপে রামা মহাশঙ্খ মালা।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বীরসিংহবালা ॥
কৃতাঞ্জলি কহে বিদ্যা প্রেমে গদগদ।
পরকালে পাই যেন পদকোকনদ ॥
দীন দ্বিজবর্গে দিল নানা রত্ন ধন।
সাবিত্রী সমানা ভব কহে বিপ্রগণ ॥

করালবদনা কালী কলুষহারিণী।
সংসারসাগরে ঘোরে নিস্তারকারিণী ॥
তুমি কৃপাময়ী মাগো কৃপানাথ ভর্ত্তা।
জগদম্বা জননী জনক বিশ্বকর্ত্তা ॥
তথাপিও দুঃখরাশি না হইল দূর।
সকলে করুণাময়ী এ দীনে নিষ্ঠুর ॥
অপার মহিমা নষ্ট হয় হেন বাসি।
অসুরনাশিনী আশু দয়া কর আসি ॥
বদরি-কোমল পূর্ণ সুধা রস ভরা।
সুবোধ কুবোধ বোধগম্য নহে ত্বরা ॥
রসবেত্তা যে জন কি তার তৃষ্ণা ক্ষুধা।
প্রতি বর্ণে বর্ণে কর্ণে প্রবেশিত সুধা ॥
পাঠ করে পুরাণ পণ্ডিত প্রেমে ভাসে।
গবাগণ গুপ্তে গো ভঙ্গিমা করে হাসে ॥
অরসিক নিকটে রহস্য নিবেদন।
ততোধিক শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম হয় যে মরণ ॥
গ্রন্থমধ্যে সঙ্কেত রহিল যে যে স্থানে।
মা জানেন মাত্র ব্যক্ত নহিলে কে জানে ॥
ধন্যা দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে।
আমি কি অধম এত বৈমুখ আমারে ॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব।
কহিবার কথা নহে বিশেষ কি কব ॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

ভূপতি হইতে সুন্দরের সম্মানপ্রাপ্তি।

বীরসিংহ গুণনিধি পণ্ডিতে জিজ্ঞাসে বিধি
তোমরা জানহ শাস্ত্রমর্ম্ম।
বিচারে পরাস্ত বালা সুন্দরে দিলেক মালা
এক্ষণে কিরূপ হবে কর্ম্ম॥
এক কালে ধীরচয় কহে শুন মহাশয়
শাস্ত্রসিদ্ধ কথা বটে এহ।
গন্ধর্ব্ববিবাহ পর পুনরপি নৃপবর
বিবাহ না করে কোথা কেহ॥
কৃষ্ণচন্দ্র কুতূহলে রুক্মিণী হরিলা বলে
ভাব দেখি কোথা সংস্কার।
পার্থ বীর ব্রহ্মচারী ভজিলা সুভদ্রা নারী
সত্যভামা যুক্ত পাত্র আর॥
গ্রন্থশ্রেষ্ঠ ভাগবত তার কিন্তু এই মত
স্বামীটিকায় নাহি কর্ম্ম নাথে।
আদিপর্ব্বে হলায়ুধ পরিহরি সর্ব্ব ক্রোধ
পুনঃ সম্প্রদান কৈলা পার্থে॥
কল্পভেদে মতভেদ মুনিবাক্য বটে বেদ
পুনরপি বিবাহে কি ফল।
বিধিলিপি থাকে যেই সঙ্ঘটন হয় সেই
নরনাথ না হবে বিফল॥
স্বপ্নে অনিরুদ্ধসঙ্গে নানা সুখভোগরঙ্গে
নিদ্রাভঙ্গে উঠে বাণসুতা।

বিরহে শরীর দহে কদাচিত শাম্য নহে
কান্দে বামা মহাদুঃখযুতা ॥
চিত্ররেখা সঙ্গে ছিল অনিরুদ্ধে মিলাইল
যাবতীয় দুঃখ গেল দূর ।
শেষে সেই অনিরুদ্ধ বাণরাজা করে রুদ্ধ
প্রভু তার কৈলা দর্প চূর ॥
আছে পূর্ব্বাপর নীত কিবা তব অবিদিত
কি ভাবনা কর মহীপাল ।
দ্বিজে দেহ রত্নদান জামাতার রাখ মান
ঘুষিবেক কীর্ত্তি চিরকাল ॥
ভূপতির শুদ্ধমন রত্ন করে বিতরণ
অদৈন্য করিল দ্বিজবর্গ ।
নরেন্দ্র নিকটে থাকি বাহু তুলি কহে ডাকি
নৃপতি অক্ষয় তব স্বর্গ ॥
রত্নসিংহাসনমাঝে বসাইল যুবরাজে
মন্দ মন্দ চামরসমীর ।
সিফাই সান্তিরি যারা কুরনিস করে তারা
আদবেতে লোটাইয়া শির ॥
বাখাই কোটাল কাছে বুকে হাত খাড়া আছে
নকীবেতে করিছে সেলাম ।
নিরখি কোটালমুখ হৃদে জন্মে লজ্জা সুখ
ঈষৎ হাসিল গুণধাম ॥
ঘুচিল সকল দুখ হৃদে জন্মে পুনঃ সুখ
দম্পতি মিলিল পুনর্ব্বার ।

দ্বিগুণ বাড়িল প্রেম মাণিক্যজড়িত হেম
সেইরূপ ভাব দোঁহাকার॥
সদাপুটাঞ্জলিপাণি শ্রীকবিরঞ্জনবাণী
বিমুক্ত করহ মায়াপাশে।
ভবসিন্ধুপার হেতু অভয় চরণ সেতু
উমা আমা উরহ মানসে॥

সুন্দরকে মাতৃবেশে কালীর স্বপ্নদান।

শ্বশুরবাসেতে রহে কবি যুবরাজ।
ভাবেন ভুবন-মাতা ভাল এই কাজ॥
শাপভ্রষ্ট জন্মধরা আমার সুন্দর।
মম পূজা প্রকাশিতে পৃথিবী ভিতর॥
কামিনী পাইয়া সুখে ভুলিলা কুমার।
তবে ত আমার পূজা হবে না প্রচার॥
ক্ষণমাত্রে ধরি তার জননীর বেশ।
চক্ষে বহে শত ধারা বিগলিত কেশ॥
মলিন বসন ভাতি শোকেতে ব্যাকুলা।
কান্দে রাণী সকল শরীরে মাখা ধূলা॥
নিশি অর্দ্ধযামশেষে স্বপ্নে কহে শিবা।
ওরে পুত্র সুন্দর তোমারে কব কিবা॥
এই হেতু করে লোক সন্তানকামনা।
পেয়ে পিণ্ডদান খণ্ডে সকল যাতনা॥
বৃদ্ধকালে নানা জাতি সেবা করে সুত।
কত বা সন্তান জন্মে কত জন্মে ভূত॥

তোমার সুখ্যাতি পুত্র শুনি ঠাঁই ঠাঁই।
সুন্দর সমান ধীর ত্রিভুবনে নাই॥ ছু
কেন নহিবেক বাছা সন্তানের কার্য্য।
পিতা মাতা ছাড়িলা ছাড়িলা নিজ রাজ্য॥
কি দোষ তোমার কলিযুগের এ ধর্ম্ম।
ছাড়ান বিষম বটে রমণীর মর্ম্ম॥
ভাল বাছা তুমি কোনরূপে ভাল থাক।
জুড়াক পরাণ মুখে মা বলিয়া ডাক॥
নিদ্রাভঙ্গে উঠি কবি কান্দে উভরায়।
কহে মাগো মোরে ছেড়ে গেলে গো কোথায়॥
পতি করে রোদন রোদন করে সতী।
কোন মতে শাম্য নহে ভূপতিসন্ততি॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে করি কৃতাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলালে মাতা দেহি পদধূলি॥

সুন্দরের স্বদেশগমনার্থ বিদ্যার নিকট বিদায়প্রার্থনা।

কান্তকরে ধরে কহে মৃদু স্বরে
বিদ্যাবতী বিনোদিনী।
আমি তুয়া দাসী কহ গুণরাশি
বিশেষ কারণ শুনি॥
চিত্তে কেন দুঃখ ম্লান বিধুমুখ
নয়নে সহস্র ধারা।

তুমি যুবরাজ নাহি বাস লাজ
কান্দিছ অবলা পারা ॥
কবিবর কহে শোকে তনু দহে
মনেতে পড়েছে মাতা !
প্রভাতে যামিনী প্রত্যূষে কামিনী
যাব যে করে বিধাতা ॥
অনুচিত কার্য্য পরিহরি রাজ্য
চিরদিন গৌড়ে ভ্রমি।
গমনবিষয় প্রেয়সীকে কয়
যাবে কি না যাবে তুমি ॥
বিষম ভারতী শুনি কহে সতী
নাথ কি কব তোমাকে।
পতি পূজে যেবা করে পতিসেবা
সে নাকি বিচ্ছেদে থাকে ॥
প্রভু কিন্তু কই বৎসরেক বই
নিতান্ত যাব সে দেশ।
কান্তাকথা রাখ বৎসরেক থাক
পাইয়াছ বহু ক্লেশ ॥
নিকটে ললনা সুখভোগ নানা
পরম কৌতুক কর।
যে মাসে যে গুণ প্রভু শুন শুন
বিদগ্ধ কবিবর ॥
ভীমসীমন্তিনী ভূধরনন্দিনী
ভুবনবন্দিনী শ্যামা !

কিঙ্কর প্রসাদে স্থান দেহ পদে
দোষপুঞ্জ কর ক্ষমা ॥

বিদ্যা কর্ত্তৃক বারমাস বর্ণন।

প্রথমে প্রবেশ মেষ কান্ত যার দূরদেশ
সদা ক্লেশ রসলেশ নাই।
বিষম কুসুমশর শরে তনু জর জর
কিবা সুখ বিমুখ গোঁসাই ॥
মলিন বদনশশী ভাবয়ে ভুবনে বসি
নীরে পশি নহে ভক্ষি বিষ।
নেত্রানলে ভস্ম যেই মরে জীয়ে পুনঃ সেই
বাণে হানে বিরূপাক্ষ ঈশ ॥
বৃষে বিষতুল্য কর বপু দহে নিরন্তর
নিদাঘে শরীর যায় দহি।
সুনবীন তরুছায় সুখে শিখী নিদ্রা যায়
তদঙ্কে নিঃশঙ্কে রহে অহি ॥
শুন শুন গুণরাশি আমি তুয়া প্রিয়া দাসী
আমার তোমার বড় কেবা।
মলয়জপঙ্করঙ্গে চর্চ্চিত করিব অঙ্গে
ইচ্ছা আছে এইরূপ সেবা।
মিথুনে মিথুনে যেই ধন্য পুণ্যবন্ত সেই
অন্য কেবা সেজন সমান।
বিরহিণী কুলদারা যারা তারা সেবে তারা
প্রায় মরা কণ্ঠাগত প্রাণ ॥

ঘন ঘন ঘন রব অবশ শরীর সব
মনোভব নিতান্ত দুরন্ত।
কদম্বকুসুম ফুটে বনতটে মন ছুটে
দুঃখ শান্ত কান্ত কি কৃতান্ত॥
কর্কটে বরিষা বাড়ে পক্ষী নাহি বাসা ছাড়ে
যাতায়াতে সকলে রহিত।
ঘর ছাড়া পতি যার অভাগ্য কপাল তার
ধীরে ধীর বিধি বিড়ম্বিত॥
ধরাধর গুরু গর্জ্জে যে বুঝি মদন তর্জ্জে
আটনি দামনি বাহু লাড়া॥
দেবরাজ দগ্ধে মর্ম্ম দেখ কি অনীত কর্ম্ম
মড়ার উপরে হানে খাড়া।
সিংহে মহী একাকার জল ভিন্ন স্থল আর
তিল অৰ্দ্ধ নাহি দেখি মাত্র।
ভেকের পরম সুখ কাল কোকিলের দুখ
কামিনীর কেঁপে উঠে গাত্র॥
দিবা যায় গৃহনাটে রজনীতে বুক ফাটে
আবেশে বালিস চাপে কোলে।
যে সুখ পতির সঙ্গে প্রসঙ্গ কিং তার সঙ্গে
ঘৃতের সুস্বাদ কোথা ঘোলে॥
কন্যার কেবল যুক্তি ভক্তিভাবে পূজে শক্তি
মুক্তি লাভ উক্তি উক্ত বেদে।
যে গৃহী সাধক দীন সেই সে দিবসে তিন
মরমে মরিয়া থাকে খেদে॥

মৃণময়ী দশভুজা করিব তাঁহার পূজা
দাসীর বচন রাখ প্রভু।
যে আজ্ঞা করিবে যবে ক্ষণেকে বিস্তর পাবে
এ কথা অন্যথা নহে কভু॥
তুলা তুলা আর নাই তুলা কর এই ঠাঁই
দ্বিজে দান দিতে পুণ্যচয়।
তুমি সুরতরুকল্প আমি রামা অতি অল্প
মনে বুঝি দেখ হয় নয়॥
প্রথমত হিমাগম বিরহিজনার যম
নলিনীর দর্প করে চুর।
যে যুবতী নহে দুই শুয়্যে করে হাইফুই
কান্দে সতী পতি অতি দূর॥
শুন প্রভু হৃদয়েশ নিবেদন সবিশেষ
বৃশ্চিকের বিস্তারিত গুণ।
মাস নিজে ভগবান হাটে ঘাটে মাঠে ধান
সর্ব্ব দ্রব্য দুর্ল্লভ নূতন॥
ত্রিবিধ প্রকার লোক নাহি দুঃখ রোগ শোক
পার্ব্বণাদি করে চিত্তসুখে।
অগ্রে দিয়া কাকবলি সবান্ধবে কুতুহলি
নূতন তণ্ডুল দেব মুখে॥
একান্ত বিষম ধনু শীতে কম্পমান্ তনু
তরুণী তপন তুলা সার।
কিসের ভাবনা আছে সতত থাকিব কাছে
সেবা হেতু চরণ তোমার॥

নিত্য উষ্ণ জলে স্নান উচিত বটে হে প্রাণ
উষ্ণ অন্ন ঘৃতাদি ভোজন।
দশদণ্ড মধ্য হবে দেশে কেন যাবে তবে
ধীর তুমি ধৈর্য্য কর মন॥
হেদে প্রাণনাথ কবি মকরে প্রখর রবি
এই মাস বিখ্যাত ভুবনে।
প্রাতঃস্নানে মহা পুণ্য করে যেবা সেই ধন্য
পারে লোক জিনিতে শমনে॥
সবিশেষ কব কিবা জপহোমে রাত্রি দিবা
প্রভু তুমি থাকহ নিযুক্ত।
চেতনবিশিষ্ট মনু জপেতে নিষ্পাপতনু
সংসারসাগরে হবা মুক্ত॥
আর এক শুন বোল কুম্ভেতে গোবিন্দ দোল
দরশনে সর্ব্বপাপ নাশে।
বিজ্ঞ বট কি না জান দেখহে থাকি কেমন
কিছুকাল গোণে যাবে বাসে॥
পরম সুখদ মাস শিশিরে যাতনাহ্রাস
মন্দ মন্দ মলয়পবন।
যুবক যুবতীসঙ্গে বঞ্চে নিশি রসরঙ্গে
উভয়ত বিদেশে মরণ।
মানে মীনকেতু পাপ দ্বিগুণ জ্বলায় তাপ
সহচর সখা সেই মধু।
তার দৈবে নাই লাজ কলঙ্কী সে দ্বিজরাজ
মৃত্যুরূপা পরভৃতবধূ॥

কহে করি প্রণিপাত শুন শুন প্রাণনাথ
বসন্ত দুরন্ত মন্দকারী।
রাজা মূর্খ মূর্খ পাত্র ধর্ম্মজ্ঞান নাহি মাত্র
বধ করে বিরহিণী নারী॥
এ কাল বিলম্ব কর পশ্চাতে যাইবা ঘর
দাসীবাক্যে কান্ত হও শান্ত।
শ্রীকবিরঞ্জনে কহে গমন বারণ নহে
দেশে যাওয়া হইল নিতান্ত॥

বিদ্যার শ্বশুরালয় গমনার্থ প্রার্থনা।

কবিবর কহে বাণী কহ যত ভাল জানি
চিত্তে কিন্তু প্রবোধ না মানে।
শুন শুন কুরঙ্গাক্ষি সত্য কহি প্রাণ সাক্ষী
যাতনা যেমন সই জানে॥
কবি কহে প্রবোধিয়া শুন শুন প্রাণপ্রিয়া
মহাগুরু জনকজননী।
শাস্ত্রসিদ্ধ কথা এহ যা হতে দুর্ল্লভ দেহ
বিনে মুক্ত উপযুক্ত ধ্বনি॥
শ্রেষ্ঠ পুত্র হয় যেবা করে পিতামাতা সেবা
লয়কালে লয় গঙ্গাতীর।
সজ্ঞানে ত্যজিলে তনু ধন্য মানে নিজ জনু
গয়াশ্রাদ্ধে সার্থক শরীর॥
মম সম দুষ্ট পুত্র ধরণীমণ্ডলে কুত্র
লোকভয় ধর্ম্মভয় নাই।

বৃদ্ধ পিতামাতা ঘরে শোকে দেহ ত্যাগ করে
কুবুদ্ধি কি লওয়াল গোঁসাই ॥
যদি ভাল যাব দূর থাক নিজে পিতৃপুর
কিছুকাল কর সুখ ভোগ।
হও তুমি পুত্রবতী নিয়া যাব পরে সতী
কিন্তু দুঃখ সম্প্রতি বিয়োগ ॥
হৃদয়েশ ক্লেশকথা মরমে পরম ব্যথা
অভিমানে উঠিল অমনি।
গোযুগে গলিত নীর গজেন্দ্রগমন ধীর
গতি যথা বৈসেছে জননী ॥
দুহিতা দুঃখিতা দেখি রাণী বলে বাছা একি
নলিননয়নে কেন নীর।
কার সনে কৈলা দ্বন্দ্ব কে কহিল কিবা মন্দ
ফাটে বুক প্রাণ নহে স্থির ॥
মায়ের মাথাটি খাও মাগো মুখ তুলে চাও
মনের কি দুঃখ নাহি জানি।
বিদ্যা বলে কিবা কব নিশ্চয় জামাতা তব
দেশে যান মাগি গো মেলানি ॥
সদা পুটাঞ্জলিপাণি শ্রীকবিরঞ্জনবাণী
বিমুক্ত করহ মায়াপাশে।
ভবসিন্ধুপার হেতু অভয়চরণ সেতু
উমা আমা উরহ মানসে ॥

রাণীর প্রতি বিদ্যার প্রবোধবচন।

এ কথা কহিল যদি মুনিমনোহরা।
মহীপতি-মহিলা মূর্চ্ছিত পড়ে ধরা॥
চেতন পাইয়া কহে কহ চন্দ্রমুখি।
মাতৃহত্যাভয় বাছা নাহি একটুকি॥
কেমনে এমন কথা কহ তুমি ঝিয়ে।
বিদেশে পাঠায়ে তোমা অভাগী কি জীয়ে॥
দশমাস গর্ব্ভে বটে দিয়াছি গো ঠাঁই।
পাইয়াছি যত কষ্ট তার সীমা নাই॥
পালিলাম এতকাল নিত্য চিত্তসুখে।
এখনে ছাড়িতে চাহ ছাই দিয়া মুখে॥
তোমার নাহিক দোষ বিধাতা নিষ্ঠুর।
শঙ্কা নাই তাই বিদ্যা যাবে এতদূর॥
হরি হরি কারে কব ললাটের লেখা।
জীবনে মরণে বুঝি আর নাহি দেখা॥
বিদ্যা বলে মাগো তুমি যে কহ প্রমাণ।
ধৈর্য্যাবলম্বন করে আছে যার জ্ঞান॥
কার পুত্র কার কন্যা কার মাতাপিতা।
সর্ব্ব মিথ্যা সত্য এক নগেন্দ্র-দুহিতা॥
বিষম যাঁহার মায়া সংসারব্যাপিনী।
কৌতুক দেখেন কর্ম্মভোগ করে প্রাণী॥
বেদেতে বিদ্বান্ বেদব্যাস মহামুনি।
মায়াতে ভুলিলা তেঁহ শাস্ত্রে হেন শুনি॥

শুকদেব জন্মিলেন তাঁহার তনয়।
সুখদুঃখহীন তনু জ্ঞানী মহাশয়॥
ভূমিগত হবামাত্র স্বকর্ম্মে প্রস্থান।
ফের ফের বল্যে মুনি পাছে পাছে যান॥
কত দূরে নারীচয় করে জলক্রীড়া।
নগ্ন তারা শুকে দেখি না করিল ব্রীড়া॥
কালগৌণে তথা উপস্থিত ব্যাসমুনি।
সলজ্জিতা কুলে উঠে যত সীমন্তিনী॥
কাঁপে গুরু ঊরু চারু বসন পরিল।
কৃতাঞ্জলি মুনীন্দ্র নিকটে দাঁড়াইল॥
হাসিয়া কহেন মুনি এই কোন কর্ম্ম।
বুঝিতে না পারি তোমা সবাকার মর্ম্ম॥
যুবা পুত্র গেল মোর এই পথ দিয়া।
লজ্জা না পাইলা মনে সে জনে দেখিয়া॥
বৃদ্ধ আমি আমাকে দেখিয়া এত লজ্জা।
বসনাদি পরিলা ধরিলা পূর্ব্ব সজ্জা॥
সবিনয় কহে তারা শুনহ গোঁসাই।
মহাযোগী শুকদেব বাহ্যজ্ঞান নাই॥
মায়াতে মোহিত তুমি মুনি মহাশয়।
তোমারে দেখিয়া মনে জন্মে লজ্জাভয়॥
সুতস্নেহে তুমি মুনি চলেছ পশ্চাৎ।
শুক নাহি ভাবেন ডাকেন পাছে তাত॥
লজ্জা পেয়ে মুনি চলি গেলা নিজপুরে।
প্রবোধ জন্মিল চিত্তে খেদ গেল দূরে॥

সর্ব্বশাস্ত্রবিজ্ঞ মুনি তাঁর এত জ্বালা।
কি দোষ তোমার মাগো তুমি ত অবলা॥
নিবৃত্তিমার্গের কথা কহিলাম মাতা।
প্রবৃত্তিমার্গের সৃষ্টি সৃজিলা বিধাতা॥
পাছে নাহি বুঝে পরে করে অনুযোগ।
কন্যাপুত্র জন্মিলে কেবল কর্ম্মভোগ॥
তুভ্যমহং সম্প্রদদে কহিলে বচন।
গোত্র ভিন্ন হয়ে পড়ে দৈবের ঘটন॥
পরপুত্র জননী গো হয় হর্ত্তাকর্ত্তা।
শাস্ত্রে কহে রমণীর মহাগুরু ভর্ত্তা॥
রাণী কহে চন্দ্রাননে তুমি রমাসমা।
বিশ্বকে বুঝাতে পার গুণ আছে ক্ষমা॥
কিছু কিছু বুঝি বটে এই শাস্ত্রনীত।
তথাচ বিদরে বুক মায়াতে মোহিত॥
জল শৈবালের প্রায় মন নহে স্থির।
ক্ষণেক বিবেক ক্ষণে বিদরে শরীর॥
পুনরপি কহে বিদ্যা মন কর দড়।
শোকে সর্ব্বধর্ম্মলোপ শোক পাপ বড়॥
সজলনয়নে কহে যুত সহচরী।
ছাড়িয়া মমতা তুমি যাবে কি সুন্দরি॥
কেন্দে কহে বিমলা কমলা ছেড়ে যাও।
জন্মশোধ দেখি চাঁদমুখ তুলে চাও॥
সঙ্গে যাবে যারা তারা সহর্ষবদন।
যে না যাবে কত কব তাহার যাতন॥

রাজার নিকটে রাণী কহে সবিশেষ।
দুহিতা জামাতা তব অদ্য যান দেশ॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে করি কৃতাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলালে মাতা দেহ পদধূলি॥

বিদ্যা সহ সুন্দরের স্বদেশগমন।

বীরসিংহ নৃপ্রধান শুনিলা জামাতা যান
হায় হায় রোদন বদনে।
ক্ষণে ক্ষণে পড়ে মহী খেদ করে রহি রহি
বিধাতার এই ছিল মনে॥
হৃদয়ে পরম ব্যথা কহে কথা যাব কোথা
কার বিদ্যা কে লয়ে চলিল।
স্বপ্নরূপ কন্যাগুলা ভেঙ্গে গেল ধুলাখেলা
শোকশেল হৃদয়ে পশিল॥
ক্ষণকাল মৌনে থেকে সুন্দর জামাতা ডেকে
স্তব করে বাক্য সকরুণে।
বাপা এই বৃদ্ধকাল ভাল তব ঠাকুরাল
বিহিত করহ নিজ গুণে॥
দিলাম সকল রাজ্য চেষ্টা পাও রাজকার্য্য
আনাই তোমার মাতাপিতা।
বেহাই বেহাই সুখে যাইব উত্তর মুখে
তুমি রাজা মহিষী দুহিতা॥
শ্বশুরের সন্নিকটে কবিবর কহে বটে
স্বরূপ কহিলা মহারাজ।

কিন্তু একবার যাই দেখি বন্ধু বাপ ভাই
না যাওন ভাল নহে কায়॥
সত্য সত্য শুন শুন আগমন শীঘ্র পুনঃ
হবে তব রাজ্যে মহাশয়।
সম্প্রতি বিদায় মাগি আমা দোঁহাকার লাগি
বৃথা শোক করহ হৃদয়॥
অপরাহ্নে তরুছায় অতি দূরতর যায়
সে যেমত ছাড়া নহে মূল।
অন্যতম ভাব পাছে মানস তোমার কাছে
থাকিল গমন সেই তুল॥
দানে রাজা কর্ণতুল্য দিল দ্রব্য বহুমূল্য
ছত্র গজ রথ দাস দাসী।
হাজার সোয়ার সাথ হামরাই নিশানাথ
আনন্দিত কবি গুণরাশি॥
কন্যা কোলে করি রাণী কহিলা গদ্গদ বাণী
তুমি রাজলক্ষ্মী ছিলা মাতা।
ছাড়িয়া চলিলা দেশ বুঝি পরমায়ুঃ শেষ
ভূপতিকে বিমুখ বিধাতা॥
পতিপ্রাণা শাস্ত্রে উক্তি তোমা বুঝাবার শক্তি
ভূমণ্ডলে আর কারু নাই॥
কিন্তু ব্যবহার আছে তেঁই গো তোমার কাছে
গোটা দুই কথা বাছা কই॥
পুরে গুরুলোক যত তাহা সবাকার মত
হবে রবে মানায়্যে সেবায়।

দয়া পরিজন প্রতি যার থাকে গুণবতী
সেই সে গৃহিণীপদ পায়॥
জনকজননীপদ ধরি করে গদগদ
কহে বিদ্যা সজলনয়নে।
এই তুমি জন্মদাতা নিকটে বটেন মাতা
দুঃখিনীরে যেন থাকে মনে॥
সুন্দর সুন্দর নাম দেবীপুত্র গুণধাম
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে সুখে।
দশদণ্ড মাত্র দিবা দম্পতী স্মরিয়া শিবা
রথে উঠে চলে দেশমুখে॥
গ্রামবাসী যত লোক সকলের মহাশোক
সখীচয় চিত্রিত পুতুলি।
শোকে বুক নাহি বান্ধে রাজা রাণী দোঁহে কান্দে
কলেবর ধূসরিতধূলি॥
দশ দিবসের পথ দশ দণ্ডে যায় রথ
ত্বরা করে গুণের গরিমা।
বিদ্যা কহে প্রভু ক্রোধ ত্যজ দেখি জন্ম শোধ
জনকের অধিকারসীমা॥
এড়াইল দেশ নানা দূরে স্বাধিকার থানা
মনে মনে পরম কৌতুক।
ত্বরাতে নাহিক কায সারথিরে যুবরাজ
কহে রথ রাখ একটুক॥
ধন হেতু মহাকুল পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।

দানশীল দয়াবন্ত শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত
প্রসন্না কালিকা কৃপামই॥
সেই বংশসমুদ্ভব পুরুষার্থ কত কব
ছিলা কত কত মহাশয়।
অনচির দিনান্তর জন্মিলেন রামেশ্বর
দেবীপুত্র সরলহৃদয়॥
তদঙ্গজ রামরাম মহাকবি গুণধাম
সদা যারে সদয়া অভয়া।
তদঙ্গজ এ প্রসাদে কহে কালিকার পদে
কৃপাময়ি ময়ি কুরু দয়া॥

সুন্দরকে আনয়নার্থ পিতামাতার প্রত্যুদ্গমন।

অধিকারে উপনীত গুণসিন্ধুসুত।
শীঘ্রগতি নিজ পুরে পাঠাইলা দূত॥
দূতমুখে নরপতি শুনি শুভ ভাষ।
মৃত যেন পুনরপি পায় জীবন্যাস॥
আনন্দের ওর নাহি বাহু তুলি নাচে।
অমান উঠিয়া গেল মহিষীর কাছে॥
হাসি কহে কি কর কি কর ভাগ্যবতী।
পুত্রবধূ দেখ গিয়ে উট শীঘ্রগতি॥
রাণী বলে প্রভু তুমি কি কহিলে কথা।
সুন্দর গুণের নিধি বাছা মোর কোথা॥
আর কি এমন দিন আমার হইবে।
চাঁদমুখে মা কথাটি সুন্দর কহিবে॥

পুরবাসী সহ রাজরাণী রথে উঠে।
বাল বৃদ্ধ যুবা লোক পিছে পিছে ছুটে॥
সৈন্যকোলাহল শব্দে কর্ণে লাগে তালী।
কাড়া সঙ্গে রঙ্গে চলে লক্ষ লক্ষ ঢালী॥
প্রথমতঃ সাজিল হাবেসি যোড় যোড়া।
লস্করের আগে যায় নাচাইয়া ঘোড়া॥
ঘন ঘন ডঙ্কা শঙ্কা রিপু চমকিত।
উড়িছে পতাকা সিতাসিত রক্ত পীত॥
কটকের পদভরে কম্পিত মেদিনী।
ফুকারে নকিব জয় করালবদনী॥
স্বগৃহে শয়নে সুখে ছিল মহাপাত্র।
উঠে ছুটে চলিল সংবাদ পাবামাত্র॥
পথ করে পরিষ্কার চিতে কুতূহলী।
দোধারি রোপিল চারু শ্রীরামকদলী॥
আম্রশাখাযুক্ত বারিপূর্ণ স্বর্ণঘট।
শীঘ্র করে স্থাপনা শ্রীগৃহ সন্নিকট॥
পিতামাতা দেখি কবি নামি ভূমিতলে।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বস্ত্র দিয়া গলে॥
সন্তোষসাগরমধ্যে ভাসে রাজারাণী।
পুত্র কোলে করে দোঁহে প্রসারিয়া পাণি॥
সে সময় যত সুখ কথায় কে কবে।
সহস্র বদন হয় কৈতে পারে তবে॥
দ্বিগুণ উথলে প্রেম নিরখিয়া বধূ।
সঘনে চুম্বতি রাণী মুখরাকাবিধু॥

শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

বিদ্যাকে দর্শনার্থ নারীগণের আগমন।

মঙ্গলাচরণে কুলাচার যত ছিল।
পুত্রবধূ নিয়া নিজ গৃহে প্রবেশিল॥
গুণসিন্ধু দয়াসিন্ধু কল্পতরুরূপ।
রতনভাণ্ডার বিতরণ করে ভূপ॥
ভাঙ্গিল নগর কেহ ঘরে নাহি রহে।
পরস্পর সকলে সকল বার্ত্তা কহে॥
উপনীত ক্রমে ক্রমে দ্বিজপত্নীগণ।
জনে জনে দিলা রাণী রত্নসিংহাসন॥
আসন থাকুক আগে এসে শুন রাণী।
বধূ তব কেমন দেখাও দেখি আনি॥
কুতূহলী পদধূলি শিরে বান্ধে সতী।
সকলে কহেন বাছা হও পুত্রবতী॥
করে ধরে টেনে নিয়া বসায় নিকটে।
হাসি হাসি কহে ঘরভরা বউ বটে॥
কোন রামা বলে বুঝি পাঁচ মাস পেট।
মরমে লজ্জিতা ধনী মাথা করে হেঁট॥
মুখফোঁড়া মেয়ে বলে হেদে কি জঞ্জাল।
আইবড় বাপঘরে ছিল এতকাল॥
বয়োধিকা কেহ কহে ব্রাহ্মণবনিতা।
এ মেয়ে সামান্য নহে পরম পণ্ডিতা॥

পণ ছিল শাস্ত্রে যেবা করে পরাভব ।
তারে দিবে বালা মালা সেই হবে বর ॥
নিরখিয়া নববধূ দ্বিজবধূচয় ।
সকলে সদনে গেলা সদয়হৃদয় ॥
জগদীশ্বরীকে কৃপা কর মহামায়া ।
মমানুজ বিশ্বনাথে দেহ পদছায়া ॥
যে গাওয়ায় যেবা গায় তাহার মঙ্গল ।
নায়ক সহিতে শিবা করহ কুশল ॥
কন্যা দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে ।
আমি কি অধম এত বৈমুখ আমারে ॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব ।
কহিবার কথা নহে বিশেষ কি কব ॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ি ।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

সুন্দরের স্বরাজ্যাভিষেক

নৃপ শুভক্ষণে রত্নসিংহাসনে
পুত্রে করে অভিষেক ।
ধরে ছত্রদণ্ড সুখী রাজ্যখণ্ড
সম্মত প্রজা যতেক ॥
বামেতে মহিষী পরম রূপসী
গৌড়াধিকারিদুহিতা ।
মনে বাসি হেন রামচন্দ্র যেন
সঙ্গে শশিমুখী সীতা ॥

কবিরাজ রাজা পুত্র সম প্রজা
পালয়ে পূর্ণাভিলাষ।
ভূপ জরাগ্রস্ত দারা সহ ত্রস্ত
কৈলা বারাণসীবাস॥
বিদ্যাবতী সতী প্রসবে সন্ততি
মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী।
অভেদ সুন্দর রূপ মনোহর
যেমত শরদশশী॥
নিজ দেহছবি নিরখিয়া কবি
তনয়তনু নেহালে।
মন্দ মন্দ হাসে এই মনে বাসে
যেন দীপে দীপ জ্বলে॥
করে বিতরণ রতন বসন
কুঞ্জর ঘোটক ধেনু।
মহা কুতূহলী শিরে দিল তুলি
লক্ষদ্বিজপদরেণু॥
জাতদিনাবধি কুলাচারবিধি
করে কবি গুণধাম।
ষষ্ঠ মাসে মুখে অন্ন দিল সুখে
পদ্মনাভ রাখে নাম॥
পঞ্চম বৎসরে কর্ণবেধ করে
বিদ্যারম্ভ শুভ দিনে।
সপ্তদিন মাত্র লেখে তালপত্র
পঞ্চাশত বর্ণ চিনে॥

বালক ত্বরায় ব্যাকরণ সায়
ভট্টি অভিধান গণ।
রঘুকুমারাদি সাঙ্গ হল যদি
অলঙ্কারে দিল মন॥
কৃপান্বিতা চণ্ডী পাঠ করে দণ্ডী
তদনু কাব্য প্রকাশে।
ন্যায়শাস্ত্রে ঘূণ কত কব গুণ
কবিচিত্তে মহোল্লাসে॥
জ্যোতিষ পিঙ্গল সাঙ্খ্য পাতঞ্জল
মীমাংসা বেদান্ত তন্ত্র।
কোন ক্ষোভ নাই জননীর ঠাঁই
নিল একাক্ষরী মন্ত্র॥
যেমন জনক তেমন বালক
উভয়ত মহাকবি।
কালীপদতলে শ্রীপ্রসাদে বলে
ভবে ত্রাণ কর দেবি॥

সুন্দরের দক্ষিণকালিকামূর্ত্তি সংস্থাপন

ক্রমে ক্রমে বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বর্ষ।
জনকজননীচিত্তে জন্মে মহা হর্ষ॥
বিবাহ দিলেন কুলে তুল্য রাজকন্যা।
রূপবতী গুণবতী ধরাতলে ধন্যা॥
কতকাল গৌণে মনে জন্মিল ভাবনা।
পুরিমধ্যে থাকে ইষ্টদেবতা স্থাপনা॥

গাঁথিল দেউল উচ্চ স্পর্শে বিষ্ণুপদ।
চতুর্দ্দিকে পুষ্পোদ্যান সন্নিকটে হ্রদ॥
পাষাণে নির্ম্মাণ কৈল কালিকা দক্ষিণা।
শবারূঢ়া মুক্তকেশী বসনবিহীনা॥
মুণ্ডমালাবিভূষণা খড়্গামুণ্ডধরা।
যাম্যে বরাভয় ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা॥
অসংখ্য মহিষ মেষ ছাগ নানা বলি।
কনকচম্পক দিল চরণে অঞ্জলি॥
উপহার দ্রব্যভার সীমা কব কত।
স্তূপ স্তূপ পর্ব্বত প্রমাণে শ্রদ্ধামত॥
তথাপিও কদাচ প্রসন্ন নহে চিত্ত।
শব সাধনার্থে খেদ করে নিত্য নিত্য॥
প্রযত্নে সঙ্গতি করে চণ্ডালের শব।
সাধকেন্দ্র সুন্দর সাহস অসম্ভব॥
ভৌমবারযুতা কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী নিশি।
শ্মশানে চলিলা সঙ্গে মহিষী রূপসী॥
বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিলে সমস্ত।
গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হব ব্যস্ত॥
জ্ঞাত নহি বলে কেহ না করিবা হেলা।
বিষম বিষয় কালসর্প নিয়া খেলা॥
স্বকীয় কল্যাণ কিন্তু চিন্তা করা চাই।
ভঙ্গীতে সঙ্খেপে কিছু কিছু কয়ে যাই॥
অকর্ত্তব্য হেতু কত ব্যতিক্রম হবে।
আগমজ্ঞ কেহ কোন দোষ নাহি লবে॥

শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

শব সাধন।

পূর্ব্ব উক্ত স্থানে গেল কবি শীঘ্রগতি।
সামান্যার্ঘ্যে সুবিধান করে মহামতি॥
যাগভূমি প্রদক্ষিণ পাঠ করে মন্ত্র।
সুন্দর সুধীর জ্ঞাত যাবতীয় যন্ত্র॥
গুরুদেব গণপতি বটুক যোগিনী।
পূর্ব্বদিগ ক্রমে পূজে কবিশিরোমণি॥
বীরার্দ্দন মন্ত্র কবি লিখিল ভূতলে।
যে চাত্র বচন কহে মহা কুতুহলে॥
পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দিয়া করে প্রণিপাত।
পূর্ব্ব উক্ত ক্রমে বলি দিল নরনাথ॥
অঘোর মন্ত্রেতে শিখা বান্ধে ততক্ষণ।
সুদর্শন মন্ত্র করে হৃদয় রক্ষণ॥
ভূতশুদ্ধিন্যাস সারে ত্বরায় ত্বরায়।
জয়দুর্গা মন্ত্রে দিক্ষু সর্ষপ ছড়ায়॥
তিলোঽসীতি মন্ত্রে তিল ফেলে সেইরূপ।
তদন্তরে শবের নিকটে গেল ভূপ॥
শবের লক্ষণ কহি শুন ধীরজন।
আছে যে প্রকার তন্ত্রসারের বচন॥
শূলে খড়্গে বজ্রে সর্পাঘাতে কি কুমন্ত্রে।
যষ্টি বিদ্ধ জলে মৃত গ্রাহ্য উক্ত তন্ত্রে॥

কিন্তু যে সে ঘায় মরে না লবে সে শব।
বলেছেন গোবিপ্র স্ত্রীরূপা গ্রাহ্য ভব॥
সম্মুখ সংগ্রামমধ্যে নষ্ট যে শরীর।
সে শব প্রশস্ত লবে হবে যেবা ধীর॥
সর্ব্বদা না লবে ভাই শব পর্য্যুষিত।
শাস্ত্রমত কর্ম্ম করে যেজন পণ্ডিত॥
মূলমন্ত্র পাঠ করে পূজাস্থানে নিল।
উক্ত মন্ত্রে সুকৌতুকে জলবিন্দু দিল॥
পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দিয়া পুনশ্চ প্রণাম।
বিবেশেতি মন্ত্র পাঠ করে গুণধাম॥
ক্ষালন প্রশস্ত শব সুবাসিত জলে।
নববস্ত্রে পরিষ্কার কৈল কুতূহলে॥
ধূপেন ধূপিতং কৃত্বা গ্রন্থের বচন।
সেইমত চন্দনাদি করিল লেপন॥
রক্ত আভা হয় যদি চন্দন লেপিতে।
শবে করে ভক্ষণ সাধকে আচম্বিতে॥
নিজ করে যত্নে ধরে শবকটিদেশ।
পূজাস্থানে নিল মহাসুবুদ্ধি নরেশ॥
ততঃপরে কুশশয্যা করে গুণনিধি।
পূর্ব্বশির রাখে শব আছে যেবা বিধি॥
এলাইচ লবঙ্গ কর্পূর জায়ফল।
তাম্বুলাদি শবমুখে দিলেক সকল॥
পুনরপি সেই শব করে অধোমুখ।
তৎপৃষ্ঠে চন্দনে লিখে চিত্তে মহাসুখ॥

বাহুমূল কটিদেশ পরিমাণ তার।
চতুরস্র মধ্যে তাহে পদ্ম চতুর্দ্বার॥
দলাষ্টক সমন্বিত মধ্যে পৃষ্ঠে মন্ত্র।
লিখে কবি তন্ত্রমত জ্ঞাত মন্ত্র যন্ত্র॥
নিবেদন যাবতীয় পণ্ডিত নিকটে।
ভিন্ন তন্ত্রে কিন্তু এই কথা ব্যক্ত বটে॥
উপদ্রব যদ্যপি জন্মায় যত্ন করে।
নিষ্ঠীবন দিবে শবে কটিদেশ ধরে॥
তদুপরি রক্তকম্বলাদি দিব্যাসন।
শীঘ্রগতি করে পুনরপি প্রক্ষালন॥
যজ্ঞকাষ্ঠ দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমাণ।
দশদিক্ষু পূর্ব্বমত রাখে স্থানেস্থান॥
ইন্দ্রাদি দেবতা পূজে স্বামিসম্বোধনে।
বিঘ্ন বিনাশন করে মহা সাবধানে॥
চতুঃষষ্টি ডাকিনী যোগিনীগণ যত।
সবাকার পূজা কৈল ভক্তিযুক্তনত॥
মূলমন্ত্রে শবানন পূজে মহাকবি।
ঘোটকারোহণ ক্রমে বৈসে যেন রবি॥
স্বকীয় চরণতলে দিল কুশাসন।
শবকেশ ধরে করে যুটিকাবন্ধন॥
গুরুদেব গণপতি দেবীকে প্রণাম।
ষড়ঙ্গন্যাসাদি যত কৈল প্রাণায়াম॥
ক্ষেপ করে দশদিক্ষু লোষ্ট্র বিবর্দ্ধনে।
তদন্তে সঙ্কল্প কৈল উল্লসিত মনে॥

অর্ঘ্যাদি স্থাপন করে শবযুটিকায়।
আসন পূজিয়া পীঠ পূজা কৈল তায়॥
তদন্তরে পুজে দেবী সুখে শক্তিরূপ।
শবমুখে কৌতুকে তর্পণ কৈল ভূপ॥
ততঃ শব তুলিলে সম্মুখে দাঁড়াইয়া।
বসোমে ভারতি মন্ত্র পড়ে হৃষ্ট হৈয়া॥
পট্টসূত্রে বান্ধে কবি যুগল চরণ।
শবপদতলে যন্ত্র লিখিল ত্রিকোণ॥
শবকরযুগ্মপার্শ্ব প্রযত্নে প্রসার্য্য।
তদুপরি কুশাসন রাখে যাহে কার্য্য॥
তদুপরি নিজ পদ নৃপতি নিধায়।
পুনঃ প্রাণায়ামে করে যুক্তিযুক্ত কায়॥
শিব শিবা গুরু ভাবে হৃদিমধ্যে দেবী।
মহাশঙ্খমালা জপ করে মহাকবি॥
করে আসি রূপসি মহিষী প্রেমময়ী।
কিছু দূর থাকি কহে মা ভৈঃ মা ভৈঃ॥
কহেন করুণাময়ী থাকি বিমানেতে।
দেহি মে কুঞ্জর বলি আশু ধরাপতে॥
দৈববাণী শুনি কহে কবি শিরোমণি।
অদ্য নহে দিনান্তরে দাস্যামি জননি॥
মহামায়া মহাতুষ্টা মহাকবি প্রতি।
বরং বৃণু! বরং বৃণু সঘনে ভারতী॥
নলিননয়নে নীর নিরখিয়া ইষ্ট।
প্রেমে পুলকিত প্রাণ পূর্ণ মনোভীষ্ট॥

ধরে ধরাধরপুত্রীপদ কবিবর।
ধরাতলে ধরাপতি ধূলায় ধূসর॥
সুন্দর সুস্বরে কহে সুধাধিক উক্তি।
দর্শনে তোমার মাগো চতুর্ব্বিধ মুক্তি॥
নাহি চাহি কুঞ্জরাদী বাজিরাজি রাজ্য।
জায়াপত্য দাসদাসী বাসি কিবা কার্য্য॥
মনোমম হংস পাদপদ্মে বিহরতু।
অঙ্গীকার কৈলা মাতা তথাস্তু তথাস্তু।
কলিকাল বিষম শুনহ শুদ্ধমতি।
সবেমাত্র হবে এক বর্ণ ভবিষ্যতি॥
ব্রাহ্মণে করিবে বেদবহিষ্কৃত কর্ম্ম।
অধর্ম্মণ্য রাজা হবে রাজ্য শূন্যধর্ম্ম॥
অষ্ট বর্ষে রমণীর জন্মিবে অপত্য।
মিথ্যা কথা বিনে লোক নাহি কবে সত্য॥
অবলা চঞ্চলা চলা মন্দ ফলা হবে।
ভ্রমে কেহ ঈশ্বরের নাম নাহি লবে॥
কলির চরিত্র সব কহিলাম এই।
শীঘ্র মৃত্যু হয় যার পুণ্যধাম সেই॥
সাবধানে শুন পুত্র সর্ব্ব কথা কহি।
শাপভ্রষ্ট তোমা দোঁহাকার জন্ম মহী॥
বিদ্যাবতী হারাবতী তুমি মালাধর।
মম পূজা প্রকাশার্থে হইয়াছ নর॥
শাপান্ত নিতান্ত পুত্র পূর্ণ বটে কাল।
পুনরপি স্বস্থানে করহ ঠাকুরাল॥

এত কহি কৈলাসশিখরে গেলা দেবী ।
মনে মনে আপনাকে শ্লাঘ্য মানে কবি ॥
লভিল উত্তমা সিদ্ধি ধরণীভূষণ ।
পুরমধ্যে তিন দিন রহে সঙ্গোপন ॥
সেই তিন দিবসেতে রহে কত জ্বালা ।
সঙ্গীত শ্রবণে সাধকেন্দ্র হয় কালা ॥
নৃত্য নিরীক্ষণে নেত্র নষ্ট এ কৌতুক ।
যদি কিছু বাক্য কহে তবে হয় মূক ॥
দেবতা থাকেন তার দেহে এক পক্ষ ।
অকর্ত্তব্য বিপ্রনিন্দা হবেক সপক্ষ ॥
এই সব সাধনে শিবত্ব পায় নর ।
ঈশ্বরীকে কহিলেন আপনি ঈশ্বর ॥
শ্রীকবিরঞ্জনে মাতা হও কৃপাময়ি ।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

সুন্দরের স্বর্গারোহণ ।

চতুর্থ দিবসে কবি সিংহাসনে ধীর ।
বিরাজিত তেজোময় যেমত মিহির ॥
কুলপুরোহিত ডাকে মহাহর্ষযুক্ত ।
নিজ রাজ্যে নিজ পুত্রে করে অভিষিক্ত ॥
বিরলে বালক প্রতি কহে রাজনীত ।
শিশু কিন্তু সর্ব্বকার্য্যে বড়হ পণ্ডিত ॥
আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম তেকারণে কহি ।
এইরূপে পালন করহ সুখে মহী ॥

পরস্ত্রী জননী তুল্য থাকে যেন মনে।
কদাচ না লোভ যেন হয় পরধনে॥
একান্ত বিহিত নহে মানি-মান-ভঙ্গ।
সর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট তবে যাবে নীচসঙ্গ॥
নিরন্তর থাকা ভাল রিপু সঙ্গে শৌর্য্য।
সম্পদে বিনয়ী হবে বিপদেতে ধৈর্য্য॥
ব্রাহ্মণ মামকী তনু ঈশ্বরাজ্ঞা বটে।
সাবধানে রবে ধরামর সন্নিকটে॥
ভবানী শঙ্কর বিষ্ণু এক ব্রহ্ম তিন।
ভেদ করে সেই মূঢ় জন প্রজ্ঞাহীন॥
গুরুমন্ত্র ইষ্টদেব পরমায়ু ধর্ম্ম।
ব্যক্ত করা মত নহে এ সকল কর্ম্ম॥
গুরু আজ্ঞা বিনা শিক্ষাগুরু করে যে।
গুরু ত্যাগে যে পাপ সে পাপ লভে সে॥
অবচ্ছেদাবচ্ছেদে যে যায় যথা তথা।
সেই মন্ত্রে কদাচ না কবে গুহ্য কথা॥
পদ্মনাভ কহে এ কথায় কিবা লাভ।
বুঝিতে না পারি মহাশয় তব ভাব॥
পুনরপি কবিবর সবিশেষ কহে।
শুনি শিশু শোকে বুকে অশ্রুধারা বহে॥
পর্ব্বতের আড়ে পিতা আছি এত কাল।
এত শীঘ্র ছাড়ি বাবা একি ঠাকুরাল॥
এককালে পিতামাতা বিয়োগ যাহার।
পৃথিবীতে জীয়া সুখ কি ছার তাহার॥

পুনঃ কহে সুন্দর নৃপতি বিচক্ষণ।
অদ্য বাব্দশতান্তে বা নিতান্ত মরণ॥
কার মাতা কার পিতা কার অধিকার।
বেদিয়ার বাজি প্রায় অনিত্য সংসার॥
মান্ধাতা প্রভৃতি যত ত্যজিয়াছে দেহ।
ভূমণ্ডলে পুত্র চিরজীবী নহে কেহ॥
কালক্রমে কহ কে কালের নহে বশ।
জ্ঞানী তুমি খেদ কর এত বড় রস॥
কালীপদ সার কর জপ কালীনাম।
পরলোকে গমন না হবে যমধাম॥
কতমত কহে পুরাণের কথা নানা।
বহু যত্নে করে কবি তনয়ে সান্ত্বনা॥
পদ্মনাভ বিদ্যায় হইল যে যে কথা।
কহা নাহি যায় তাহা মর্ম্মে লাগে ব্যথা॥
সেই দিন রহে রাজারাণী উপবাসী।
প্রাতঃস্নান করে গুণবতী গুণরাশি॥
দেবীপুরমধ্যে চারু বিল্ববৃক্ষতলে।
যোগাসনে দোঁহে তথা বৈসে কুতূহলে॥
হৃদাহ্লাদে দক্ষিণকালিকা করে ধ্যান।
যোগবলে এককালে দোঁহে ত্যজে প্রাণ॥
ধরে অপরূপ পূর্ব্ব রূপকলেবর।
আছিল যেমন হারাবতী মালাধর॥
ভক্ত সঙ্গে রঙ্গে মাতা চলিলা বিমানে।
মুহূর্ত্তেকে উপনীত শিবসন্নিধানে॥

রত্নসিংহাসনমাঝে পার্ব্বতীশঙ্কর।
মালাধর হারাবতী ঢুলায় চামর॥
জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ভবানী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী দেবী।
যার পাদপদ্ম আমি রাত্রিদিবা সেবি॥
ভগ্নীপতি ধীর লক্ষ্মীনারায়ণ দাস।
পরম বৈষ্ণব কলিকাতায় নিবাস॥
ভাগিনের যুগ্ম জগন্নাথ কৃপারাম।
আমাকে একান্ত ভক্তি সর্ব্বগুণধাম॥
সর্ব্বাগ্রজ ভগ্নী বটে শ্রীমতী অম্বিকা।
তার দুঃখ দূর কর জননী কালিকা॥
গুণনিধি নিধিরাম বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।
তারে কৃপাদৃষ্টি কর মাতা নগজাত॥
জগদীশ্বরীকে দয়া কর মহামায়া।
মমানুজ বিশ্বনাথে দেহ পদছায়া॥
শ্রীকবিরঞ্জনে মাতা কহে কৃতাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলালে মাগো দেহ পদধূলি॥

অষ্টমঙ্গলা।

নমো বিশ্ববিভাবিনী দক্ষযজ্ঞ বিনাশিনী
জনমিলা পর্ব্বতেশঘরে।
কার্ত্তিকেয় জন্ম হেতু ভস্মরাশি মীনকেতু
তদবধি অনঙ্গাখ্যা ধরে॥
দুরন্ত মহিষাসুর তার দর্প কৈলা চুর
লীলায় হইলা দশভুজা।

মহিষমর্দ্দিনী নাম সেতুবন্ধে প্রভু রাম
প্রকাশিলা শারদীয়া পূজা ॥
শুম্ভ নিশুম্ভের গর্ব্ব সম্মুখ সমরে খর্ব্ব
শক্তি লভে সুরথ সমাধি।
ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা জন্মজরা মৃত্যুহরা
তব তত্ত্ব না জানেন বিধি ॥
বিধি হরি ত্রিলোচনে মহাকালী দরশনে
গতমাত্র প্রথমতঃ মায়া।
শেষ জন্ম কৃপালেশ গত যাবতীয় ক্লেশ
দিলা পদসরসিজচ্ছায়া ॥
নৃপতি বিক্রমাদিত্য তোমা-পূজে নিত্য নিত্য
লভিল রমণী ভানুমতী।
তুমি আদ্যাশক্তি শিবা মূঢ়মতি জানি কিবা
কৃপাময়ি অগতির গতি ॥
মালাধর হারাবতী শাপে জন্ম বসুমতি
ব্রতকথা জগতে প্রচার।
কালক্রমে ত্যজি প্রাণ পুনরপি পরিত্রাণ
কেবা বুঝে চরিত্র তোমার ॥
ধন হেতু মহাকুল পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত
প্রসন্না কালিকা কৃপামই ॥
সেই বংশে সমুদ্ভব পুরুষার্থ কত কব
ছিলা কত কত মহাশয়।

অনচির দিনান্তর জন্মিলেন রামেশ্বর
দেবীপুত্র সরলহৃদয়॥
তদঙ্গজ রামরাম মহাকবি গুণধাম
সদা যারে সদয়া অভয়া।
তদঙ্গজ এ প্রসাদে কহে কালিকার পদে
কৃপাময়ি ময়ি কুরু দয়া॥

সম্পূর্ণ

বিদ্যাসুন্দর।

টীকা।

গণেশ বন্দনা।

(১—২ পৃঃ)

পরমপুরুষ প্রহুঁ—(প্রহুঁ=প্রভু) আদিপুরুষ। ভারত চন্দ্র বলিয়াছেন,—

"গণেশায় নমোনমঃ আদি ব্রহ্ম নিরূপম
পরম পুরুষ পরাৎপর।"

(অন্নদামঙ্গলের টীকা ৩ পৃঃ দেখ)

বেদবিদাম্বর—বেদবিদাং+বর, অর্থাৎ বেদবিদ্‌দিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। (অলুক্ সমাস)

অণু—গণেশের দেহ এরূপ জ্যোতিবিশিষ্ট যে, তাহার তুলনায় প্রাতঃ সূর্য্যের হেম আভাও অতি সামান্য। অণু—অতি সামান্য অংশ।

অদিতি অঙ্গজ—ব্রহ্মার মানসপুত্র দক্ষ প্রজাপতি প্রসূতির গর্ভে চতুর্দ্দশ কন্যা উৎপাদন করেন। তাহাদিগের মধ্যে দিতি, অদিতি, প্রভৃতি ত্রয়োদশটীকে কশ্যপ মুনি বিবাহ করেন। এই দিতির গর্ভে দৈত্যগণ এবং অদিতির গর্ভে দেবতাগণ উৎপন্ন হন। গণপতি এই সব দেবতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই জন্য এবং বিশেষতঃ ভগবতীর বরে,—

পূজা হোম যোগ যাগে, তোমার অর্চ্চনা আগে,

আখু—ইন্দুর ।

জনে যদি...অধিকার—ভারতচন্দ্র বলিয়াছেন,

তব নাম লয় যেই, আপদ এড়ায় সেই
তুমি দাতা চতুর্বর্গ দানে ।”

শিবকর্ম্ম—মঙ্গল কর্ম্ম ।

বঞ্চিত সংস্কার—শাস্ত্রমতে প্রত্যেক লোককেই সংস্কারের দ্বারা শুদ্ধ হইতে হয়। গর্ভাধান হইতে বিবাহ পর্য্যন্ত দ্বিজদিগের সর্ব্বসুদ্ধ দশ প্রকার সংস্কার আছে। এস্থলে শাস্ত্রজ্ঞানবর্জ্জিত শিশুমতি এইরূপ অর্থ হইতেছে।

সরস্বতী বন্দনা।

(২—৩ পৃঃ)

মহাবিদ্যা।—ব্রহ্মের সৃষ্টি শক্তিকেই প্রকৃতি বলে। ইহার আর এক নাম মায়া। যখন এই মায়া দ্বারা জীব আবদ্ধ হয়, তখন ইহাকে অবিদ্যা বলে—আর যাহা দ্বারা এই অবিদ্যা দূর হয়, প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ বুঝা যায়, তাহাই বিদ্যা। এস্থলে সরস্বতীকে সেই বিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা হইতেছে। ভারত বলিয়াছেন।

“ তুমি দেবী প্রকৃতি প্রধান ।”

বিদ্যারূপা ব্রহ্মাণ্ড জননী—শাস্ত্রমতে, ব্রহ্মের সৃষ্টিশক্তি বা পরা প্রকৃতি হইতেই এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। পরাপ্রকৃতি যতক্ষণ পুরুষের অত্যন্ত নিকটে থাকে, ততক্ষণ তাহার কোন বিকার থাকে না। কিন্তু তাহা হইতে একটু দূরে যাইলেই তাহার বিকার আরম্ভ হয়। তাহার সাম্যাবস্থা গিয়া সত্ব, রজঃ ও তম গুণ উৎপন্ন হয় এবং প্রথমে মহত্তত্ব সৃষ্টি হয়। ইহার মধ্যে রাজসিক মহত্তত্বই সৃষ্টিশক্তি ও তদাধার চৈতন্য। ইহা হইতেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি। শাস্ত্রে এই সৃষ্টিশক্তিকে সরস্বতী ও তাহার আধার চৈতন্যকে ব্রহ্মা বলা হইয়াছে। যথা,—

"রজো গুণাধিকা বিদ্যা জ্ঞেয়া বৈ সা সরস্বতী।
যচ্চিৎ স্বরূপা ভবতি ব্রহ্মাতদুপাধায়িকা॥
শিবসংহিতা। ১।৮২

অর্থাৎ প্রকৃতির রজোগুণাধিকা বিদ্যাকেই সরস্বতী আর তাহার আধার চৈতন্যকেই ব্রহ্মা বলে।

হংসবধূ—হংসের বা পরব্রহ্মের আদি সৃষ্টি শক্তি—প্রকৃতি। অর্থাৎ হৃদিপদ্মে বা অনাহতচক্রে আদি শক্তি রূপে সর্ব্বদা আমার নিকট প্রকাশিত থাক।

ন বিদ্যা সঙ্গীত পর—সঙ্গীতই সমস্ত সুকুমার বিদ্যা মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহাই চৌষট্টি কলা বিদ্যা মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। শাস্ত্রমতে,

"সঙ্গীত সাহিত্য রসানভিজ্ঞঃ—
খ্যাতঃ পশুঃ পূচ্ছ বিষাণ শূন্যঃ।"

যে গানে ত্রিপুর হয়…চক্রপাণি—ভারত বলিয়াছেন,

"মহাদেব এককালে, পঞ্চমুখে পঞ্চতালে,
গীতে তুষ্টা কৈলা ভগবানে।
নারায়ণ দ্রব হৈলা বিধি কমণ্ডলে লৈলা
বেদব্যাস বর্ণিলা পুরাণে॥"

(ইহার পৌরাণিক বিবরণ অন্নদামঙ্গলের টীকায় দেখ)

সুতুঙ্গ ভঙ্গা—অতি উচ্চ বা সুবিশাল তরঙ্গভঙ্গী বিশিষ্ট। ভঙ্গা ও ইংরাজী Breaker একার্থবাচক।

তব কৃপা দৃষ্টি যারে…ধন্য—ভারত বলিয়াছেন,

"তোমার করুণা যারে সবে ধন্য বলে তারে
গুণিগণে তাহার গণন।"

ব্যাস…প্রজ্ঞাবান—ঘনরাম বলিয়াছেন,

তোমার চরণ দেবি আদরে একান্ত সেবি
মহাকবি ব্যাস আদি যত।
মোক্ষদ পাতক অন্ত প্রকাশিলা নানা গ্রন্থ
বেদাঙ্গ পুরাণ ভক্তি মত॥

লক্ষ্মীর বন্দনা।

(৩-৪ পৃঃ)

কমলে কমলা—রক্তপদ্মোপরি আসীনা লক্ষ্মী—লক্ষ্মীই কমলালয়-বাসিনী।

কোমল—মাধুর্য্যময়। লক্ষ্মীই সর্ব্বাপেক্ষা রূপবতী। শ্রীর অর্থই লক্ষ্মী। এই জন্য কথায় বলে, "রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী।" ভারত এক স্থলে বলিয়াছেন,

"রূপবতী লক্ষ্মী গুণবতী বাণী লো।
রূপেতে লক্ষ্মীর বশ চক্রপাণি লো॥"

মঞ্জুল মঞ্জীর—মনোহর নূপুর।

কমলে কমলা...মঞ্জীর—ভারত বলিয়াছেন,

" কমল চরণ, কমল বদন,
কমল নাভি গভীর।
কমল দুকর, কমল অধর,
কমলময় শরীর॥ "

ডমরু সুচারু—ডম্বুরের ন্যায় কটি দেশ অতি ক্ষীণ। ভারত বলিয়াছেন,

" কত সরু ডমরু কেশরী মধ্যথান। " ইত্যাদি।

কান্তি মধ্যে...লোক—বুকের মাঝে যে ঈষৎ রোম রেখা থাকে, তাহাকে নদীর সহিত, এবং স্তন দুটীকে চক্রবাক্ ও চক্রবাকীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। রাত্রে যেমন বিরহ-বিধুরা চক্রবাক্ চক্রবাকী নদীর দুই পারে থাকে—সেইরূপ লোমাবলীরূপ সৌন্দর্য্যের নদীর দুই ধারে চক্রবাক্ চক্রবাকী রূপ দুইটী স্তন রহিয়াছে।

কোক—চক্রবাক্।

বিস—মৃণাল।

পঙ্কে...তনু—মৃণাল ত পঙ্কে বাস করে, সে কি দেবীর সরল

বাহুযুগলের কণামাত্র সমতুল হইতে পারে? এই জন্য সে ভাবিয়া ভাবিয়া কৃশ হইয়া জলে গিয়া বাস করিল।

বেসোর—নাকের আভরণবিশেষ। এ স্থলে বেসোরকে চকোর, ও মুখকে পূর্ণ চন্দ্রের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

জিনিয়া ...মনোলোভা—অর্থাৎ রক্তবর্ণ ওষ্ঠের আভা দন্তে লাগিয়া দন্ত যেরূপ ঈষৎ রক্তাভ হইয়াছে, তাহার সহিত ঈষৎ রক্তবর্ণ মুক্তার তুলনা দেওয়া যায় না। তেলাকুঁচা বা বান্ধুলীর ন্যায় রক্তবর্ণ ওষ্ঠ। ভারত বিদ্যার রূপ বর্ণনা স্থলে বলিয়াছেন—

"কি কাজ সিন্দুরে মাজি মুকুতার হার।
ভুলায় তকের পাঁতি দন্ত পাঁতি তার॥"

মনোহর মনোহরা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ—কমলা দেবীর সেই আকর্ণ-বিশ্রান্ত অঞ্জনরঞ্জিত খঞ্জনগঞ্জন নয়নযুগল, ভুবনমনোহর নারায়ণেরও মনোহরণ করিতে সমর্থ। (অথবা এই নয়ন ব্যতীত আর সমস্ত মনোহর দ্রব্য ইহার তুলনায় অতি সামান্য মাত্র মনোহরণ করিতে পারে।

দরিদ্র দ্রবিণ আশা—দেবীর সুচারু কর্ণ গৃধিনীর কর্ণের ন্যায় সুন্দর ও পাতলা, তাহাতে সুদীর্ঘ কুণ্ডল দুলিতেছে। দরিদ্র ব্যক্তিরা, উহা এখনই কর্ণচ্যুত হইয়া পড়িবে, এবং তাহারাও তৎপ্রাপ্তিতে নিজ নিজ দারিদ্র্য দূর করিবে, এই আশায় আশান্বিত হইয়া রহিয়াছে। দ্রবিণ—স্বর্ণ।

সর্ব্ব গুণহীন...পূজ্য—কবি ঘনরাম বলিয়াছেন,

ভাগ্যবান ভারত ভুবনে সেই ধন্য।
লক্ষ্মীর চরণে যার ভকতি অগণ্য॥
সেই ধনী ধার্ম্মিক ধরণী মধ্যে বীর।
যার যার মন্দিরে কমলা হন স্থির॥
সমর সুধীর বীর স্থির মতিমন্ত।
গণনায় গায়ক গভীর গুণবন্ত॥
সেই হয় সুকৃতিসৎ সজ্জন সংসারে।
কৃপাবতী শ্রীমতী লক্ষ্মীর কৃপা যারে॥

তৃণতুল্য...গুণালয়—প্রকৃত গুণবান ব্যক্তি গুণহীন ধনী লোকের দ্বারস্থ থাকে—অথচ কেহই তাহাদিগকে উপযুক্ত সম্মান করে না।

স্বত্ব দানে······সাযুজ্য—ভক্তের মুক্তি চারি প্রকার—সাযুজ্য সারূপ্য, সামীপ্য ও সালোক্য। কলিতে এক মাত্র দানই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ধন থাকিলেই উপযুক্ত দান করা যায়। এবং এইরূপ বিত্ত বা ধনের বলে সত্ত দান করিয়া যে ধর্ম্ম সঞ্চিত হয়, তাহারই দ্বারা সাযুজ্যরূপ মোক্ষ লাভ করা যায়। অর্থাৎ পরমাত্মায় লীন হওয়া যায়।

যে গৃহী জনের...লেখা—কবি ঘনরাম বলিয়াছেন।

"লক্ষ্মী ছাড়া হইলে কত কুবুদ্ধি সংঘটে।
ঠক, ঠেটা, নাবড়, ছেবড় লোকে রটে॥
কুচক্রী চসম খোর, চোকল্‌খোর হয়।
পাপিষ্ঠ দুরন্ত সেই পুণ্যবন্ত নয়॥"

বিষম দারিদ্র্যদোষে গুণ রাশি নাশে—সংস্কৃত শ্লোক আছে

"দারিদ্র্য দোষ গুণরাশিনাশা।"

কবিকঙ্কণ বলিয়াছেন,—

"লক্ষ্মী থাকিলে মান সকল সংসারে।
লক্ষ্মীবান হইলে ভাই কেহ না আদরে॥
সে জন পণ্ডিত মাতা সেই জন ধীর।
যাহার মন্দিরে মাতা তুমি হও স্থির॥"

কালী বন্দনা।

(৪-৭ পৃঃ)

কলিকাল-কুঞ্জর-কেশরী—(কালস্বরূপ যে কলিকাল বা) কলি-কালরূপ মত্ত হস্তীকে বিনাশ করিবার একমাত্র সিংহস্বরূপ। সুধু এই কালীর নামের গুণেই কলিতে মুক্তি হয়।

কালকর···অসি বটে সেই—কালী নামের "ল কারের" শেষে

যে "ঈ"কার রহিয়াছে, তাহা কালের অসি স্বরূপ 'কালের' উপর ঈ'কার বা অসি পড়িয়া কাল ধ্বংশ হইয়াছে। সুতরাং কালী নামের দ্বারাই কলি নষ্ট হইবে, এবং ভববন্ধন ছিন্ন হইবে—এই রূপ মনে চিন্তা কর।

শ্রীনাথ…সারাৎসার—শ্রীনাথ এস্থলে অর্থ সদাশিব। কবিরঞ্জন অন্য স্থলেও এইরূপ বলিয়াছেন; যথা,—

"চারি ছয় দশ বার, ষোড়ষ দ্বিদল আর,
দশ শত দল শিরোপরে।
শ্রীনাথ বসতি তথা———————"

এস্থলে অর্থ,—"স্বয়ং শিব তন্ত্রে প্রকাশ করিয়াছেন যে, কালী নামই একমাত্র জীবের মোক্ষের হেতু।'

নাম নিত্যা…দূরে—যিনি মূল প্রকৃতি তিনি নিত্যকাল পরম পুরুষের সন্নিধানে থাকিয়া, তাঁহারই সান্নিধ্যজন্য সৃষ্টি প্রলয়াদি লীলাখেলা করিতেছেন। সহজ অর্থে বিশ্বপতি শিবের বক্ষস্থলে বিবসনা কালী নিত্যকাল বিহার করিতেছেন। রামপ্রসাদ অন্য স্থলে বলিয়াছেন।

"শ্যামা বামা কে বিরাজে ভবে।
বিপরীত ক্রীড়াব্রীড়াগত শবে॥"

নাম নিত্যা—রামপ্রসাদ অন্য স্থলে কালীকে বলিয়াছেন, "প্রণবরূপিনী'। পাতঞ্জল দর্শনে আছে "প্রণব স্তস্য স্বরূপং।" আসল কথা, চক্ষুর গ্রাহ্য কোনরূপ মৃত্তিকার প্রতিমা গড়িয়াই হউক-অথবা কর্ণ গ্রাহ্য কোন রূপ শব্দ দ্বারাই হউক প্রথমে ঈশ্বরকে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য করিয়া ধারণা করিতে হইবে— নতুবা সাধনা সম্ভব নহে।

কলেবর কিরণ…আলো—মায়ের রূপ কাল হইলেও তাহাতে বিশ্বের আঁধার দূর হয়। ভারত বলিয়াছেন;

"বিনা চন্দ্রানল রবি, প্রকাশি আপন ছবি,
অন্ধকার প্রকাশ করিলা।"

হেরি বপু—বিশাল বপুই বার্য্যের লক্ষণ।

ষাম্যে— দক্ষিণ হস্তে।

অপরূপ...যুগলে যুগলে—প্রসাদ আর এক স্থলে বলিয়াছেন,

ইন্দু শিশু শব সুশোভিত কর্ণে।

বামা আধা শশী ভালিনী॥

ধ্যানে আছে, — "নির্জীব কর্ণোৎপলাং।"

অকালে প্রলয় সৃষ্টি — মায়ের লীলাতেই সৃষ্টি ও সংহার হইতেছে—তাহার সময় অসময় কালাকাল নাই। যখন ইচ্ছা তখনই তিনি কোন না কোন ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতেছেন বা প্রলয় করিতেছেন। ব্রহ্মাণ্ড কোটী কোটী এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড লইয়াই মহাকালীর ক্রীড়া।

হত রথি...সকল — প্রসাদ অন্যত্র বলিয়াছেন,

রমণী সমর করে, ধরা কাঁপে পদভরে,

রথ রথী সারথী তুরঙ্গ গরাসে।

কলেবর মহাকাল, মহাকালে ঢাকে ভাল,

দিনকর কর ঢাকে চিকুর পরশে॥

* * * * *

নিরূপমা রূপছটা, ভেদ করে ব্রহ্মকটা,

প্রবল দনুজ ঘটা গিলে গরাসে॥

অন্যত্র,—একি চতুরানন হরি. কলয়তি শঙ্করি,

সম্বরণ কর রণ।

ফণিরাজ কম্পিত, সতত ত্রাসিত,

প্রলয়ের এই কি কারণ॥

ধন্যা দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে—কবিরঞ্জনের মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার স্ত্রী তাঁহা অপেক্ষা বেশী ভাগ্যবতী। কারণ কালী কখনও তাঁহাকে প্রত্যক্ষ হন নাই। কিন্তু তাঁহার স্ত্রীকে স্বপ্নে দেখা দিয়াছিলেন। এই জন্তই কতকটা ক্ষোভে, কতকটা অভিমানে কবিরঞ্জন এই রূপ বলিয়াছেন।

অষ্টরসাধার—নিম্নে বর্ণিত আট প্রকার রস বা ভাব মনে উদিত হয়।

গুণসদ্ম...অর্থাৎ, গুণের আধার বা গুণবান শ্রোতা। তখন

এ সমস্ত কবিতা রীতিমত আসর সাজাইয়া নায়কের দ্বারা গীত হইত। এ জন্য "শুন শুন সভাজন" এইরূপ সম্বোধন মধ্যে মধ্যে দৃষ্ট হয়।

বিলোকনে…যশ—মায়ের পাদপদ্ম দেখিলে ভিন্ন ভিন্ন চিত্তে যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উদয় হয়, তাহা বর্ণনা করা উপযুক্ত বটে—কেন না তাহাতে বর্ণনকারীর বাহাদুরী আছে—আর কবিও তাহা বর্ণনা করিতে পারিলে যশস্বী হইবেন।

জগদম্বা পাদপদ্ম দর্শনে যে যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উদয় হয়, তাহা কবি একে একে দেখাইতেছেন।

স্বকীয়…বিঘূর্ণিত আঁখি—(প্রথমতঃ) স্বয়ং মহাদেবই সেই পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিয়া (কালী মূর্ত্তিতে দেবী শিবের বক্ষোপরি বিরাজমানা) সেই ভাবে বিভোর হইয়া আছেন।

মহাকবি‥চরণে—(দ্বিতীয়ত) যিনি মহাকবি তিনি সে পাদ-পদ্ম দেখিয়া সাধারণ পদ্মকে ঘৃণা করেন—কেননা গুণ বিষয়ে তাহাও পাদপদ্মের সমতুল্য নহে।

দর্পে কহে…পরাজয়—(তৃতীয়তঃ) সে পাদ পদ্মের শোভা দেখিয়া মদন ভাবিলেন, আর আমার ভয় কি—যুদ্ধ বিগ্রহের আশঙ্কা আমার নাই। আমি ত সকলকেই জয় করিয়াছি, বাকি ছিলেন শিব—তাঁহার কাছেই কেবল আমার জারি ভাঙ্গিয়াছিল, কিন্তু এ পদের শোভা দেখিলে স্বয়ং শিবও যে মোহিত হইবেন, তখন তাহাকেও হারাইব। সুতরাং আমার নিজের পরাজয় ভাবনা সুদূরপরাহত।

চন্দ্রসূর্য্য‥নিরীক্ষণে—(চতুর্থতঃ) বিধুন্তুদ রাহু সে পদের তেজ দেখিয়া ভাবিল—এ আবার কোন নূতন চন্দ্র বা সূর্য্য জগতে উদয় হইল। অথচ তাহাকে গ্রাস করিতে না পারিয়া প্রবল শত্রু ভাবিয়া বড় ক্রোধযুক্ত হইল।

সতী…সুরবৃন্দ—(আর পঞ্চমতঃ) ভক্ত হৃদয়পদ্মে বা অনাহত চক্রে ভগবতীরূপে সে পাদপদ্ম ভাবিলে মন ভক্তিরসে আপ্লুত হয়—ভক্ত তাহাতে মজিয়া থাকেন। এবং তদ্দর্শনে ব্রহ্মা আদি দেবগণ চমৎকৃত ও স্তম্ভিত হন।

মহাভীতা ধরণী...পরিত্রাণ--(ষষ্ঠতঃ) পৃথিবী সে পদভর সহ্য করিতে না পারিয়া রসাতলে যাইবার উপক্রম হইয়াছে, সর্ব্বদা ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে। কবি অন্যত্রে বলিয়াছেন,—

কলিরাজ কম্পিত সতত ত্রাসিত
প্রলয়ের এই কি কারণ।

স্মেরমুখী সহচরীগণ···বিষাদ—(সপ্তমতঃ) হসন্মুখী বা সর্ব্বদা হাস্যবদনা জগদম্বার ডাকিনী যোগিণী প্রভৃতি সখীগণ সেই চরণ অনিমিষ লোচনে দেখিতে দেখিতে বিভোর হইয়া বিষাদবার্ত্তা ভুলিয়া গিয়া, মহা আহ্লাদিত হইয়া আছে।

ত্রিগুণজননী ... ··· গদ গদ —(অষ্টমতঃ) দেবীর পদ হইতেই ত্রিগুণের উৎপত্তি হইয়াছে, সুতরাং সেই ত্রিগুণ-জননী পাদপদ্মের বিষয় চিন্তা করিয়া ভক্তের মনে করুণা-সিন্ধু উথলিয়া উঠে।

ত্রিগুণজননী — ভারতচন্দ্র বলিয়াছেন,

"ত্রিগুণজননী পুন ত্রিদেবের জায়া।"

প্রসাদ অন্যত্র বলিয়াছেন,

"অনুচ্চার্য্যনাদিরূপা গুণাতীত গুণ।
নির্গুণে সগুণ কর প্রসব ত্রিগুণ॥"

শাস্ত্রমতে মূল প্রকৃতি বা আদি সৃষ্টি শক্তি হইতেই সত্ব, রজ, তমো গুণের উৎপত্তি হইয়াছে। এই জন্য মূল প্রকৃতিকেই ত্রিগুণের জননী বলে।

অন্নদামঙ্গলের টীকা দেখ।

এস্থলে কবি জগদম্বার পাদপদ্ম দেখিয়া ভিন্ন ভিন্ন চিত্তে যে বিভিন্ন ভাবেয় উদয় হয়, তাহা একে একে দেখাইলেন, কবি সঙ্কেতে শিবের মত্ততা, কবিরা ঘৃণা, মদনের দর্প, রাহুর ক্রোধ, সাধিকের ভক্তি, পৃথিবীর ভয়, নিজ সখিদিগের আনন্দ এবং ভক্তের করুণা এই আট প্রকার ভিন্ন ভিন্ন মনেভাবের বর্ণনা করিলেন।

বিদ্যার পাত্রান্বেষণে মাধব ভাটের কাঞ্চিপুর গমন।

(৭—১০ পৃঃ)

বিশেষতঃ বিদ্যালাপে জয়া—অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বিচারে বিদ্যাকে হারাইয়া দিবে, বিদ্যার এরূপ পণ্ডিত পতি হওয়া চাই। ভারতে আছে

"প্রতিজ্ঞা করিল সেই, বিচারে জিনিবে যেই,
পতি হবে সেই সে তাহার।"

সুধাসিন্ধু মধ্যে ভাসে—ভাট উপযুক্ত বর মিলাইতে পারিবে বলিয়া রাজা আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

প্রসাদেতে—রাজদত্ত পুরস্কার লাভে।

কাঞ্চিদেশ—এক্ষণে তাহাকে ইংরাজীতে কাঞ্জিভরম দেশ বলে।

কোটী—অর্থাৎ কুট বা জটিল বিষয়।

নিতান্ত বিদ্যার এই কান্ত—যে বিদ্যার পতি হইবে, তাহার একাধারে রূপ, গুণ, কুল, শীল সমস্ত থাকা চাই এবং তাহার কালীভক্তও হওয়া আবশ্যক। ধর্ম্মজ্ঞান না থাকিলে বিদ্যার সার্থকতা নাই। একাধারে এত গুণ-ভাট কেবল সুন্দরেই দেখিলেন, তাই তৎক্ষণাৎ বুঝিলেন যে এই বিদ্যার উপযুক্ত বর।

রায়বার—প্রেরকের অভিপ্রায় বিনীত ভাবে জানাইয়া, তাহার গুণগান করা।

কুর্ণিস্—সেলাম্, নমস্কার।

বিচ্ ডেরা—বর্দ্ধমানের মধ্যে বাসা।

তস্‌দিয়া—কষ্ট।

ওলেকেন ভুল গেয়া সব—কিন্তু এ সমস্ত কষ্ট আমি ভুলিয়া গিয়াছি।

থেলাপনা কহোঁ বাবু—বাবু সাহেব আমি মিথ্যা কথা কহিব না।

তোমনে ... কাবু—তুমি আমায় বশীভূত করিয়াছ।
মেই রোই—তোমায় দেখিয়া আমার আনন্দাশ্রু বহিয়াছিল।
দেওকে এওসে—তুমি যে দেবতাতুল্য, তাহা চিনিয়াছি।
সুরত যেয়সে—তোমার যেরূপ সৌন্দর্য্য।
দুনিয়ামে—পৃথিবীতে আপনি দেবানুগ্রহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।
মোকাবিলা—সমান, সমতুল্য।
জাতমে ... তাজা—ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে কুলে শ্রেষ্ঠ।
জেকের—প্রসঙ্গ, কীর্ত্তি।
সাদিকা ফেকের—বিবাহের চিন্তা।
কওল এত্না কি—এইরূপ পণ করিয়াছে।
শিকিমৎ—পরাস্ত, হারাইয়া দেওয়া।
তোমারা হোঁ, এসা জানো—আমি তোমারই একান্ত জানিও।
যো কহোঁ, সো কহা মানো—যা বলি তা মন দিয়া শুন।
বিবাহ হইল বাই—বিবাহে অত্যন্ত ইচ্ছা হইল। এস্থলে অনেকে, কেবল মাত্র ভাটের কথা শুনিয়াই, সুন্দরের একেবারে বিবাহেচ্ছা অসম্ভব বা অস্বাভাবিক মনে করেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। রূপজ মোহ এই রূপেই উৎপন্ন হয়। বিদ্যুৎবেগে তাহা মনোমধ্যে প্রবেশ করে এবং তীব্র বিষবৎ তাহা মনকে অভিভূত করে। অনেক হিন্দু কবিই এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। নলদময়ন্তীর কথা সকলেই জানেন। ভারতও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যথা,—

"ভাট মুখে শুনিয়া বিদ্যার সমাচার।
উথলিলা সুন্দরের সুখ পারাবার॥
বিদ্যার আকার ধ্যান বিদ্যা নাম জপ।
বিদ্যালাপ বিদ্যালাপ বিদ্যালাভ তপ॥
হায় বিদ্যা কোথা বিদ্যা কবে বিদ্যা পাব।
কি বিদ্যা প্রভাবে বিদ্যা বিদ্যমানে যাব॥"

ঘোরতর নিশি...স্বপন—এস্থলে রায় গুণাকর ও কবিরঞ্জনের বর্ণনায় কিছু পার্থক্য আছে। কবিরঞ্জন প্রথম হইতেই সুন্দরের চরিত্র সুন্দর করিয়াছেন। ধীরোদ্ধত নায়কের

যে সকল গুণ থাকা চাই, সমস্তই সুন্দরে আছে। তাহা ব্যতীত সুন্দর সাপভ্রষ্টা হইয়া কালী পূজা প্রচারার্থই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কবিরঞ্জন এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। পূর্ব্বজন্মে সুন্দর—মালাধর ও বিদ্যা—হারাবতী নামে অপ্সর ও অপ্সরা ছিলেন। এক স্থানে বলা হইয়াছে,

"শাপভ্রষ্টা জন্ম ধরা আমার সুন্দর।
মম পূজা প্রকাশিতে পৃথিবী ভিতর॥"

এই জন্যই কবিরঞ্জন প্রথম হইতেই সুন্দরকে কালীর অনুগৃহীতরূপে বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কালীর আদেশ ব্যতীত সুন্দর কোন কাজই করেন না। সেই জন্যই এ স্থলে যদিও ভাটমুখে বিদ্যার সমাচার শুনিয়া সুন্দর বিদ্যাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইলেন, কিন্তু তাঁহার মনে সে ইচ্ছা এত প্রবল হয় নাই যে, তাহা কার্য্যে পরিণত হইত। ভারতের সুন্দর ভাটের কথা শুনিয়াই, তখনি পিতা মাতাকে না বলিয়া, ভাটকে না জানাইয়া বর্দ্ধমান যাত্রা করিতে স্থির করিলেন,

"একা যাব বর্দ্ধমান করিয়া যতন।
যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন॥"

ভারতের সুন্দর আকাশবাণী শুনিয়াছিলেন বটে কিন্তু সে পরে। কবিরঞ্জন এরূপ বর্ণনা করেন নাই। তাঁহার সুন্দর ভাটের কথা শুনিয়া বিবাহার্থী হইলেন বটে, কিন্তু কোন উপায় স্থির করিলেন না। রাত্রে তাঁহার ইষ্টদেবী কালিকা তাহাকে বর্দ্ধমানে গিয়া বিদ্যালাভ করিতে আদেশ করিলেন, তাই সুন্দর সেই আদেশমত বর্দ্ধমান যাত্রা করেন।

"স্বপ্নে শৈলসুতা আজ্ঞা সত্য মনে বাসি।
জায়া হেতু যোগে যাত্রা করে গুণরাশি॥"

এবং পরে কি কি ঘটনা ঘটিবে ও কিরূপে সুন্দর বিদ্যালাভ করিবেন, তাহা কালিকাদেবী স্বয়ং এস্থলে বলিয়া দিলেন।

সুন্দরের বৰ্দ্ধমান যাত্রা।

(১০-১৩ পৃঃ।)

মাহেন্দ্র—মাহেন্দ্র যোগে যাত্রা সর্ব্বাপেক্ষা শুভ। শাস্ত্র মতে মাহেন্দ্রক্ষণেতে সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হয়। সাধারণতঃ পঞ্জিকাতে যাত্রার শিব জ্ঞানে মাহেন্দ্র, অমৃত প্রভৃতি যোগের নিরূপণ আছে।

দক্ষিণে গো মৃগ—যাত্রা কালে নিম্নলিখিত বিষয় সকল যথা নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিলে মঙ্গল চিহ্ন বলিয়া জানা যায়। যথা—

"বামে শব শিবা কুম্ভ দক্ষিণে গো মৃগ দ্বিজাঃ।
নকুলো সর্ব্বতো ভদ্রঃ ন সর্পশ্চ কদাচনঃ॥"

পাঠক ইহার সহিত একবার ভারতের মঙ্গল চিহ্ন বর্ণনা মিলাইয়া দেখিবেন।

ধেনু বৎস এক স্থানে, বৃষ ক্ষুরে ক্ষিতি টানে,
*   *   *
অন্নপূর্ণা ক্ষেমঙ্করী হয়ে।

প্রকৃষ্ট প্রভাব—পার্ব্বতীর পূর্ণ প্রভাব।

তুষ্টতর তারা...তাকায়—তাহারা কালী ভক্ত সুন্দরের প্রতি সমধিক তুষ্ট হইয়া তৎ প্রতি একবারও বিরূপ দৃষ্টিপাত করে না।

মায়ায় সৃজিলা—সেখানে প্রকৃত নদী ছিল না, দেবী স্বীয় মায়া প্রভাবে তাহা সৃজন করিলেন। এই স্থানের মায়ানদী বর্ণনা কবিরঞ্জনের সম্পূর্ণ নূতন। ভক্ত কবি সুন্দরের ধর্ম্ম বিশ্বাস পাঠককে বুঝাইবার জন্যই এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। শিবোপম যোগী সুন্দরের সম্মুখে উপস্থিত হইল—তিনি সুন্দরকে সে বিপদে তরিবার একরূপ পথও বলিয়া দিলেন, কিন্তু প্রকৃত ভক্ত সুন্দর সে কথা শুনিলেন না, বরং যোগীকে যথার্থ ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝাইতে

গেলেন। অটল বিশ্বাসী ব্যতীত এত সাহস আর কাহারও হয় না।

উৎপত্তি প্রলয়···কটাক্ষে—যোগসিদ্ধিলাভ করিলে যে অষ্ট সিদ্ধি হয় তাহার মধ্যে ঈশিত্ব একটী। তাহার দ্বারাই যোগী ইচ্ছা করিলে যথার্থই সৃষ্টি প্রলয় করিতে পারেন শাস্ত্রের এইরূপ অভিপ্রায়।

পথ প্রাজ্ঞ—পথজ্ঞ, অভিজ্ঞ পথিক।

সৌখ্য মোক্ষদাতা—সুখ ও মোক্ষের বিধাতা চতুর্ব্বর্গ ফলদাতা।

শিব ছাড়া শক্তি—শাস্ত্রে পুনঃপুন উপদিষ্ট হইয়াছে যে, শিব শক্তি ছাড়া নহেন, কারন "শক্তি শক্তিমতোশ্চাপি ন বিভেদ কথঞ্চন।" এইজন্য,

"যথা শিব স্তথা দেবী যথা দেবী স্তথা শিব।
মানয়োবন্তরং বিদ্যাচ্চন্দ্র চন্দ্রিকায়ো যথা॥"

রায়গুণাকর বলিয়াছেন,

"হরগৌরী একহি ইথে নাহি আন।"

কবিরঞ্জন কলীকীর্ত্তনে বলিয়াছেন,

"শক্তি যুক্ত শিব সদা শক্তিলোপেশব।"

মিথ্যা নহে স্বপ্নকথা—পূর্ব্ব রাত্রে কালী সুন্দরকে স্বপ্ন মাত্র দিয়াছিলেন। এবার কালীর পরীক্ষায় সুন্দর উত্তীর্ণ হই-লেন বলিয়া কালী তাহাকে দৈববাণী করিলেন পূর্ব্বের স্বপ্ন সত্য সত্যই সফল হইবে। এবং সুন্দর ও তাহাই বুঝি-লেন।

ভকত ভুঁবন—বৈকুণ্ঠ ধ্রুবলোক, কৈলাস ধাম প্রভৃতি সাত উর্দ্ধ ভূবনেই ভক্তগণে মৃত্যুর পর গিয়া থাকেন। সুন্দর মৃত্যুর পর কৈলাসে গিয়াছিলেন।

"মুহূর্ত্তেকে উপনীত শিব সন্নিধানে।"

দশম দিবসে—কাঞ্চিপুর হইতে বাঙ্গালার পথ প্রায় আট নয় শত ক্রোশ হইবে—কালীর কৃপায় সেই পথ সুন্দর দশ দিনে গিয়াছিলেন—ভারত বলিয়াছেন,—

"ছয় দিনে উত্তরিলা ছ মাসের পথ।"

সুন্দরের বর্দ্ধমান প্রবেশ।

(১৪—১৮ পৃঃ)

পাঠকগণ দেখিবেন কবিরঞ্জনের বর্দ্ধমান বর্ণনা অতি চমৎকার। যথার্থ হিন্দু রাজার রাজধানী যেরূপ হওয়া উচিত কবি তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। এই আদর্শ রাজধানীতে রোগ, শোক, দুঃখ নাই। সকলেই স্বধর্ম্মে নিরত, নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালনে ব্যস্ত। যেখানে কত বেদবেত্তা, কত আগমজ্ঞ, কত দৈবজ্ঞ, কত যোগী, কত ভক্ত সর্ব্বদা চারিদিকে বিচরণ করিতেছেন। সেখানে কেহ দরিদ্র নাই, অকাল মৃত্যু নাই, কাহারও জরা নাই, থাকিলেও আর বেদজ্ঞ বৈদ্যের অব্যর্থ চিকিৎসায় তাহা সহজ সাধ্য। সেখানে সকলই সুখময়—সর্ব্বত্রেই শান্তি বিরাজিত। বাস্তবিক ইহাতেই আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম বর্ণনা করা হইয়াছে। কবির মতে,—

"পরম পবিত্র রাজ্য পরস্পর পূর্ণকার্য্য
সুরাচার্য্য সদৃশ অনেক।"

আবার শুধু যে কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতি আছে, আর কিছুই নাই তাহাও নহে—এখানে 'গান বাদ্য ঘরে ঘরে,' চর্চ্চিত, আবালবৃদ্ধ সকলেই এই রসে রাত্রি দিবা উন্মত্ত। কবির মতে 'ন বিদ্যা সঙ্গীত পর' সুতরাং যে দেশে তাহার এত অধিক চর্চ্চা, সে দেশে অন্যান্য বিদ্যারও সেই রূপ চর্চ্চা হওয়া উচিত। সুকুমার বিদ্যার মধ্যে সঙ্গীত ও কাব্যই শ্রেষ্ঠ এই জন্য এ দেশের লোকেরা সঙ্গীত ও কাব্য উভয়ই সর্ব্বদা চর্চ্চা করিয়া থাকে। তাহারা কাব্য ছাড়া একটুকুও থাকে না। ইহা ব্যতীত কবিরঞ্জন দেখাইয়াছেন, ভারতের সকল দেশ হইতেই এখানে বিদ্যাশিক্ষার্থীরা আসিয়া থাকে। বাস্তবিক এখানে চৌষট্টি কলা বিদ্যারই সম্পূর্ণ চর্চ্চা আছে, তাই—

"গোধন রক্ষক যারা, সঙ্কীর্ত্তণ ভাষে তারা,
কে বুঝে পণ্ডিত কেবা চাষা।"

এইরূপে কবি দেখাইয়াছেন যে ধৰ্ম্ম, জ্ঞান, সুকুমার বিদ্যা সকল দিকেই বৰ্দ্ধমান আদর্শস্থল। কল্পতরুসদৃশ স্বয়ং রাজাও এ সকল বিষয় যথেষ্ট উৎসাহ দিয়া থাকেন, অনেকেই 'চিরবৃত্তি সুখে করে ভোগ।' তাহা এখানে বিদ্যার চর্চ্চাও এত অধিক। এইরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতি দেখাইয়া পরে কবি বৰ্দ্ধমানের বৈষয়িক উন্নতি, তাহার পার্থিব বিভব বর্ণনা করিয়াছেন—কবি সুতরাং সকল রকমেই বৰ্দ্ধমানকে আদর্শ হিন্দু রাজ্যের রাজধানী রূপে বর্ণনা করিয়াছিল। পাঠকের যেন মনে থাকে এখন ইহা (Utopia) ইউটোপিয়া হইলেও পূর্ব্বে ইহা কাল্পনিক ছিল না।

এই বৰ্দ্ধমান বর্ণনার করিয়াছেন রায় গুণাকর অপেক্ষা অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ। ভারত কেবল বৰ্দ্ধমানের বৈষয়িক উন্নতিই দেখাইয়াছেন। বিলাসীর দেশে বিলাসের চরম উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন। কিন্তু ভক্ত প্রসাদ তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন নাই। পাঠক স্বয়ং এই দুইটী বর্ণনা তুলনা করিয়া দেখিবেন।

রাগ রঙ্গ উত্তম প্রসঙ্গ — অনুরাগ রঞ্জিত নানা রূপ রংতামাসার কথায় রাত দিন মত্ত থাকে।

পরস্পর পূর্ণ কার্য্য—সকলেরই মনস্কামনা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে।

সুরাচার্য্য—বৃহস্পতি, বৃহস্পতিই পণ্ডিতাগ্রগণ্য।

চৌপাড়ী—চতুষ্পাঠী, টোল।

পাঠ চায়—গুরুর নিকটে পড়া লইতেছে।

বানপ্রস্থ—বানপ্রস্থ বা তৃতীয় আশ্রমী।

যতি—সন্ন্যাসী বা চতুর্থ আশ্রমী।

ব্রহ্মচারী—ভিক্ষু বা প্রথম আশ্রমী।

বেদবেত্তা···ভোগ—ভারতচন্দ্রের কতকটা এইরূপ বর্ণনা আছে,

ব্রাহ্মণ মণ্ডলে দেখে বেদ অধ্যয়ন।
ব্যাকরণ অভিধান স্মৃতি দরশন॥
ঘরে ঘরে শিব পূজা শঙ্খঘণ্টারব।
শিব পূজা চণ্ডীপাঠ যজ্ঞ মহোৎসব॥

বৈদ্য দেখে নাড়ী ধরি করে ব্যাধিভেদ।
চিকিৎসা করয়ে পড়ে কাব্য আয়ুর্ব্বেদ॥

সাযুজ্য—মোক্ষ চারি প্রকার তন্মধ্যে সাযুজ্য হইলে ব্রহ্মে লীন হওয়া যায়। বেদান্ত বাদীরাই এইরূপ মোক্ষের প্রার্থী। (পূর্ব্বে টীকা দেখ)

যোগবলে দীর্ঘ পরমায়ু—যোগসিদ্ধ হইলে মৃত্যু ইচ্ছাধীন হয়।

বাহিরে সহর থানা—এই স্থান হইতে গড় বর্ণনা আরম্ভ। কবি এই স্থান হইতে ক্রমে ক্রমে সাতটা গড় বর্ণনা করিয়াছেন। ভরতচন্দ্রের গড় বর্ণনা ও কবিরঞ্জনের গড় বর্ণনে প্রভেদ আছে। ভারত ভিন্ন ভিন্ন গড়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতির বসতি-এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন কবিরঞ্জন, সেরূপ করেন নাই। প্রথমে সহর থানা, খোব থানা, ফিল থানা, তোপ থানা, প্রভৃতি বিভিন্ন থানার বর্ণনা করিয়াছেন। পাঠকগণ দুইটী বর্ণনাই মিলাইয়া দেখিবেন।

মেওয়াতির থানা—মেওয়াৎদেশীয় পাহাড়ীয়া দুরন্ত সিপাহি সওয়ারের আড্ডা।

ইরাণী তুরকী তাজী—ভারতে আছে,—

ইরাণী তুরকী তাজী আরবী জাহাজী।
হাজার হাজার দেখে থামে বান্ধা বাজী॥

গাজী—বিজয়ী সেনাপতি।

ঝাম্পান ঢাল—প্রশস্ত বুক ঝাঁপা ঢাল।

গোরাগায় চিক্কণ কাবাই—সুন্দর গৌর বর্ণ গায়ে বুক কাটা জামা পরা রহিয়াছে।

পাঠানের চৌকী—পাঠান সিপাহীগণের থানা। ভারতও দ্বিতীয় গড়ে পাঠানের চৌকী বর্ণনা করিয়াছেন,—

দ্বিতীয় গড়েতে দেখে যত মুসলমান।

ঝাড়া—কাপড় ঝাড়া দিয়া লয়, কোন দুষ্ট অভিপ্রায়ে কোন গোপনীয় দ্রব্য আনিয়াছে কি না, ইহা দেখিয়া লয়। সকল রাজ্যেরই এই নিয়ম।

হুজ্জুতে—সামান্য তর্ক, বা গোলযোগ করিলে।

আফিমে…হামেসা মস্ত—আফিং খাইয়া সর্ব্বদা মত্ত হইয়া থাকে।

দরবস্ত…হুসিয়ার—সম্পূর্ণ সাবধান।

ঘুমে আঁখি—চোখ ঘুরায়।

কিবা কহে বিজি বিজি—ভারত বলিয়াছেন,

" তুরকী আরবী পড়ে ফারসী মিশালে।
ইলিমিলি যপে সদা ছিলিমিলি মালে।"

ওরে বহিনা ভূরজারী, এয়সারে শ্বশুরাগারি

মুসলমানেরা ভগিনীকে বিবাহ করে, হিন্দুরা করে না, এজন্য দুষ্ট মুসলমান সিপাহীরা বাঙ্গালীদিগকে ভেড়ার ন্যায় নিরীহ জ্ঞানে বেহমানী—ভগিনী-গামী ও শ্বশুরা প্রভৃতি বলিয়া গালি দিত। "ভু" টা " বুড়া হইবে।

কাটাও—তেজিয়ান মারাত্মক।

মতীকটা—মেহেন্দী পাতার রসের ন্যায় কটা বা তাম্রবর্ণ।

মোল্লা মোখদিমা…আওয়াজ মুসলমান জাতীয় সভাপণ্ডিত, মন্ত্রী ও বিচারক ইহাঁরা সকলেই বুদ্ধিমান, সুবিচারক ও কার্য্যতৎপর শিষ্ট শান্ত। এ কথা প্রধান ধর্ম্মযাজকগণও মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন।

দিন এমানত সাঁচা—ইহারা সকলে ধর্ম্মপরায়ণ ঈশ্বরভক্ত খাঁটি লোক।

ওক্তে…নমাজ—মুসমলমানগণ নিয়মিতকালে পাঁচবার ঈশ্বরাধনা করিয়া থাকে।

সুজে—মনে কেহ ভবিষ্যৎ ভাবনা করে না।

বুরা কাম—মন্দ কাজ।

পানা—অনুগ্রহ কর আশ্রয় দাও।

ফিলখানা—হাতিশালা। ভারত বলিয়াছেন।

"থামে বান্ধা মত্ত হাতী হলকে হলকে।
শুঁড় নাড়ে মদ ঝাড়ে ঝলকে ঝলকে॥"

সেয়াগোস—তরক্ষুজাতীয় জন্তু। কেউ শৃগাল বিশেষ।

বুরুজ—চারিদিকের গড় খাইর পার্শ্বস্থ উচ্চ চূড়া।

ডানা মারে—বাহুৰ ধাক্কা মারে। ভারত মালেদের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

"মল্লগণ মালসাটে কুটী হেন মাটি ফাটে
দূর হৈতে শুনিতে তরাস।"

অকালেতে জলদের ধ্বান—তাহাদের হুঙ্কার শব্দ অকাল মেঘগর্জনবৎ বোধ হয়।

পালোটে। উল্টাইতে বা চিত্ করিতে পারে।

একান্দাজ—সকলেরই লক্ষ্য অব্যর্থ।

বাঘে ও মহিষে লড়ে—পূর্ব্ব কালে গ্রীস রোম প্রভৃতি দেশে সারকাসে এইরূপ পশুযুদ্ধ সাধারণে প্রদর্শিত হইত, আমাদের দেশেও সেইরূপ ছিল।

কোমকে মান—ছুটা। এই স্থানে ছন্দপতন হইয়াছে বলিয়া অর্থ সংগত হয় না। এই পাঠটি হয়,— (থোমকে সমান যুঝে ছুটা) হইবে; নচেৎ কেমক, সমান যুঝে ছুটা) হইবে। থোমকে রুখিয়া বা রুষিয়া, খুমিয়া ইত্যাদি।

কোমকে—পরস্প সাহায্যে।

সাক্ষাতে শঙ্করী হেন বাসী—এই স্থানের অর্থ বড়ই জটিল। বোধ হয়, এমত পুণ্য দেশের অধিবাসীরা স্বয়ং কালীকে প্রত্যক্ষ করেন অথবা এদেশের প্রতি শঙ্করীর অনুগ্রহ বিশেষরূপ আছে।

বাজার বর্ণন।

(১৮—২০ পৃঃ)

রাজার বাজার—রায়গুণাকর বৰ্দ্ধমানের কোন বিশেষ বাজারের বর্ণনা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,

"চৌদিকে সহর মাঝে মহল রাজার।"
আট হাট ষোল গলি বত্রিস বাজার॥

কেবল মালিনীর বাজার করিবার সময় নাগরীর হাটের উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু কবিরঞ্জন এস্থলে এই নূতন বাজারের বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা বোধ হয় কবিরঞ্জনের বর্দ্ধমানের বড় বাজার হইবে।

বিলাতী—ভেলায়ত কথাটী আরবী। ইহার প্রকৃত অর্থ, দেশীয়। ইংরাজেরা যাহাকে 'হোম' বলেন ঠিক তাহারই দেশী কথা "বিলাতী।" এখানে বোধ হয় বিলাতী চিজ্ অর্থে পশ্চিম দেশী জিনিষ। কাবেল পারস্য প্রভৃতি স্থানের লোকেরা এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়া, স্বদেশকে "ভেলায়ত" বলে—যথা কাবুলীরা বলে—"হামারে ভেলায়তী মেওরে।"

বেদাতি—দৌরাত্ম্য, উৎপাৎ।

হাতীব আমারি—হাতির উপরে বসিবার আসন। হাওদা।

ভারত একস্থানে বলিয়াছেন,

"বসি আমারি ঘর পর, আমীর বহুতর,
হুলায় গজবর রাজে।"

বাঘাই কোটাল—ভারতের কোটালের নাম ধূমকেতু। মুসলমানদের আমলে কোটাল সুধু নগর রক্ষক দেশের শান্তি রক্ষক ছিল না। তাহারই হাতে দেশ শাসনেরও ভার ছিল। কোটালেই সামান্য অপরাধীদের বিচার করিতেন ও উপযুক্ত দণ্ড দিতেন। আজ কাল মাজিষ্ট্রেট বা জাষ্টিস্ অব দি পিস্‌ও যাহা, সেকালের কোটালও তাহা। ভারত তাহার কোটালের এজলাস বর্ণনা করিয়াছেন। আর কবিরঞ্জন কোটালকে নগর পরিদর্শক রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ভারত বলিয়াছেন,

"বসিয়াছে কোতোয়াল ধূমকেতু নাম।
যমালয় সমান লেগেছে ধূম ধাম॥
ঠকৃঠাকি হাড়ির কোড়ার পটপটি।
চর্ম্ম উড়ে চর্ম্ম পাদুকার চট্‌পটি॥
* * * * *

কোটালের ভয়ে কেহ নাহি করে দয়া॥ ”

চিকণ···সরবন্দ—চকচকে মাথার পাগড়ী।

মিহি ফুলতোলা সেরবন্দ পাগড়ী।

পূর্ব্ব দিক্ প্রকাশ যেমন উষাকাল—উপমাটী অতি সুন্দর হইয়াছে। কোটাল কাল, সুতরাং উষার কাল আকাশের সহিত তাহার শরীরের তুলনা করিয়া তাহার কপোলের রক্তচন্দন ফোঁটাকে উষাকালের রক্তাভ পূর্ব্বদিকের সহিত তুলনা দেওয়া হইয়াছে।

চৌরি ঝাড়ে—চামর দোলায়।

হাজারির ভুর—নকিবের হুকারে হাজারী সেনাপতিগণেরও চমক লাগে। এবং কোতোয়ালকে হাজারী সেনাপতি বলিয়া বোধ হয়।

সরোবর বর্ণন।

(২০—২২ পৃঃ)

স্ফটিকে নির্ম্মিত··কবিরঞ্জনের সরোবর বর্ণনা সকলই অদ্ভুত সকলই অলৌকিক। ইহার ঘাট স্ফটিক নির্ম্মিত, তীরতরু সুবর্ণ নিবদ্ধ; এখানে ত্রিবিধ পবন সদা প্রবাহিত, মদন সদা আবির্ভূত, এককালে ছয় ঋতু মূর্ত্তিমন্ত বিশেষতঃ বসন্ত চিরবিরাজিত। এরূপ সরোবর মর্ত্ত্যে সম্ভবেনা। স্বর্গে আছে এরূপ কল্পনা হইতে পারে। যাহা হউক এ অলৌকিক সরোবরের বর্ণনায় কবিরঞ্জন যথেষ্ট কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতেও সরোবর,—

“ সাণে বান্ধা চারি ঘাট শিবালয় চারি।
অবধূত জটা ভস্মধারী সারি সারি॥ ”

* * * *

পুষ্পবনে পক্ষীগণে নিশি দিন জাগে।
ছয় ঋতু ছত্রিশ রাগিণী ছয় রাগে ”

বঞ্জুল—অশোক পুষ্পের বৃক্ষ।
সীতাসিত—শ্বেত কৃষ্ণ।

বিয়োগী জনার চিত্তে···পীড়া—ভারত বলিয়াছেন,—
"জলেতে নিবায় জ্বালা সর্ব্ব লোকে কয়।
এ জল দেখিয়া জ্বালা দশগুণ হয়॥"
ত্রিবিধ পবন—বায়ুর তিনটী গুণ, শীতল সুগন্ধ এবং ঝুরঝুরে।
মনোভব আবির্ভাব—মদন সেখানে সর্ব্বদা বিরাজমান, সেই সুন্দর সরোবর তীরস্থ সুরম্য বনস্থলীতে এককালীন ছয় ঋতু বর্ত্তমান। কবিরঞ্জন এ স্থানটির বর্ণনা অতি চমৎকার করিয়াছেন। এবং নিম্নে সেই ছয় ঋতুর এক কালীন কার্য্যের পরিচয় অতি উত্তমরূপ দিয়াছেন।
সুধাসম হিতকরী—অত্যন্ত শীতে অগ্নি সেবা বড়ই ভাল লাগে।
মহাপাত্র সুপাত্র—মহাপাত্র অথবা প্রধান মন্ত্রী উপযুক্ত লোক—
বসন্তই মদনের মন্ত্রী।
তথাপিও মনোরথ ত্রিজগত জয়ী—অর্থাৎ এই সকল অনুচর সামান্য হইলেও কামের এমনি প্রভাব যে ইহাদের দ্বারাই তিনি জগত জয় করেন।
মঞ্জুল রব—মনোহর রব; কোকিলের পঞ্চম স্বর চির প্রসিদ্ধ।
পরভৃত বধূ—কোকিলা। কাকের বাসায় পালিত বলিয়া ইহাকে পরভৃত বলে। এইস্থলে কবিরঞ্জনের ন্যায় অনেক কবিই ভ্রমে পড়িয়া থাকেন। পুংস্কোকিলই কুহুরব করে, কোকিলা আদৌ ডাকিতে পারে না।

পুস্করাগ্রে পুস্কর···কুতূহলী—অর্থাৎ হস্তি শুণ্ডের অগ্রভাগ দ্বারা পদ্ম তুলিয়া, আনন্দিত মনে তাহা হস্তিনী মুখে তুলিয়া দিতেছে। কালিদাস বসন্ত বর্ণনায় এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।—

"মধুদ্বিরেফৈঃ কুসুমৈক পাত্রে
পাপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্ত্তমানঃ।
* * *

দদৌ রসাৎ পঙ্কজরেণুগন্ধি
গজায় গণ্ডুষ জলং করেণুঃ।
অর্দ্ধোপভুক্তেন বিসেন জায়াং
সম্ভাবয়ামাস রথাঙ্গ নামা॥"

ক্ষণে বিষ তুল্য কর—বসন্তের পর এক্ষণে গ্রীষ্ম বর্ণনা হইতেছে। তাই সূর্য্যের তীক্ষ্ণরশ্মি।

মৃগেন্দ্র গজেন্দ্র…একঠাঁই—

"মৃগ পালে পাল, শার্দ্দুল রাখাল,
কেশরী হাস্তি রাখাল।
ময়ূর ভুজঙ্গে, ক্রীড়া করে রঙ্গে,
ইন্দুরে পোষে বিড়াল॥"

সখি—বন্ধুমেঘ।

শিখি—পুচ্ছ।

প্রমদে—আনন্দে। কালিদাস বলিয়াছেন "মেঘোদয়ে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেত।"

বিন্দুপাত…শরদ—শরতে মেঘেরগর্জ্জন হয়—সেরূপ বর্ষণ হয় না। কবিরঞ্জনের এই ছয় ঋতু বর্ণনা অতি সুন্দর হইয়াছে। ইহা সঙ্খেপ হইলেও বেশ প্রাঞ্জল।

সুন্দর দর্শনে নাগরীদিগের উক্তি।

(২২-২৫ পৃঃ)

কবিরঞ্জনের এই স্থলের বর্ণনা অতি মনোহর। ভারতও ঠিক এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এক ছন্দে এক ভাবে এক রূপ রসে উভয় কবিই এই স্থানের বর্ণনায় রচনা চাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। ইহার মধ্যে কাহার বর্ণনাটী অপেক্ষা কৃত ভাল তাহা সহজে বলা যায়না। সাধারণত, এই মাত্র বলা যায় ভাবের গম্ভীরতায় কবিরঞ্জন আর বর্ণনার মনোহারিতায় ভারত শ্রেষ্ঠ। পাঠকগণ স্বয়ং এই দুই স্থান তুলনা করিবেন।

তুলনা কর কি—অতুলনীয়। ভারত বলিয়াছেন,

মোহনিয়া ছাঁদে চাঁদ পড়ে কান্দে
রতি রতিপতি ভুলে।

মেরুশিখর—সুমেরু পর্ব্বতের চূড়া। শাস্ত্র মতে মেরুশিখর সুবর্ণমণ্ডিত, সুতরাং দেখিতে অতি সুন্দর।

শিখরী…বলে—সুন্দরের সহিত মেরু পর্ব্বতের বা চন্দ্রের সহিত তুলনা হয় না—কেন না মেরু অচল, আর চন্দ্র কলঙ্কময়; কিন্তু সুন্দর সচল বা চৈতন্যময় পুরুষ, এবং দেখিতে নিষ্কলঙ্ক শশী সমান।

সৌদামিনী রহে স্থিরতা কহে—সুন্দরের সহিত বিদ্যুতের তুলনা হয় না, কারণ বিদ্যুৎ চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী। কবি অন্যত্র বলিয়াছেন,—

"যদ্যপি অচিরপ্রভা চিরস্থির হয়।
তবে বুঝি তনু শোভা হয় কিবা নয়॥"

কহে এক সতী…ঘটে—ভারত বলিয়াছেন—

"সেই ভাগ্যবতী, এই যার পতি
সুখে ভুঞ্জে রতি, মন আবেশে।"

নয়ন দুয়ারে কুলুপ দিয়া—সুন্দরকে হৃদয় মন্দিরে রাখিয়া, নয়ন মুদিয়া অহোরাত্র কেবল সেই সুন্দর মুখারবিন্দখানি ধ্যান করি।

আলো—(১)রূপের দিপ্তীতে সর্ব্ব দিক উজ্জ্বল করিয়াছে (২) সম্বোধন ওলো।

গলে পরিহার—ভারত বলিয়াছেন,—

"বিরহে জ্বলিয়া, সোহাগে গলিয়া,
হারে মিলাইয়া পরিলে সাজে।"

পলাইয়া যাই এদেশ থেকে—ভারত বলিয়াছেন,—

"আজ্ঞা মরে যাই, লইয়া বালাই,
কুলে দিয়া ছাই, ভজিঙ্গ ইহারে।
যোগিনী হইয়া, ইহারে লইয়া,
যাই পলাইয়া, সাগর পারে॥"

নারী কলা,—পুরুষকে মোহিত করিবার স্ত্রীলোকের অনেক প্রকার বিদ্যা আছে। হাব, ভাব, বিলাস, প্রভৃতিকে নারীকলা কহে।

বাজী,—কুহক। মোহিত করিয়া। ভারতে আছে,

"ভুলাইল বামন তোমারে বাজী দিয়া।"

কে দিবে তেড়ে—কে তাড়াইয়া দিবে। এইরূপ নায়িকাকে শাস্ত্রমত মুদিতা বলে।

প্রবাসে রয়েছে পতি ননদী প্রসূতবতী
বিধবা শাশুড়ী ওই দৃষ্টিহীন রয়লো।
দেবর বিলাস রায় শ্বশুর ভবনে যায়
মন্দ মন্দ গন্ধবহ বিদরে হৃদয় লো॥

রসমঞ্জরী ১৮ পৃঃ।

ব্রত—সুযোগ, মনোগত ভাব।

অতনু অলসে—মদন দাহনে অবশ তনু। "মদন বিহ্বলালসাঙ্গী।"

কবি দর্শনে কামিনীগণের মনোভাব।

(২৪—২৫ পৃঃ)

দিঠী—দৃষ্টি।

পনীয় পনীর, ননী। ননী অপেক্ষাও কোমল শরীর।

চারু কৃশোদরী···ওই—তাহার মধ্যস্থল এত ক্ষীণ যে তাহা সিংহের কোটীকেও হারাইয়া দিয়াছে। এই দুঃখে সিংহ বনবাসী হইয়াছে।

নবোঢ়া—নববিবাহিতা। রসমঞ্জরীতে ইহার স্বতন্ত্র লক্ষণা আছে, যথা—

"এ যদি রমণে লাজে ভয়ে হয় স্তব্ধ।
নবোঢ়া তাহারে বলি প্রশ্রয় বিশ্রব্ধ॥"

বেনে—কথাটী "মেনে" কথার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে।

জাগত অনঙ্গ···হেমঘট—ভারতে আছে,

"সুন্দরে দেখিয়া পড়ে কলসী খসিয়া।
ভারত কহিছে শাড়ী পরলো কসিয়া" ॥

রাম...পতি—কবি আর এক স্থলে বলিয়াছেন,—
"জানকী জীবন রাম কিম্বা রাম কিম্বা কাম।"

মালিনী সহ সুন্দরের পরিচয়।

(২৫—২৮ পৃঃ)

রোহিনীরমণ—রোহিনীর নয়নানন্দ বলরাম।

মনুষ্য শরীর ছলে—কবিরঞ্জনের হীরা 'নীচ' অশিক্ষিতা হইলেও এইরূপ স্থানে স্থানে অনেক পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছে।

প্রসবস্থলী—জননী।

বিদ্যাব্যবসাই—পাঠার্থী, অথবা বিদ্যাকে লাভ করিতে আসিয়াছি। এই কয় স্থলেই, 'বিদ্যা' কথার দ্ব্যর্থ আছে।

সেবি বিদ্যা...কামনা—বিদ্যাকে বিচারে জয় করিব বলিয়াই লেখা পড়া (বিদ্যা) শিখিয়াছি, তাহারই জন্য স্বদেশ ছাড়িয়া হেথা আসিয়াছি। এখন সকলই সেই মহাবিদ্যা কালীর ইচ্ছা—তিনি বাসনা পূর্ণ করিলেই সব সফল হয়।

ভারতে আছে,—

"মহাবিদ্যা আরাধিলা বিদ্যালাভ হেতু।"

বুঝিয়া বাক্যের ছল—ভারতের সুন্দর, হীরার কাছে এরূপ ছল করেন নাই।

বিদ্যায় ভকতি...পাছে—তুমি কালীভক্ত, সুতরাং বিদ্যাকে লাভ করিবে।

হীরাবতী নামধার—ভারতে আছে—

"মালিনী বলিছে আমি দুখিনী মালিনী।
বাড়ী মোর ঘেরা বটে থাকি একাকিনী॥
নিয়মিত ফুল রাজ বাড়ীতে যোগাই।
ভালবাসে রাজরাণী সদা আসি যাই॥"

তুষ্টা শ্যামা গুণধামা—বিদ্যাও সুন্দরের ন্যায় কালীভক্ত, প্রথমেই তাহা দেখান হইল।

সেই তার হৃদয়েশ…সুখ—ভারতেও এইরূপ বর্ণনা আছে,—

"প্রতিজ্ঞা করিল সেই বিচারে জিনিবে যেই
পতি হবে সেই সে তাহার।
রাজপত্র গণ তায় আসিয়া হারিয়া যায়
রাজা ভাবে কি হবে ইহার॥"

সমুদ্র মন্থনে নিধি…অঙ্গে—সমুদ্রমন্থন কালে যতপ্রকার সুন্দর রত্ন উঠিয়াছিল, সে সকলগুলি একত্র করিয়াই বিধাতা বিদ্যাকে গড়িয়াছেন। কালিদাসে আছে—

"সর্ব্বোপমা দ্রব্য সমুচ্চয়েন
যথা প্রদেশং বিনিবেশিতেব।
সা নির্ম্মিতা বিশ্বসৃজাঃ প্রযত্না
দেকস্থ সৌন্দর্য্য দিদৃক্ষবেব॥"

আর গুণ গুণযুত…মাসী—ভারত এস্থলে অন্যরূপ বলিয়াছেন। সুন্দরই প্রথমে হীরার চরিত্র বুঝিয়া সাবধানার্থ তাহাকে মাসী বলিয়া সম্বোধন করেন। যথা

"মাসী বলি সম্বোধন করি আমি আগে।
নাতি বলে পাছে মাগি দেখে ভয় লাগে॥

কবিরঞ্জনেরও এইরূপ বর্ণনা করিলে ভাল হইত। কেন না তিনিও মালিনীকে এইরূপ কুচরিত্র করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পরে আছে,

"বাসনা বলিতে নারে ফিক্ ফিক্ হাসে॥
ভাবে কবি এ মাগী বয়সে দেখে পোড়া।
ভাবে দেখি এ প্রকার হয় নাই বুড়া॥
* * * * *
ভয়ে অতি হীরাবতী প্রতি কহে হাসি।

সে না রূপে—সেইরূপে যথা

"সেনা পদের ধূলি আমি মাখি সর্ব্ব অঙ্গে।"
সেনা অর্থে কার্ত্তিকও হইতে পারে।

বিদ্যার রূপ বর্ণন।

(২৮—৩০ পৃঃ)

সে পারে কহিতে কিছু শত মুখ যার—ভারত বলিয়াছেন,—

'বাণী যদি শেষ হয়।'

অন্যত্র, "দেবরাজ দেখে যদি নাগরাজ কয়॥
দেখিতে কহিতে কিবা পারে কি না পারে।"

চাঁচর চিবুক—সুন্দর কোঁকড়া চুলের শোভা মেঘের শোভাকে পরাজয় করিয়াছে। স্তরে স্তরে সাজান একরূপ মেঘ সময়ে সময়ে দেখা যায়, ইংরাজীতে তাহাকে সিরোষ্ট্রাটা মেঘ বলে। তাহার শোভা অতি চমৎকার। ইহারই সহিত চুলের তুলনা হয়।

ডুবিল কুরঙ্গ...যায়—এই স্থানটী অতি চমৎকার। এইরূপ বর্ণনা আর কোথাও নাই। ইহার অর্থ এই বিদ্যার মুখ ঠিক চাঁদের ন্যায়। কিন্তু চাঁদে হরিণ শিশু (যাহাকে সাধারণত কলঙ্ক কহে) আছে ইহা প্রসিদ্ধ। বিদ্যার মুখে সে হরিণ শিশুচিহ্ন কই? এই আশঙ্কায় কবি বলিয়াছেন, মুখরূপ সুধা-সাগরে সে ডুবিয়া গিয়াছে, তাই তাহার শরীর দেখা যাইতেছে না, তবে বিদ্যার বিশাল নয়নে তাহার নয়ন যুগল ভাসিয়া আছে, দেখা যাইতেছে। সুতরাং বিদ্যার মুখ অকলঙ্কচন্দ্রের ন্যায়, আর তাহার নয়ন হরিণ নয়ন তুল্য।

ভারতে আছে,—

"কেড়ে নিল মৃগমদ নয়ন হিল্লোলে।
কাঁদেরে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে॥"

নিত্য কর্ম্মভোগ করে—খঞ্জন সর্ব্বদাই, চঞ্চল সে কখন স্থির নহে। কবি বলিয়াছেন, বোধ হয় বিদ্যার চক্ষুর চাঞ্চল্য অনুকরণ জন্য সে এইরূপ করিয়া থাকে।

বিম্বাধর দশনে···তুল—পূর্ব্বে লক্ষ্মী বন্দনায় আছে।—

"জিনিয়া আরক্ত মুক্তাফল দন্ত শোভা"
(ইহার টীকা দেখ।)

পুষ্পধনু···ধনু অনু—পুষ্পনির্ম্মিত ধনু যাহার অর্থাৎ কন্দর্প; সেই মদনের ধনুও বিদ্যার ভ্রুর তুলনায় অতি সামান্য।

বিসে—পূর্ব্বে লক্ষ্মীর বন্দনায় আছে,
পঙ্কে বাস বিস সেকি বাহুদণ্ড অনু।

যৌবন জলধি····করিল ভঞ্জন।—এস্থলে বিদ্যার নবোদ্গম যৌবন বর্ণনা, কবি সংক্ষেপতঃ এই কয়েক পঙ্‌ক্তিতে যাহা করিয়াছেন, অন্যে পুঁথিবা শুদ্ধ লিখিয়া তাহা করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। অর্থাৎ বিদ্যার নবোদিত যৌবনকে কবি রসময় সাগর স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, এবং তাহার আশ্রয়ী মদনকে যৌবন রূপ মদমত্ত করিরূপে বর্ণনা করিয়াছে। পূর্ণ যৌবনাদিগের যৌবন মদ-মত্ত-করি রূপে মদনের সর্ব্বতঃ স্ফূর্ত্তি, নব-যৌবনাদিগেতে সম্ভবে না বলিয়া, এস্থলে মদন রূপ মত্তগজ বিদ্যার যৌবনসাগর মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছে। তবে তাহার চিহ্নের স্বরূপ বিদ্যার বক্ষস্থলে তাহার মদস্রাবী কুম্ভ যুগল ঈষৎ ভাসিয়া রহিয়াছে, এজন্য উহা সত্য সত্য কুচ নহে।

তাহার বিশেষ প্রমাণ এই যে, মধুপায়ী ভ্রমরগণ করিকুম্ভের তীব্র মদগন্ধে অন্ধ ও লুব্ধ হইয়া অন্য মধু ত্যাগ করিয়া করিকুম্ভে সর্ব্বদা সমাশক্ত থাকে। এস্থলেও বিদ্যার নাভিরূপ বিকশিত পদ্মের মধুপান ত্যাগ করিয়া, রোমরাজি রূপ ভ্রমর পঙ্‌ক্তি বিদ্যার উরস্থলে উদিত মদস্রাবী করিকুম্ভে মধুপান হেতু উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া ক্রমে কুম্ভের সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইল। অথবা অন্য প্রকারে বলিতে হইল, সেই আকুম্ভবিশ্রান্ত লোমাবলী দ্বারা, বিদ্যা যে কৈশোর অবস্থা হইতে সবে যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন, এই বিবাদ উত্তম রূপ ভঞ্জন হইয়া গেল।

কবিরঞ্জন অন্যত্র বলিয়াছেন,—

নাভিপদ্মভেদি ভ্রমে বেণী ক্রমে ক্রমে।
লোমাবলী ছলে চলে করিকুম্ভ ভ্রমে॥

কেহ বলে...ক্ষীণ—রূপ বর্ণনায় এস্থলে বরাবরই ভারতের ন্যায় অতিশয়োক্তি আছে, তবে এই স্থলে তাহার পরাকাষ্ঠা হইয়াছে। ভারত পদে আছেন, তিনি শুধু বলিয়াছেন,

"কত সরু ডমরু কেশরী মধ্যখান।"

কাম পারাবার পার সার অবলম্ব—যৌবনরূপ সমুদ্র পার হইবার একমাত্র অবলম্বন।

অচিরপ্রভা—বিদ্যুৎ, ক্ষণপ্রভা। ভারতে আছে, "তড়িৎ ধরিয়া রাখে কাপড়ের ফাঁদে।" কবি সুন্দরের রূপ বর্ণনায় বলিয়াছেন,—

"আর জন কহে যে কেহ সে নহে
সৌদামিনী বুকে স্থিরতা করে।"

মন্দ মন্দ...পলায়—মন্থর গমনের সহিত যদি কটাক্ষ দৃষ্টি করে, তবে মদন তাহার নিকট হারি মানিয়া পলাইয়া যায়। ইহার বিবরণ কবি নিম্নে দিয়াছেন। ভারতের বর্ণনা অন্যরূপ,

"বসন ভূষণ পরি যদি বেশ করে।
রতি সহ কত কোটী কাম ঝুরে মরে॥"

স্মরহর—মদন বা স্মরকে ভস্ম করায় মহাদেবের নাম স্মরহর। মহাদেব মদনের শরেও মোহিত হন নাই, কিন্তু বিদ্যার চখের তীব্র চাহনি তিনিও সহ্য করিতে সমর্থ নহেন।
"যেহেতু পুষ্পধনু ধনু অনু সে ভুরু ভঙ্গিমা।"

কবিরঞ্জন বিদ্যার রূপ বর্ণনায় যথেষ্ট কারিগরি দেখাইয়াছেন সত্য, কিন্তু ভারতের বর্ণনা ও এবিষয়ে অতুল। তবে ভারতের বর্ণনায় যেমন বরাবর প্রসাদ গুণরক্ষিত হইয়াছে, কবিরঞ্জনের সেরূপ হয় নাই।

মালঞ্চ বৃত্তান্ত।

(৩০—৩২ পৃঃ)

শিরসি কমলে…শ্রীনাথচ্ছবি—সাধক ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া মস্তকে সহস্রারে বা সহস্রদল পদ্মে সদাশিব ও ভগবতীকে ধারণা করিয়া থাকেন। প্রসাদের ষট্‌চক্রভেদ গানে আছে,—

"আজ্ঞা চক্র করি ভেদ ঘুচাও ভক্তের খেদ
হংসীরূপে মিল হংসবরে।
চারি ছয় দশ বার ষোড়শ দ্বিদল আর
দশ শত দল শিরোপরে॥
শ্রীনাথ বসতি তথা শুনি প্রসাদের কথা
যোগী ভাসে আনন্দ সাগরে।"

নাসারন্ধ্রে ঘ্রাণ—বিলাসের বস্তু উপভোগ করিলেই বিলাসীর মনে বিলাসভাব উদয় হয়, ইহা অস্বাভাবিক নহে।

সামান্য পুরুষ নহ—কবিরঞ্জন ও ভারত উভয়েই অনেক অলৌকিক ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। সুড়ঙ্গ খনন, ছয় মাসে ছয় দিনের পথ গমন, কালীর দর্শন দেওয়া প্রভৃতি সকলই অদ্ভুত। তবে কবিরঞ্জনে এই অলৌকিক বর্ণনার কিছু বাড়াবাড়ী আছে। মায়ানদী সৃষ্টি, শুষ্ক মালঞ্চ পুষ্পিত হওয়া, শব সাধনা, বিদ্যাসুন্দরের স্বর্গে গমন এগুলি কবিরঞ্জনে আছে কিন্তু ভারতে নাই।

সাপরাধি—স্নেহের পাত্রকে গুরুতর লোকে এরূপ বলিলে তাহার অকল্যাণ হয়।

মালিনীর পুষ্প চয়ন ও হাটে গমন।

(৩২—৩৩ পৃঃ)

ধার দিয়া বসিল...নীচ ব্যবহার—ভারত ও মালিনীকে নীচ জাতি করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি মালিনীকে এত নীচ ভাবে দেখান নাই। ভারতও বলিয়াছেন,

"কিন্তু মাগী একা থাকে দেখি নষ্ট রীত।
দুর্ব্বুদ্ধি ঘটায় পাছে হিতে বিপরীত॥"

এবং সুন্দর এই ভাবিয়া পূর্ব্বেই সাবধান হইলেন, মালিনীর সহিত মাসী সম্বন্ধ পাতাইলেন। এরূপে ভয়দুর হইল। কিন্তু কবিরঞ্জনের মালিনী প্রথমে সুন্দরকে আপনার ভগ্নীসুতের সহিত এক নামে দেখিয়া বাৎসল্য ভাবে তাহার সহিত মাসী সম্বন্ধ পাতাইলেন। এমত স্থলে কবিরঞ্জনের এরূপ বর্ণনা ভাল হয় নাই, ইহাদ্বারা মালিনীর চরিত্র আরও অপকৃষ্ট করা হইয়াছে। তাহার হাব ভাবে নীচত্বের পরাকাষ্ঠা দেখান হইয়াছে।

প্রথম পতির প্রিয়া পূজা—এখানে কালী পূজা। ভারতের মালিনীও হাটে গিয়াছিল, কিন্তু সে উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। ভাল আহারাদির বন্দোবস্ত করিবার জন্যই তাহাকে হাটে পাঠান হয়। কিন্তু কবিরঞ্জনের মালিনী সে জন্য হাটে যায় নাই। পাঠকগণ দেখিবেন, কবি স্বয়ং কালীভক্ত বলিয়াও সুন্দরকেও বরাবর কালীভক্ত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

আমি আজ গাঁথি মালা—ভারতের মালা গাঁথার কারণ স্বতন্ত্র। ভারতের সুন্দর প্রথমে হীরাকে যথেষ্ট বিশ্বাস করিয়া তাহাকে নিজের দূতী সাজাইয়া, আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া, শেষে বিদ্যার পরামর্শে তাহাকে অবিশ্বাস করিয়াছিলেন। কবিরঞ্জনের বর্ণনা ঠিক ইহার বিপরীত। তাঁহার সুন্দর প্রথমতঃ হীরাকে আদৌ বিশ্বাস করেন নাই। সকলই কৌশলে করিয়াছিলেন। হীরাকে ফাঁকি দিয়া

তাহার অজ্ঞাতে মালা রচনা করিয়া তাহার দ্বারা বিদ্যাকে নিজ পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে কার্য্যোদ্ধার হইলে তিনি হীরাকে বিশ্বাস করেন, এবং অতি গোপনীয় কথা পর্য্যন্ত বলেন। নীচ জাতিকে এরূপ বিশ্বাস করায় কিছু দোষ হইয়াছে। মালা গাঁথা সম্বন্ধে ভারত বলিয়াছেন,—

"এক দিন মোর গাথা মালা লয়ে যাও।
মালা মাঝে পত্র দিব তাহে বুঝা সুঝা॥
বেড়া নেড়ে যেমন গৃহস্থের মন বুঝা।"

সুন্দরের মাল্য গ্রন্থন।

(৩৩—৩৪ পৃঃ)

ভারত ও কবিরঞ্জন দুই কবিই মাল্যরচনা বর্ণনা করিয়াছেন। পাঠক দুইটির তুলনা করিয়া দেখিবেন। আমাদের দেশে মাল্যরচনা, চৌষট্টি কলার বিদ্যার মধ্যে একটী প্রধান বিদ্যা; সুকুমার বিদ্যার মধ্যে ইহা প্রধান। এই জন্য প্রকৃতরূপে শিক্ষিত হইতে হইলে মাল্যরচনা বিদ্যাও শিক্ষা করিতে হয়। সুন্দর সেই জন্য মাল্যরচনায় পাণ্ডিত্য দেখাইয়া, নিজ বিদ্যার পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতের মাল্যরচনা ও কবিরঞ্জনের মাল্যরচনা বর্ণনায় কিছু প্রভেদ আছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ভারতের সুন্দরে বিলাসিতার ভাগ বড় অধিক। সেই জন্য তাঁহার মালা গাঁথায়ও বিলাসিতা আছে। ভারত বলিয়াছেন,

"ভাবে রায় মালায় কি হবে কারিকরি।
অন্যের অদৃশ্য কিছু কারিগরি করি॥"

তিনি পুষ্পময় মদন গড়িয়া সে কারিগরি দেখাইলেন।

কবিরঞ্জনের মালা গাঁথাতেই অদ্ভুত কৌশল আছে।

তাহার,

"তুলা নাই কোন ঠাঁই, একি অসম্ভব।
দৃষ্টি মাত্র কাঁপে গাত্র জন্মে মনোভব॥
* * *
নৃপ বালা পাবে জ্বালা এগাঁথনি ভালি॥"

বিনা সুত—ভারতেও আছে।

"গাঁথে বিনা গুণে শোভে নানা গুণে"

কবির মাল্য সংক্রান্ত পরিচয় লিখন।

(৩৪—৩৬ পৃঃ)

সবিশেষ নিজ—ভারতের সুন্দর, মালার পদ্মপত্রে লিখিয়া তাঁহার নিজ পরিচয় দেন নাই—কেবল শ্লোক দ্বারা আপনার নাম জানাইয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু পরিচয় দেওয়াই অধিকতর সঙ্গত। ইহাতে কবিরঞ্জনের সুন্দরের চরিত্র ও তাহার গাম্ভীর্য্য বেশ রক্ষিত হইয়াছে। ভারতের সুন্দর পরিচয়ের পূর্ব্বেই রঙ্গ রহস্য করিয়া, ভাল করেন নাই।

নির্ম্মল সুযশ…কালো—এখানে যশের সহিত চন্দ্রে কিরণের তুলনা করা হইয়াছে। যশ অধিকতর নির্ম্মল বলিয়া যেন চন্দ্র ভাবিয়া ভাবিয়া কালি হইয়া গিয়াছেন—তাই চন্দ্রে কলঙ্ক হইয়াছে।

সে তেজ তুলনা দিতে…প্রদোষ সময়—রাজা অতি তেজস্বী বড় প্রতাপশালী। তাঁহার তেজের সহিত সূর্য্যের তেজের তুলনা হয় না। এই রাগে সূর্য্য প্রাতঃকালে রক্তবর্ণ হইয়া উদয় হয়—মনে ভাবে,দেখি দেখি তাহার তেজ কি কখন আমার তুল্য হইতে পারে। কিন্তু তুলনায় হারিয়া, বেলাবৃদ্ধির সহিত আরও নিজ তেজ বৃদ্ধি করিয়া রাজার তেজের তুল্য হইতে চাহে—মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত দেখিয়া, নিজে হার

মানিয়া লজ্জায় ক্রমে ক্রমে ম্লান হইতে থাকে—শেষে সন্ধ্যাকালে নিজ মুখ লুকাইয়া অস্ত যায়। হ্রী—লজ্জা

ভাস্কর ভাঙ্কর—দীপ্তিমান সূর্য্য।

নৃপ-রত্নাকর—নৃপতির বিভব অতুল সমুদ্র রত্নাকর হইয়াও তাঁহার তুল্য নহে। বিশেষতঃ সে সমুদ্রজল লবণাক্ত বলিয়া অপেয়, সুতরাং তাহার সহিত রাজার নির্ম্মল ধন-সাগরের কিরূপে তুলনা হইবে।

ক্ষণজন্মা—শুভক্ষণে জন্মিয়াছেন—সুতরাং সর্ব্ব সুলক্ষণাক্রান্ত।

কর্ণে শুনি কর্ণ দাতা—দাতা কর্ণের উপাখ্যান শিশুবোধের অনুগ্রহে সকলেই অবগত আছেন। তিনি নিজপুত্র বৃষকেতুকেও বধ করিয়া অতিথির সেবা করিয়াছিলেন।

সর্ব্বসহা—পৃথিবী; কারণ পৃথিবীই জগতের পাপী তাপী আদি সকল ভারই বহন করেন।

পণ প্রাণ—পণ হইয়াছে প্রাণ যার। অথবা হে প্রাণ তোমায় পণের কথা শুনিয়া। (প্রথম অর্থই সঙ্গত)

প্রমত্ত—বিহ্বল, উন্মত্ত। কবি প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের কথা একে একে বলিতেছেন। তোমার কথা প্রথমে শুনিয়া তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা হইল—পরে তোমার মুখসুধা পান করিব, তোমার পদ্মগন্ধ আঘ্রাণ করিব, তোমার স্পর্শ সুখ অনুভব করিব—এই ইচ্ছা বলবতী হইল।

পদ্মিনী—পদ্মিনী নারীর লক্ষণ ভারতের রসমঞ্জরীর ৮৭ পৃষ্ঠায় আছে। তাহাদের গায়ে পদ্মগন্ধ বাহির হয়—এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে।

"পদ্মগন্ধ কয় সেই পদ্মিনী।"

বিকলে—অবশ হইয়া। হেম—সুশীতল সুবর্ণাভশরীর।

বাহুড়ে—মন আর ফিরিয়া যাইতে চাহে না।

নপুংসক মন—মন স্বয়ং নিষ্ক্রিয়, ইহা চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি দশ ইন্দ্রিয়ের কার্য্যের সাহায্য করে মাত্র। মনঃসংযোগ না হইলে কোন ইন্দ্রিয়ই কার্য্য করিতে পারে না বটে—কিন্তু মন স্বয়ং কোন কার্য্য করে না। ইহাই শাস্ত্র প্রসিদ্ধ।

এই জন্য মনকে এস্থলে নপুংসক বলা হইয়াছে।

নিনী ব্যবসা যার তার চিত্তে বাড়া—অর্থাৎ যে পণ্য ব্যবসায়ী তাহার আবার লজ্জা কি? অতএব আমার স্পষ্ট কথা, হয় আমার মন ফিরাইয়া দাও, নয় তার মূল্য স্বরূপ তোমার মন আমাকে দাও।

ক গুণে বন্দিলা তারে—আমার মনকে তুমি কিকারণে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছ। গুণ অর্থে রজ্জুও বুঝায়।

মালিনীর হাটি পরিচয়।

(৩৬—৩৭ পৃঃ)

হাট করি···এস্থলে কবিরঞ্জনে ও ভারতে উপাখ্যানগত কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। ভারতের বর্ণনামতে সুন্দর মালিনীর সহিত প্রথম দর্শন কালে, বা তাহার বাটী যাইবার সময় কোন কথাই জিজ্ঞাসা করেন নাই। মালিনীর বাটী গিয়া তাহার দ্বারা হাটবাজার করাইয়া, পরে নিজে রন্ধন ভোজন শেষ করিয়া, তবে মালিনীর সহিত বিদ্যা সম্বন্ধে কথোপকথন করেন। মালিনী তাঁহাকে বিদ্যার সৌন্দর্য্যের পরিচয় দেয়। পরে সুন্দর তাহাকে দূতী সাজাইয়া নিজের গাঁথা মালা বিদ্যার মনপরীক্ষার্থ পাঠাইয়া দেন।

কবিরঞ্জনের বর্ণনায় এই বিশেষ আছে যে, তাঁহার সুন্দর প্রথমেই মালিনীর সহিত সাক্ষাতের পর, তাহার বাটী যাইতে যাইতে পথে বিদ্যার পরিচয় লয়েন, ও তাহার রূপের কথা মালিনীর মুখে সবিশেষ শুনেন। তৎপরে

"ক্ষণে মাত্র উপনীত মালিনীনিলয়।
রন্ধন ভোজন করে কবি মহাশয়॥
বিনোদ শয্যায় সুখে করিল শয়ন।
পোহাইল বিভাবরী উদয় তপন॥"

প্রাতে মালিনী যথারীতি তাহার মালঞ্চ হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া আনিল, সেদিন সুন্দরের অনুগ্রহে কিছু বেশী ফুল ফুটিয়াছিল। তখন সুন্দর কালী পূজার উপকরণ আনাইবার জন্য মালিনীকে হাটে পাঠাইয়া স্বয়ং মালা রচনা করিলেন। মালিনী হাট হইতে আসিয়া হাটের হিসাব দিয়া সেই মালা বিদ্যার নিকট লইয়া গেল।

হারামের হাড় মাগী—ভারতও তাঁহারি মালিনীকে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম।
গাল ভরা গুয়া পান পাকি মালা গলে।
কাণে কড়ি কড়ে রাঁড়ি কথা কয় ছলে॥

* * * * *

"বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কন্দল বাধায়॥" ইত্যাদি।

মাটিখেয়ে—বৃথায়—যথা ভারতে আছে

"হায় কেন মাটি খেয়ে পড়ানু বিদ্যায়।"

টঙ্কারিয়া হাতে নিতে…ছয়—ভারতে আছে

যটি টাকা দিয়াছিলে সব গুলি খোঁটা।

টাকার নাই সিকি—টাকা প্রতি চারি আনা কমি।

আড়কাঠ আর্কটী টাকা। ভারতে আছে—

"ভাঙ্গাইয়া আড়কাঠ এমনি লাগায় ঠাট"

ডুটাকায় লইলাম…মেষ—পূর্ব্বে কবি বলিয়াছেন, সুন্দর কালী-পূজার দ্রব্যসম্ভার আনিবার জন্যই মালিনীকে বাজারে পাঠাইয়া দেন। হোমার্থ ঘৃত, বলি জন্য মেষ, পূজার জন্য বণিক দ্রব্য, মালিনী এই সমস্ত কিনিয়া আনিয়াছিল। উপহার দ্রব্য—এস্থলে নৈবেদ্যের উপকরণ।

পাঁচকড়া কড়ি…তার মুখ চাই—কবিরঞ্জনের এই স্থানের বর্ণনা দ্বারা মালিনীর চরিত্র বড় সুন্দর স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। বাস্তবিক যাহারা চুরি করে, তাহারা আগেই মুখে এরূপ বলিয়া ফেলে। "ঠাকুর ঘরে কে, না আমি ত কলা খাই নাই" এই প্রবাদ প্রসিদ্ধ। ভারতের মালিনীও বলিয়াছে—

" লেখা করি লহ বাছা ভূমে পাতি খড়ি।
শেষে পাছে বল মাসী হারাইল কড়ি॥ "

গায় করে ফিরা— বাছা তোমার এ মাসী যে সে মেয়ে নয়, আমি পুরুষের কাণ কেটে ছাড়ি। দোকানদারদের ফাঁকি দিয়া টাকার ভুক্তান করিয়া, ফের তাহাদের ঘাড়ে দেনা চাপাইয়া ছাড়ি। ভারতে আছে,

" এ তোর মাসীর বাপা কোন কর্ম্ম নাহি ছাপা॥ "

পুষ্প লইয়া মালিনীর বিদ্যার নিকট গমন।

(৩৮ – ৩৯ পৃঃ)

উল্‌সে…উল্লাসিত হয়, ফুলিয়া উঠে।

গেঁটে—কড়ি, ভারতে আছে,

কাণে কড়ি, কড়ে রাঁড়ি, কথা কয় ছলে।

নিজে ভাল নই— আমার চক্ষুলজ্জা জন্য তোকে শাস্তি দিতে পারি না। বচন নিগ্রহ—বচনের নিগ্রহ—গালাগালি।

বিগ্রহ—শরীর।

মালা দৃষ্টে বিদ্যার উৎকণ্ঠাবস্থা।

(৩৯ — ৪০ পৃঃ।)

অনিমিখে নিরখে প্রমদা— মালার কারিগরি দেখিয়াই বিদ্যা মোহিত হইয়াছিলেন, কেননা তিনি বুঝিয়াছিলেন এরূপ গাঁথা হীরার দ্বারা সম্ভবে না।

দেখিয়াছি পুরুষের হার…দূরে—ভারতে আছে,

" পূজা না হইতে মাগে আগে ভাগে বর।
দেবীরে করিতে ধ্যান দেখয়ে সুন্দর॥

* * * * *

দেবীরে আর্পিতে করে বরে সমর্পণ ॥"

তিলেক বৎসর প্রায় কহে চুপে চুপে—

" বৎসরে তিলেকে, প্রলয় পলকে
কেমনে বাঁচবে বালা।"

এস্থলে কবিরঞ্জনের এরূপ বর্ণনা ভাল হয় নাই। তাঁহার বিদ্যা এই স্থল ব্যতীত আর কোথাও অধৈর্য্য প্রকাশ করে নাই। কবিরঞ্জন প্রায় বরাবরই বিদ্যার চরিত্র বেশ রক্ষা করিয়াছেন। বিদ্যাবতী বিদ্যার যেরূপ হওয়া উচিত—কবিরঞ্জনের বিদ্যা বরাবরই সেই ভাব দেখাইয়াছেন। তবে বিদ্যার বিবাহে যেরূপ আগ্রহ হইয়াছিল, সে অবস্থায় যে রাজপুত্র মালাদিয়া এরূপ বিদ্যা ও কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, বিদ্যা তাহাকে আপনার উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া, যদি তাহাকে শুধু দেখিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে, তবে তাহা দুষণীয় নহে।

ফিরা আমি পায় ধরি তারে—পূর্ব্বমত ইহাও অধৈর্য্য লক্ষণ।

বিরহিণী দেখি আমা··· করতলে—বিদ্যার যথার্থ মনের ভাব কবি এস্থলে বর্ণনা করিয়া, বিদ্যার চরিত্র বেশ রক্ষা করিয়াছেন। এই জন্যই বিদ্যার উৎকণ্ঠা, তাহার অধৈর্য্য মার্জ্জনীয় হইয়াছে।

উন্মত্ত—বিদ্যার অধৈর্য্য জন্য তাহার সখীদের তিরস্কার বেশ সঙ্গত হইয়াছে।

বুঝি হারা পুন তারা·· আদি—তাহার অর্থাৎ সখীগণ বিদ্যাকে এইরূপ জ্ঞানহারা দেখিয়া পুনর্ব্বার বলিল, তুমি যে সারা প্রায় হও দেখিতেছি, তুমি আমাদের বাধ্য নহ আমরা কি করিব।

শ্রী কবিরঞ্জন বলে·· খলির বন্ধনে কোথা থাকে—
কালিদাস বলিয়াছেন,

"কষ্টিপ্সিতার্থে স্থির নিশ্চয়ং মনঃ
নিম্নাভিমুখং পয়ঃ প্রতীপয়েৎ ॥",

ভারত বলিয়াছেন,

"খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট।"

এস্থলে কবি বিদ্যার অধৈর্য্যের প্রকৃত কারণ দেখাইয়াছেন। বিদ্যা বিদ্যাবতী বটে কিন্তু তিনি বিলাসে প্রতিপালিতা কখন "আশা ভঙ্গ দুখ" ভোগ করিতে হয় নাই। তিনি রাজকন্যা তাঁহার স্বতন্ত্র এক মহাল ছিল, তিনি সর্ব্বদা সখীগণে পরিবৃতা থাকিতেন, পিতা মাতা কদাচিৎ তাঁহাকে দেখিতে আসিত বা তত্ত্বাবধারণ করিত। সুতরাং বিদ্যা বরাবরই নিজ ইচ্ছামত কাজ করিতেন। এ সময়েও সেই ইচ্ছা বলবতী হয়, সুতরাং তিনি ধৈর্য্য ধরিতে পারিবেন কেন? তিনি অন্য বিষয় শিক্ষা পাইলেও ধৈর্য্য ধরিতেও শিক্ষা পান নাই। বঙ্কিম বাবু বিষবৃক্ষে নগেন্দ্রের চরিত্র ঠিক এই রূপে কতকটা অঙ্কিত করিয়া, সে চরিত্রের গূঢ় রহস্য বুঝাইয়া দিয়াছেন।

মালিনীর প্রতি বিদ্যার অনুনয়।

(৪১-৪২পৃঃ)

রাখি হার পরিহার— মালা রাখিয়া মালিনী মাসীর নিকট মাপ চাহিল।

বুড়ি নও বুদ্ধি লোপ মমতা সকল গেল দুর—ভারত বলিয়াছেন,

"কহিতে পারি যেহ, কহিয়াছি সেই
আমি লো নাতিনী তোর।"

আদ্যোপান্ত এই ধারা....আমাকে—বিদ্যা এই স্থলে নিজ মুখে নিজ চরিত্র কথা সুন্দর রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। বিদ্যার চরিত্রের এভাব টুকু না বুঝিলে তাহাকে বুঝা যাইবে না।

পরে বিদ্যা রাণীর সহিত যে বাক্‌চাতুরী করিয়াছিল, তাহারও মূল মন্ত্র এই, মাতার উপর বিদ্যার যথার্থ প্রভুত্ব।

অন্যকে ডরান পিতা—স্বয়ং পিতাই আমাকে ভয় করেন, তা অন্যে পরে কা কথা।

সহস্র মাথার কিরা—ভারতে আছে,

মাথার কিরায়, হীরায় কিরায়,

মণি ধরে যেন ফণী।

হীরা কহে করি ছল—ভারতের হীরা বলিয়াছিল,

ছাড় আর বলা জানি সকল।

গোড়ায় কাটিয়া মথায় জল॥

বড়র পিরিতি বালির বাঁধ।

ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেক চাঁদ॥

মরি শোকে নিত্য মোকে...ডাকে কাছে—লোকে আমাকে দেখিয়া প্রত্যহ পরিহাস ছলে বলে যে, রাজকন্যা বিদ্যা তোকে কাছে ডাকে, খুব ভালবাসে। আমার সে কথা শুনিয়া দুঃখ হয়, কারণ তোমার ব্যবহার ত এইরূপ।

এত অন্যাসনে কিবা কাজ—তুমি বড়লোক,আমার মত লোকের সহিত আবার তোমার ঘনিষ্ঠতা কি। ভারতে আছে,

"যাহার লাগিয়া, চুরি করি গিয়া

সেই জন কহে চোর।"

একা রই...লাজ—ভারত বলিয়াছেন,

"কি দেখিয়া বঁধু আসিবে মোর।"

অপ্রতিষ্ঠা...স্থায়ী হয় না—যথা,—

"কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে।

কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে॥"

ভব্যতা—ব্যবহার।

মালিনী ও বিদ্যার কথোপকথন।

(৪২-৪৩পৃঃ)

গুণ সিন্ধুর স্বরূপ—গুণের সাগরের স্বরূপ।
পদ্মসুন্দরাস্য—পদ্মের ন্যায় সুন্দর মুখ।
অনুভাবে—প্রভাবে।

স্নান ছলে আমাকে দেখাও—এই স্থানটী অতি স্বাভাবিক হই-য়াছে। পূর্ব্বেই কবি বলিয়াছেন, সুন্দরকে দেখিতে বিদ্যার উৎকট ইচ্ছা হইয়াছিল। এক্ষণে সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার উপায় করিয়া লইলেন। ভারতে আছে,

"মোর বালাখানার সম্মুখে রথ আছে।
দাঁড়াইতে তাঁহাকে কহিবে তার কাছে ॥"

দাঁতে করি কুটা কাটা— আপনার অপরাধ স্বীকার করিবার প্রধান উপায়।

সুন্দর নিকট বিদ্যার বার্ত্তা কথন।

(৪৩-৪৫পৃঃ)

রত্ন জনে—জহুরী ; কথায় 'বলে রতনেই রতন চিনে।'
তব পত্র পাবা মাত্র—নীচ জাতীয় হীরা এই স্থানে অতি-শয়োক্তি দ্বারা প্রকৃত ঘটনা অনেক বাড়াইয়া বলিয়াছে। ভারতে আছে মালিনী,

"কহিল সকল কথা কুমার সুন্দরে।
শুন বাপা তোমারে দেখিবে অকপটে।
কহিল সঙ্কেত স্থান রথের নিকটে ॥"

বিদ্যাসুন্দরে পরস্পর দর্শন।

(৪৫-৪৬পৃঃ)

বিদগ্ধ বিনোদ—বিমুগ্ধ নায়ক। বিদগ্ধ নায়কের লক্ষণ রস-মঞ্জরী বা রতিমঞ্জরীতে দেখ।

মোহিতা, মোহাতে পড়ে…বালা—রাজ কন্যা সুন্দরের রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতেছে।

উথলে বিরহ সিন্ধু—সুন্দর দর্শনে বিদ্যার সাত্বিক ভাব উদয় হইয়াছিল। যথা,

"স্তম্ভ হয় ঘর্ম্ম বয় লোমাঞ্চ প্রকাশ
বিবর্ণ কম্পন অশ্রু গদ গদ ত্রাস॥
প্রিয় বিনা সুখ যত দুঃখ সে ত হয়।"

মনোমীন…মীনকেতু—মনোরূপ মৎস্যকে মদন বদ্ধ করিয়াছে।

কাম-অহি—অনেকে মনে করেন, দর্শন মাত্র যে মনোবিকার, তাহা স্থায়ী হয় না, তাহা রূপজ মোহ মাত্র। অন্য কারণ পাইলে পরে তাহা হইতে ভালবাসা হইতে পারে, কিন্তু কাম প্রবৃত্তি আর ভাল বাসা এক নহে। প্রায় অধিকাংশ হিন্দু কবি এ দুইই এক মনে করিতেন। তাঁহাদের নিকট দুইই সামান্য ও ত্যজ্য ছিল। তাই ইংরা-জীতে যাহা (Love) বা ভালবাসা এদেশের সাহিত্যে তাহার বর্ণনা অতি বিরল।

দশম দশা—মৃত্যু। বিরহের দশ দশা প্রসিদ্ধ। যথা,

"প্রথমেতে চিন্তা দ্বিতীয়েতে জাগরণ।
তৃতীয়েতে উদ্বেগ চতুর্থে ক্ষীণ তন॥
পঞ্চমে মলিন ষষ্ঠে প্রলাপ বিষাদ।
সপ্তমেতে ব্যাধি হয় অষ্টমে উন্মাদ॥
নবমেতে মোহ হয় দশমে মরণ।
অনুভবে বুঝে লবে দেখিয়া লক্ষণ॥"

সহসা এমন কার্য্য… তথাপিও নব্যা—হীরার এই পরামর্শ অতি সুন্দর এবং পাকা সংসার জ্ঞানীর মত হইয়াছে। বাস্তবিক বিদ্যার গোপন বিবাহে আর কিছু দোষ থাকুক না থাকুক (কারণ গন্ধর্ব্ব বিবাহ শাস্ত্র সম্মত) ইহা যে ভব্যতার বিরুদ্ধ হইয়াছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। বাস্তবিক হীরা যা বলিয়াছে, বিদ্যা পণ্ডিতা হইলেও অপরিণত বয়স্কা, আর সেই জন্যই তাহার এই হিসাবে ভুল হইয়াছিল, ভারতেও আছে।

"হীরা কহে সিহরিয়া, লুকায়ে করিবে বিয়া,
এ কি কথা ছাপা নাহি রবে।"

*   *   *

"তোমার টুটিবে মান, মোর যাবে জাতি মান,
দেশে দেশে কলঙ্ক রটিবে।"

রসময়ী কহে সই…যাবত—বিদ্যার এই উত্তর বড়ই অন্যায় হইয়াছে, পণ্ডিতার মত হয় নাই। যে প্রতিজ্ঞা মনোবেগ দ্বারা ভাসিয়া যায়, সে আবার প্রতিজ্ঞা কি? তাহার প্রতিজ্ঞা করাই অন্যায়।

স্বামী হেন—আমি এই স্বামিই চাই। (অন্য ইতি পাঠান্তর।)

সুন্দর দর্শনে বিদ্যার সখী প্রতি উক্তি।

(৪৭ পৃঃ)

এই স্থানটী বরাবর আদ্য ও অন্ত্য যমকে বর্ণনা করা হইয়াছে।

তনু তনু চিন্তায়—চিন্তায় শরীর শীর্ণ হইল।

জীবন—(১) প্রাণ, (২) জল।

কালী দিলা—দুঃখ দিলা।

ক্ষপা—মত্ত হইয়া। ক্ষপা দিবা—রাত্রি দিন।

সর্ব্ব (শর্ব্ব)—শিব।

নিত্যা—কালী। নিত্যাবধি—বরাবর।

তারা—কালী। তারাপতি—চন্দ্র।

ফের—(১) পুনর্ব্বার। (২) ঘুরাইয়া ফিরাইয়া।

বিদ্যা…প্রসাদে—কবি বলিতেছেন, হে মহাবিদ্যা, তুমি কবি সুন্দরকে প্রসাদ স্বরূপ বিদ্যা দান কর।

বিদ্যাদর্শনে সুন্দরের মোহ।

(৪৭-৪৮ পৃঃ)

অঙ্গে বসি‥অঙ্গ খসি পড়ে—রূপসী আমার মনোমন্দিরে অধিষ্ঠান করিয়াছেন। আনন্দে গাত্র উল্লাসিত হইয়া উঠিল।

আস্যবর হাস্যোদর—গাল ভরা হাসী মুখ।

চিন্তাকুল ঈশ—ঈশ্বর অনেক যত্ন করিয়া তিল ফুল গড়িয়াও তাহা বিদ্যার নাসিকার তুল্য করিতে পারিলেন না, বলিয়া বড় চিন্তাকুল হইলেন।

লোল দৃষ্টি বিষ—বিলোল কটাক্ষ বিষ বরিষণ করে—মনকে জর্জ্জরিত করে।

শিশু অলি কুন্দকলি মাঝে—সে কালে দাঁতে মিসি দিবার নিয়ম ছিল। তাই কুন্দ ফুলের ন্যায় সাদা দাঁতের মাঝখানের মিসির ঈষৎ রেখার সহিত শিশু ভ্রমরের তুলনা হইয়াছে।

নীলগিরি শুকপুরি—বিদ্যার স্তনদ্বয় নীলপর্ব্বতের ন্যায় পীনোন্নত, অথচ এত কোমল যে, তাহা শিরীষ পুষ্প নির্ম্মিত বোধ হয়। আর তাহার স্তনাগ্রভাগ (বা বোটা, চুচুক) ভৃঙ্গের ন্যায় কৃষ্ণ বর্ণ, বোধ হয় যেন পুষ্পোপরি ভৃঙ্গ বসিয়া রহিয়াছে।

মঞ্জুরব…রঙ্গ—মনোহর স্বর যেন মদনের উৎসব ক্ষেত্র বলিয়া বোধ হয়।

বিদ্যাসুন্দরের প্রথম দর্শন কালে পরস্পরের রূপ বর্ণনা কবিরঞ্জনের নূতন। ভারতে এরূপ বাহুল্য বর্ণনা নাই।

বিদ্যা কর্ত্তৃক ভগবতীর স্তব।

(৪৮-৪৯ পৃঃ)

তুমি নিত্যা পরাৎপরা···ভাণ্ডোদরা—ভারতও বলিয়াছেন,

"তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি হরি হর।
তুমি জল তুমি বায়ু তুমি চরাচর॥
তুমি আদি তুমি অন্ত তুমি মধ্য হও।
পঞ্চ ভূতময় পঞ্চ ভূতময় নও॥"

অন্যত্র,

"মাটী কাট পাথর প্রভৃতি চরাচর।
পুরাণে কোরাণে দেখ সকলি ঈশ্বর॥"

অন্যত্র,

বিধি বিষ্ণু শিব আদি নানা মূর্ত্তি ধর।
(ইহার অর্থ অন্নদা মঙ্গলের টীকায় দেখ)

ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী—যাহার উদরে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড লীন রহিয়াছে।

তুমি শান্তি···মেধা—অর্থাৎ সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা—মানুষের স্বেচ্ছায় কিছুই হয়না, আর ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই নাই।

(ইহার টীকা দেখ)

করাল—কাল।

শক্তিরূপা সর্ব্বভূতে—ভারতে আছে,

জগৎ জননী মাতা সবারে সমান।
শক্তি রূপে সবার শরীরে অধিষ্ঠান॥

*   *   *

সকলে সমান যেন চন্দ্র সূর্য্য তারা।
তেমনি সকলে সমা অন্নপূর্ণা সারা॥
(ইহার টীকা দেখ)

কুলকুণ্ডলিনী চক্র বিভেদিনী—ইহা যট্‌চক্রের কথা। সাধক ব্যতীত ইহার তত্ত্ব কেহই বুঝিবেন না। আমাদের শরীরের মধ্যে ত্রিগুণাত্মক ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ী আছে, তাহাকে রূপকে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী বলে। এই সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে চিত্রা নাড়ী ও চিত্রা নাড়ীর মধ্যে ব্রহ্ম নাড়ী আছে। এই চিত্রা নাড়ীতে কুণ্ডলাকার, নাড়ি ছয়টী চক্র আছে। ব্রহ্মনাড়ী এই কয়টী চক্র ভেদ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রার পথ পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। এই কয় চক্রের মধ্যে মূলে চতুর্দ্দলবিশিষ্ট স্বাধিষ্ঠান বা মূলাধার নামক যে চক্র আছে, তাহার ঠিক মধ্যস্থলে সদাশিব পদ্মোপরি আসীন আছেন এবং তাঁহার মস্তকে কুণ্ডলিনী শক্তি স্বার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে সর্পের ন্যায় "সাড়ে তিন পেঁচে" বিরাজিতা আছেন। এই কুণ্ডলিনীর মুখ হইতে ব্রহ্ম নাড়ীর মধ্য দিয়া অমৃতময় মায়া নাড়ী বহির্গত হইয়া তাহা ছয়টী চক্র ভেদ করিয়া ব্রহ্ম রন্ধ্রে মূলাধারে গিয়া মিলিত হইয়াছে। কবিরঞ্জন কালীকীর্ত্তনে বলিয়াছেন,

"আধার কমলে থাক কুল কুণ্ডলিনী।"

তাঁহার পদাবলীতে আছে,

কুল কুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী তারা তুমি
আছ গো অন্তরে।
এক স্থান মূলাধার আর স্থান সহস্রার
আর স্থান চিন্তামণি পুরে॥
শিব শক্তি সব্যে বামে জাহ্নবী যমুনা নামে
সরস্বতী মধ্যে শোভা করে।
ভুজঙ্গ রূপা মোহিতা স্বয়ম্ভুতে সুনিদ্রিতা
এই ধ্যান করে ধন্য নরে॥

অন্যত্র,

মূলে পৃথ্বী ব,স, অন্তে. চারি পত্রে মায়া ডাকিনী
সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে শিরে ঘেরে কুণ্ডলিনী ॥

"যে কুণ্ডলিনী শক্তি বায়ু এবং অগ্নির সূক্ষ্মাংশ তড়িন্ময় বলা যায়, ঐ শক্তি মেরুদণ্ডের মধ্যে থাকিয়া জ্ঞান ইচ্ছা ও ক্রিয়া এই তিন রূপে বিভক্ত হইয়া, কি বাহ্যান্দ্রিয়ের কার্য্য কি আন্তরিক যন্ত্র কার্য্য, সমস্তই প্রবর্ত্ত করিতেছে। সংখ্যা শূন্য বায়ুবাহিনী নাড়ী মেরু দণ্ডে সংলগ্ন। এই সকল নাড়ী পথে তড়িন্ময় সূক্ষ্ম বায়ু সহকারে জ্ঞান, ইচ্ছা, ও ক্রিয়া শক্তি শরীরে এবং শরীরস্থ সমস্ত যন্ত্রে সংযোজিত হয়।

(যোগশিক্ষাসোপান ২ ভাগ ৮ পৃঃ)

ত্রিগুণা সচ্চিদানন্দ রূপিনা—নিরাকার ব্রহ্মই সচ্চিদানন্দময়।
ভারত বলিয়াছেন,

"নিরাকার ব্রহ্ম তিন রূপেতে সাকার।
সত্ব রজ তম গুণ প্রকৃতি তাঁহার ॥" ॥

লিখন কন্দ—বোধ হয় অর্থ, —স্কন্দ পুরাণে অথবা স্কন্দজামলতন্ত্রে, লিখিত আছে। কালি মন্ত্রের প্রথমেই আছে,—

"যক্ষকন্দঃ সমুদ্ধৃত্য বহ্নি বামাক্ষি সংযুতং।
ইন্দু বিন্দু সমাযুক্তং কালীবীজমিদং স্মৃতং ॥"

স্থূল সূক্ষ্মা ধরণী ধারিণী—ভারতে আছে,

"প্রকৃতি পুরুষ রূপা তুমি সূক্ষ্ম স্থূল।
কে জানে তোমার তত্ব তুমি বিশ্বমূল ॥"

কবিরঞ্জন ও কালীকীর্ত্তনে ব'লয়াছেন,

"প্রকৃতি পুরুষরূপা তুমি সূক্ষ্ম স্থূলা।
কে জানে তোমার মূল তুমি বিশ্বমূলা ॥"

সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারিণী—ভারত বলিয়াছেন

"বিধি বিষ্ণু শিব আদি নানা মূর্ত্তি ধর।
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় লীলায় নৃত্য কর ॥"

"সেই পতি দেহি—পাঠক এই স্থান হইতেই বুঝিবেন, যে বিদ্যা

বরাবরই সুন্দরকে পতিরূপে পাইবার জন্য কালীকে প্রার্থনা করিয়াছেন। তাহার কথনই অন্য বাসনা ছিল না।

পড়িল প্রসাদ জবা ফুল—কোন কামনা করিয়া ইষ্টদেবতার অভিপ্রায় জানিতে হইলে, ঘটের উপর ফুল চাপাইয়া দিতে হয়। ফুল পড়িয়া যাইলে দেবতা সুপ্রসন্ন হইলেন বুঝি তে হইবে। ইহাকে চলিত কথায় ফুল কাড়ান বলে।

তোমার হৃদেশ এই—বিদ্যাও সুন্দরের ন্যায় কালীর আদেশে সুন্দরকে গন্ধর্ব্ব বিধানে পতিত্বে বরণ করেন। তাহাতে অভব্যতা থাকিতে পারে, কিন্তু কোন পাপ ছিল না।

প্রতুল—তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে অর্থাৎ সুন্দরকে পাইবে।

বিদ্যার বাসর সজ্জা।

(৪৯—৫০ পৃঃ)

ভক্ষ্য দ্রব্য—পাঠকগণ কবিরঞ্জনের সময়ের ভাল খাবার কি কি ছিল দেখিয়া লউন। সে সময়েও লুচির ব্যবহারও এদেশে প্রচলিত ছিল।

ভক্ষণে…ক্রীড়া—বৈদ্যগ্রন্থমতে পান খাইলে শরীর গরম হয়—ও তাহাতে কামোত্তেজনা বৃদ্ধি হয়।

এই স্থলে কবিরঞ্জন তাঁহার বিদ্যার চরিত্রের উৎকর্ষতা বেশ রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার বিদ্যা সুন্দরকে প্রথমে স্নানের সময় বকুল তলায় দেখিয়া উৎকণ্ঠিতা ও মালিনী কর্তৃক তিরস্কৃতা হইয়াছিলেন বটে কিন্তু তাহার সে ভাব ক্ষণস্থায়ী মাত্র। ভারতের বিদ্যার গোপনে বিবাহ করিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল,

তেঁই বলি চুপে চুপে, বিয়া হয় কোন রূপে,
শেষে কালী যা করে তা হবে॥

কবিরঞ্জনের বিদ্যা কিরূপে সুন্দর সমাগম হইবে তাহা মনে না করিয়া সুন্দরকে পতিরূপে পাইবার জন্য কেবল

কালীর আরাধনা করিয়াছিল মাত্র। কালীর আদেশে সেই রাত্রেই সুন্দর সমাগম হইবে জানিয়া, বিদ্যা যথারীতি বাসর-সজ্জা করিল, তাহার কালীর আদেশে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—তাই বিদ্যা কিরূপে সুন্দর সমাগম হইবে না জানিয়াও বাসর-সজ্জা করিল। ভারতের বিদ্যাও সেই রাত্রে সুন্দরকে পাইবার চেষ্টায় ছিল—কিন্তু সে জানিত না যে কিরূপে সুন্দর তাহার নিকট আসিবে,

"ওথায় সুন্দরী, লয়ে সহচরী,
ভাবেন মন আকুল।
করিয়া কেমন, আসিবে সেজন,
ঘুচিবে দুঃখের মূল॥
কি করি বলনা, আলো সুলোচনা,
কেমনে আনিবে তারে।"

কবিরঞ্জনের বিদ্যার এরূপ ভাবনা ভাবিতে হয় নাই।

বাসর...সজ্জা—রসমঞ্জরীতে আছে,

"পতি হেতু বাসঘরে যেই করে সাজ।
বাস সজ্জা বলে তারে পণ্ডিত সমাজ॥"

(ইত্যাদি ২১ পৃঃ।)

কবির ভগবতী স্তব।

(৫০—৫১ পৃঃ)

দুরন্ত...প্রহরী—ভারতে আছে,

কোটাল দুরন্ত থানা দুয়ারে দুয়ারে।
পাখি এড়াইতে নারে মানুষে কি পারে॥
আকাশ পাতাল ভাবি না পেয়ে উপায়।
কালীর চরণ ভাবি বসিলা পূজায়॥"

প্রধানা...প্রকৃতি—মূল প্রকৃতি। ভারত বলিয়াছেন,

অন্নপূর্ণা মহামায়া, সংসার যাঁহায় মায়া,
পরাৎপরা পরমা প্রকৃতি।"

সিদ্ধিদা—সর্ব্বসিদ্ধি দাত্রী। (ইহার টীকা দেখ।)
তুমি হরিহর ধাতা,—তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহাদেবের প্রসবিত্রী।
বচ্ছ—বৎস, বাছা।
পরিণয়—এস্থলেও কালী সুন্দরকে পরিণয় সম্বন্ধে আদেশ দেন। বাস্তবিক ধর্ম্মসঙ্গত পরিণয় ব্যতীত অন্য কোন ইচ্ছা বিদ্যা বা সুন্দরের কথনও মনেও হয় নাই।
অকস্মাৎ···তথা—কালীর কৃপায় সুড়ঙ্গ আপনিই প্রস্তুত হইল। অথবা তাহা সুন্দর প্রথম দেখিতে পাইলেন। ভারতের সুন্দরকে কালী এত অনুগ্রহ করেন নাই—কেবল সন্ধি কাটিবার উপায় বলিয়া দিয়াছিলেন,

" স্তবে তুষ্টা ভগবতী প্রসন্না হইয়া।
সন্ধি কাটিবারে দিলা উপায় করিয়া॥
তাম্র পত্রে সন্ধি মন্ত্র বিশেষ লিখিয়া।
শূন্য হইতে সিঁধকাটি দিলা ফেলাইয়া॥"

প্রসাদের...বাণী—কবি, এইরূপে অকস্মাৎ সুড়ঙ্গ হওয়া যে অসম্ভব নহে, কালীর কৃপায় সকলই হয়—তাহাই বুঝাইবার জন্য বলিলেন " ভক্তের ভবানী—পূরাইলা মনোরথ।"

কবির সুড়ঙ্গ পথে গমনোদ্যোগ।

(৪।৫১—৫২ পৃঃ)

বিজ্ঞবর...হৃষ্ট—কবি এইরূপে হঠাৎ বিদ্যার মন্দির পর্য্যন্ত বরাবর কালীর কৃপায় সুড়ঙ্গ হইল দেখিয়া, ভাবিলেন, লজ্জারূপিণী লজ্জা নিবারিণী কালী তাহার লজ্জা নিবারণ করিলেন বা বাসনা পূর্ণ করিলেন। কবি তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণা করিয়া মহা আহ্লাদিত হইলেন।
হ্রী—লজ্জা।
রস—এস্থলে সজ্জা।—ভারতে আছে,—

বিদ্যার নিবাস যাইতে উল্লাস
সুন্দর সুন্দর সাজে।
কি কহিব শোভা রতি মনোলোভা
মদন মোহিত লাজে॥
চলিল সুন্দর রূপ মনোহর
ধরিয়া বরেব বেশ।"

চামীকর—কষিত কাঞ্চন।

কলিত—ধ্বনিত।

আলো করে...অঙ্গচ্ছবি—ভারতের সুড়ঙ্গই আলোময়। যথা,

" ঊর্দ্ধে পাঁচ হাত আড়ে অর্দ্ধেক তাহার।
স্থলে স্থলে মণি জ্বলে হরে অন্ধকার॥"

বিদ্যার উৎকণ্ঠাবস্থায় সুন্দরের দর্শন।

(৫২—৫৪ পৃঃ)

যামিনী···মধু—মধুময় বসন্ত কালের রাত্রি—অথবা নায়ক নায়িকার প্রথম মিলনের যামিনীকেই " মধুযামিনী " বলে।

মুখরিত—গুঞ্জরিত, ঝঙ্কারিত।

নাহি···সুখ—ভারত এ স্থলে বিদ্যার যেরূপ অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন—কবিরঞ্জন সেরূপ করেন নাই।

ইহাকে পূর্ব্বরাগ বলে। তাহার লক্ষণ,—

" অঙ্গ সঙ্গ হওনের পূর্ব্বে যে লালস।
তারে বলি পূর্ব্বরাগ তাহে দশা দশ॥
লালস উদ্বেগ জড় কৃশ জাগরণ।
ব্যগ্র রোগ বায়ু মোহ নিদানে মরণ॥"

রসজ্ঞ ভারত এই পূর্ব্বরাগ যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—কবিরঞ্জন সেরূপ করেন নাই।

সব সখী সম্বলিতা চন্দ্রমুখা চমকিতা—ভারতে আছে,

"সুড়ঙ্গ হইতে উঠিলা ত্বরিতে
ভূমিতে চাঁদ উদয়॥

দেখি সখীগণ চমকিত মন
বিদ্যার হইল ভয়॥
হংসীর মণ্ডল যেমন চঞ্চল
রাজহংস দেখি হয়॥"

কবিরঞ্জনের বিদ্যা, সুন্দরকে হঠাৎ দেখিয়া চমকিতা হইয়াছিলেন বটে—কিন্তু তিনি কালীর প্রসাদে সুন্দর সমাগমের কথা পূর্ব্বে জানিতেন বলিয়া তাহার ভীত হইবার কোন কারণ ছিল না। ভারতের বিদ্যা সখীর দ্বারা প্রথমে পরিচয় চাহিলেন (অথচ পূর্ব্বে রথপার্শ্বে দেখিয়াছিলেন)। কবিরঞ্জনের বিদ্যা সেরূপ না করিয়া সুন্দরকে যথাযোগ্য পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া সম্মান করিলেন।

বিদ্যা ও সুন্দরের বিচার।

(৫৫—৫৬ পৃঃ)

ভারতে সুন্দরের পরিচয় বলিয়া যে চমৎকার বর্ণনা আছে, তাহা কবিরঞ্জনে নাই। ভারতের তাহা সম্পূর্ণ নূতন। তাঁহার 'তড়িত ধরিয়া রাখে' প্রভৃতি বর্ণনাও অতুল।

কামদেব...ব্যাধ তুল্য—রমণী মন-মৃগ বধার্থ কুমার কবি এস্থলে ব্যাধরূপ মদন স্বরূপ।

মানভঙ্গ...রঙ্গ—সুন্দরের দৃষ্টি মাত্রেই মানিনীর মানভঙ্গ হইয়া গিয়া পুনর্ব্বার রঙ্গরসের স্রোত বহিতে থাকে।

গোমধ্যা—সিংহের ন্যায় মধ্যদেশ বা কটী যাহার। ভারতে আছে,

" সিংহের মাজার সম মাজার বলন।"

গোযুগ—নয়নযুগল।

বিদ্যাসুন্দরের বিচার ভারতে ও কবিরঞ্জনে প্রায় একরূপ। সেই ময়ূর ডাক, সেই সংস্কৃত শ্লোক—সবই এক। তবে বিচারের শেষ ভাগ ভারতের বড় সুন্দর—কবিরঞ্জনের তাহা

বিশদ হয় নাই। এই সংস্কৃত শ্লোকগুলি ভারত বা কবিরঞ্জনের রচিত নহে—তাহা পূর্ব্বাবধিই প্রচলিত আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, বররুচিকৃত বিদ্যাসুন্দরে ইহা প্রথমে সন্নিবেশিত হয়। কিন্তু তাহা স্থির বলা যায় না। ভারত ও কবিরঞ্জন বাঙ্গালা ছন্দে এই সকল শ্লোকের স্বতন্ত্ররূপে অর্থ করিয়াছেন—এই মাত্র।

গো—ভারতে আছে,

"এ শ্লোকে গো শব্দে সিংহ, লোচন, ধরণী॥"

সহস্র গোভূষণ কিঙ্কর—

"সহস্র লোচন ইন্দ্র দেবরাজ ধীর।
তাহার কিঙ্কর মেঘ গরজে গভীর॥"

গোভৃৎ শিখর—"পর্ব্বত ধরণীধর তাহার শিখরে।"

গোকর্ণ শরীর ভক্ষ—

"লোচন শ্রবণ পদে বুঝহ ভুজঙ্গ।
তাঁহার ভক্ষক ডাকে ময়ুর বিহঙ্গ॥"

স্বজোনি ভক্ষক ধ্বজ—

"আপনার জন্ম স্থান ভক্ষয়ে অনল।
তার ধ্বজ ধূম উঠে গগণ মণ্ডল॥
তাহাতে জনমে মেঘ।"

তিমিরারিবিম্বপ্রতিবিম্বধারী—

"তম অন্ধকার তার অরি চাঁদ এই।
যার পুচ্ছে চাঁদ ছাঁদ"—(ময়ূর)॥

পবন ভক্ষের ভক্ষ—

"পবন অশন করে জানহ ভুজঙ্গ।
তাহারে আহার করে ময়ুর বিহঙ্গ॥"

বসু—ধন। লক্ষ্মী বন্দনায় আছে,

সর্ব্ব গুণহীন যদি ধনবান হয়।
তৃণতুল্য দ্বারে তার কত গুণালয়॥"

করভোরু রতি প্রস্তে—

"করিসুত শুণ্ড সম উরুবর শোভা।
রতির পণ্ডিতা শুন আমি তার লোভা॥"

দ্বিতীয়ে পঞ্চমে—দ্বিতীয় পঞ্চম অক্ষরে। কবিতার প্রথম চরণের দ্বিতীয় ও পঞ্চম অক্ষর "সু"। দ্বিতীয় চরণের "ন্দ"। এবং তৃতীয় চরণের "র"—ইহাতে "সুন্দর" হইল।

এক বস্তু তিন কিন্তু একে তিন ভাব—
এই প্রহেলিকার প্রকৃত অর্থ বুঝা যায় না। কবি নিজেই বলিয়া ছেন,

কালী কিঙ্করের কাব্য কথা বুঝা ভার।
বুঝে কিন্তু সে কালী-অক্ষর হৃদে যায়॥"

আমাদের হৃদে কালী অক্ষর নাই, সুতরাং ইহার অর্থ আমাদের না বুঝাই সঙ্গত। শাস্ত্র মতে এক প্রকৃতি হইতেই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর উদ্ভূত হইয়াছেন।

ভারত বলিয়াছেন,

"ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব হয় আমার শরীর।
অভেদে যেজন ভজে সেই ভক্ত ধীর॥"

কবিরঞ্জন অন্যত্র বলিয়াছেন,

"ভবানী শঙ্কর বিষ্ণু এক ব্রহ্ম তিন।
ভেদ করে সেই মূঢ় জন প্রজ্ঞাহীন॥"

সুতরাং হরি হরে ভেদ করা সঙ্গত নহে। সেইরূপ শিব ও শক্তিতে ভেদ করা যায় না। বোধ হয়, এই জন্যই কবি বলিয়াছেন, এক প্রকৃতি হইতেই যখন তিন গুণের বা ব্রহ্মাদির উৎপত্তি তখন ইহাদের একজনকে ভজনা করিলেই তিন জনকে ভজনা করা হয়।

আদ্য অন্ত যেটা—বোধ হয় রজঃ ও তমো গুণ, ব্রহ্মা ও শিব বা ক্রিয়াশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি। সুতরাং ইহার দ্বারা আমাদের মনে বাসনায় উদয় হয়, আমাদিগকে ক্রিয়াশীল করে। তবে ইহাদের সাধনায় আমাদের মুক্তি হয় তাহা সত্য।

বর্ণচারি—বোধ হয় কালীর চারি অক্ষরী বীজ মন্ত্র—সুতরাং এই মন্ত্র গ্রহণ করিলে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হয়। অথবা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চারি বর্ণই শ্রেষ্ঠ। এই সকল বর্ণোচিত শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালন দ্বারা তাহা আশ্রয় করিলে পরিণামে চতুর্বর্গ ফল লাভ হয়।

কবি অন্যত্র বলিয়াছেন—

" বৈশ্য ক্ষত্র বৈদ্য শূদ্র, নিত্যানন্দ বীরভদ্র
কুর্ম্ম ভাল নহে যেবা কহে।
তার কিন্তু নাহি স্বর্গ শুন কহি ধীর বর্গ
সেও পাপী সে সঙ্গে যে রহে॥"

পঞ্চ সুপ্রচার—বোধ হয় পঞ্চায়তনী দীক্ষা। গুরুর কৃপায় এই দীক্ষা পাইলেই এই সমস্ত গুহ্য কথা জানা যায়।

বিদ্যাসুন্দরের বিবাহ।

৫৬—৫৮ পৃঃ

স্বয়ম্বরা···মালা—ভারতে আছে,

"হরগৌরী সাক্ষী করি দিল বরমালা।"

এই স্থানে মুদ্রিত পুস্তকে ভ্রম আছে, স্পষ্টই দেখা যাই-তেছে।

" উত্তম ঘটক" হইতে "সম্প্রতি রহিল" পর্য্যন্ত ২২ ছত্রের বর্ণনা বিবাহের বর্ণনা নহে। পাঠক ভারতের "বিদ্যাসুন্দরের কৌতুকারম্ভের প্রথম অংশ দেখিলে স্পষ্টই বুঝিবেন, ভারত অবিকল এইরূপ বর্ণনা করিয়া শেষে বলিয়াছেন,

"বুঝহ চতুর এই প্রচ্ছন্ন বিহার।"

অবশ্য কবিরঞ্জন স্পষ্টই ইহার দ্বারা অন্য কিছু বর্ণনা করেন নাই। বোধ হয় প্রথম মুদ্রাঙ্কন কালে, মুল পুস্তকে এইরূপ গোলযোগ হইয়াছে। এই জন্য

"পরাভব মানি সুখী বীরসিংহ বালা।

স্বয়ম্বরা কান্তকণ্ঠে সমার্পীল মালা ॥”
এবং “সুশীতল সময় মলয় মন্দ বহে।
স্মর হানে খরসর ভর কত সহে ॥”

প্রভৃতি কবিতা দুই বার করিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে এস্থানটী এইরূপ হওয়া আবশ্যক।

শুভক্ষণে অন্যান্য দর্শন কুতুহলী।
সহচরীগণ রঙ্গে দেয় হুলাহুলি ॥
পতি প্রদক্ষিণ সতী করে সপ্তবার।
সুধার সাগরে ভাসে তনু দোঁহাকার ॥
সুন্দরীরে সমর্পিলা সুন্দরের হাতে।
সুন্দর সিন্দুর দিলা সুন্দরীর মাথে ॥
এই তব দাসী গুণরাশি মিথ্যা নহে।
আড়ালে আসিয়া আলি আড়িপাতি রহে ॥
নানা উপহার কবি করিয়া ভোজন।
কর্পূর তাম্বুলে করে মুখের শোধন ॥
মাস মধু ডাকে মধুকর বধুচয়।
কুলবধু কামবধু ইচ্ছা অতিশয় ॥
সুশীতল সময় (মরুত) মলয় মন্দ বহে।
স্মর হানে খরসর ভর কত সহে ॥
পরাভব মানি সুখী বীরসিংহ বালা।
স্বয়ম্বরা কান্ত কণ্ঠে সমর্পিলা মালা ॥
উত্তম ঘটক সুন্দরের গাঁথা হার।

* * *

দক্ষিণা পশ্চাতে হবে সম্প্রতি রহিল ॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

এইরূপ হইলেও কতকটা, যেন সংলগ্ন বলিয়া বোধ হয়। সম্ভবতঃ এই স্থানের কোন কোন কবিতা পূর্ব্ব হইতেই একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

ইহার অন্যরূপ পাঠও কল্পনা করা যায়, যথা,—
"পরাভব মানি সুখী বীরসিংহ বালা।
স্বয়ম্বরা কান্ত কণ্ঠে আরোপিল মালা॥
পতি প্রদক্ষিণ সতী করে সপ্তবার।
সুধার সাগরে ভাসে তনু দোঁহাকার॥
সুভক্ষণে অন্যান্য দর্শন কুতুহলী।
সহচরীগণ রঙ্গে দেয় হুলাহুলী॥
সুন্দরীরে সমর্পিলা সুন্দরের হাতে।

*   *   *

দক্ষিণা পশ্চাতে হবে সম্প্রতি রহিল॥
(মধ্যস্থলের পাঠ ঠিক পূর্ব্বমত।)

জালালি ফকীর—অত্যন্ত রুক্ষ স্বভাব বৈরাগী ফকির বা নাগা সন্ন্যাসী।

চন্দন সময়—মালাচন্দনের সময় বৈদ্য, কায়স্থ সমাজে প্রাধান্য লইয়া, কুলীন মৌলিকে মহা বিবাদ হয়। অন্য কোন দলে এরূপ হয় কি না জানি না।

দম্পতি—(১) বিদ্যা ও সুন্দর। (২) কাম ও রতি।

শৃঙ্গার উপক্রমে বিদ্যার বিনয়।

(৫৮-৬০ পৃঃ)

এই সকল অশ্লীল অংশ বর্ণনা করা সে সময়ের কবিদিগের প্রথা ছিল। ভারতচন্দ্রের কাব্য সমালোচনায় প্রথমেই তাহার দোষ গুণ বিচার করা হইয়াছে সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখের আবশ্যক নাই।

তোটক ছন্দ—এই ছন্দে দুই ছত্রে বারটী করিয়া অক্ষর বা স্বর। তন্মধ্যে প্রত্যেক তৃতীয় স্বর গুরু, বাকী সমস্ত লঘু হওয়া আবশ্যক। কবিরঞ্জনের অনেক স্থলেই ছন্দ পতন হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ৩, ৮, ৯, ১৮, ১৯, ২০, ২২ প্রভৃতি ছত্র দেখ।

শৃঙ্গারে পরস্পর উক্তি।

(৬১-৬২ পৃঃ)

এই স্থান বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের অনুকরণে বর্ণিত হইয়াছে। এসম্বন্ধে কবিরঞ্জনের বর্ণনা ভারতের বর্ণনা অপেক্ষা অনেক প্রচ্ছন্ন।

বঞ্চন যামিনী—দেহ মলিন হইয়াছে।

সোহত—তাহা হইতে।

বিদগ্ধ রাজ—রসিক। রসমঞ্জরীতে আছে,

"বিদগ্ধ দ্বিমত হয় বাক্যে আর কাজে।
কথা শুনি কার্য্য দেখি বুঝিবা অব্যাজে॥"

কৈসন—তোমার ধর্ম্ম কিরূপ।

উয়ল নিরমল ছন্দ—মনে নানারূপ রঙ্গরসের উদয় হইল। বোধ হয় এ পাঠটি "উয়ল নিরমল চন্দ" হইবে। কেন না, ইহার পরেই "মধু বিভাবরী" প্রভৃতি পদ রহিয়াছে।

বিচেড়ু বয়েসি—উঠন্ত বা উচক্কা বয়সী।

শৃঙ্গারে সখীগণের ব্যঙ্গোক্তি।

(৬২-৬৩ পৃঃ)

অকারে হকার···সংযুক্ত—আহা

কন—মৃদু।

ঈষ—ঈর্ষা।

অথ বিপরীত শৃঙ্গার।

(৬৩-৬৫ পৃঃ)

এই সকল অশ্লীল অংশের বর্ণনা ভারতের অনেক উৎকৃষ্ট। সুধু তাহাই নহে, ভারতের বর্ণনার কিছু বাড়াবাড়ি আছে। আরও ভারতের বিদ্যা যত অধীরা কবিরঞ্জনের বিদ্যা সেরূপ নহে। ভারতের বিদ্যা সুধু দিবসে সুন্দরকে দেখিতে পাই-তেন না তাহাতেই অধীর হইতেন,

"পলকে পলকে মোর প্রলয় সমান।"

কবিরঞ্জন এইরূপ অধীরতা বা বিরহ বর্ণনা করেন নাই।

কহিলা সকল কথা বসি তার পাসে—কবিরঞ্জন হীরাকে যেরূপ নীচজাতীয় করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে সুন্দরেরও তাহাকে এরূপ বিশ্বাস করা ভাল হয় নাই। স্ত্রীলোক, বিশেষতঃ নীচজাতীয় স্ত্রীলোক কখন কোন কথা গোপন করিতে জানে না ইহাই প্রসিদ্ধ। তবে কবিরঞ্জনের হীরা নীচ বা দুষ্ট হইলেও তত স্বার্থপর নহে, তাহার অনেক গুণও ছিল। কবি তাহা পরে বর্ণনা করিয়াছেন। বিশেষ কবি এই গোপনীয় বিবাহকে কোনরূপ অন্যায় কার্য্যরূপে বর্ণনা করেন নাই। আরও এক কথা সুন্দর অত্যন্ত কালীভক্ত ছিলেন, তাঁহার মতে,

"ভবিষ্যৎ কর্ম্ম এইক্ষণ কেন ভাবি।"

সুতরাং তখন তাঁহার ভবিষ্যৎ ভাবনা ছিল না, সমস্তই কালীর উপর নির্ভর ছিল। লুক্কোচুরি করিবার কোন আবশ্যক ছিল না। ভারতের বিদ্যা ও সুন্দর এবিষয়ে অনেক লুকোচুরি খেলিয়াছিলেন। যথা,

"এত বলি বিদায় হইলা থুথি ধরি।
মালিনীরে না কহিও কহিলা সুন্দরী॥

*   *   *

"সখীগণে সুন্দরী কহিল আঁখি ঠারে।
রাত্রের সংবাদ কিছু না কহ ইহারে॥"

সুধু তাহাই নহে। তাহারা উভয়ে মালিনীকে প্রতারণাও করিয়াছিল এরূপ ব্যবহার বড়ই নিন্দনীয়। যথা,

বুঝহ চতুর সব একি চাতুরালি।
কুটনীরে ফাঁকি দিয়া করে নাগরালি॥
যেমন নাগর ধূর্ত্ত তেমনী নাগরী।

কবিরঞ্জন তাঁহার নায়ক নায়িকার মহত্ব ব্যতীত কখনও ধূর্ত্ততা বর্ণনা করেন নাই।

পরদিন মালিনী ও বিদ্যার রহস্য কথোপকথন।

(৬৫-৬৭পৃঃ)

কি কর শাগুড়ে ব'সে—আজি পর্য্যন্ত এইরূপ কদর্য্য শাগুড়ে, বৌও, মৈয়ে, প্রভৃতি তামাসা বাঙ্গালার সর্ব্বত্র-বিশেষতঃ বৃদ্ধ-মহলে যথেষ্ট প্রচলিত আছে। ভারতে একস্থলে আছে,

"কন্যার মা হবে লোভা।"

বিদ্যার মান ভঞ্জন।

(৬৭-৬০ পৃঃ)

ভারত অপেক্ষা কবিরঞ্জন, বিদ্যার মানের কারণ কিছু গুরুতর করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, ভারতে বিদ্যার মানের কারণ অতি সামান্য। থুৎকারে ফুৎকারে আঁখির আড়াল হইলে অমনি মান আসিয়া উপস্থিত হইত। তবে কবিরঞ্জনের মান ভঞ্জনের পালাটী তত ভাল হয় নাই—ভারত আরও জাঁকাল রকমে রং ফলাইয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

দিবাভাগে নানা রূপ ধরে গুণধর—ভারতে আছে,

"কৌতুকে কামিনী লয়ে যামিনী পোহায়।

*   *   *   *   *

নগর ভ্রমণে যায় দ্বারে কুঁজি দিয়া॥
আগে হইতে বহুরূপ জানে যুবরাজ।
নাটুয়ার মত সঙ্গে আছে কত সাজ॥
কখন সন্ন্যাসী ভাঁড় ভাট দণ্ডধারী।
বেদে বাজীকর বৈদ্য বেণে ব্রহ্মচারী॥"

তাড়ঙ্ক দোলায়ে…শিব—বিদ্যা কাণের কুণ্ডল দোলাইয়া ছলে তদ্বারা "জীব" এই কথা বলিয়া প্রকারান্তরে কল্যাণ কামনা করিলেন। ভারতে আছে,—

" চতুর কুমার ভাবে, জীব বাক্যে মান যাবে
হাঁচিলেক নাকে কাটি দিয়া।
চতুর কুমারী ভাবে জীব কৈলে মান যাবে,
জীব কব কথা না কহিয়া॥
জীব বুঝাবার তরে, আপন আয়তি ধরে,
তুলি পরে কণক কুণ্ডল। "

আহারে…লাজ—চলিত কথা আছে, " আহারে বিহারে চৈব ত্যক্তলজ্জা সদা ভবেৎ। "

ফিরাদেহ মদর্পিত চুম্ব আলিঙ্গন—ভারতের অন্যত্র আছে,

" দিয়াছি যে আলিঙ্গন, দিয়াছি সে যে চুম্বন,
সে সব ফিরিয়া মোরে দেহ।
কল্যাণ করুণ কালী, নাহি দিও গালাগালী,
দেশে যাই মনে রেখ স্নেহ॥ "

ফুরাইল মান ফিরে ফিক্ ফিক্ হাসে—ভারতের রসমঞ্জরীতে আছে,—

সাম ভেদ ক্রিয়া দান নতি ত্যাগ রোষ।
এই সাতে মান ভঙ্গ হয় পরিতোষ॥

*   *   *   *   *

ঔদাস্য প্রকাশ সেই ত্যাগ নাম যার॥

*   *   *   *   *

মান শান্তি চিহ্ন অশ্রু লোমাঞ্চ সীৎকার॥
অবশ্য এসব রূপে মানের বিনাশ॥
(৪০ পৃঃ)

বিদ্যার গর্ব্ভ দৃষ্টে সখিগণের যুক্তি চিন্তা।

(৬৯-৭১ পৃঃ)

নবকুসুমিতা—ভারতে আছে

"বিদ্যার হইল ঋতু সখীরা জানিল।
বিয়া মত পুনর্ব্বিয়া সুন্দর করিল॥"

এই বর্ণনা হইতে দুইটী বিষয় জানা যায়। প্রথমতঃ তৎকালে ১৪। ১৫ বৎসরই স্ত্রীলোকের প্রথম ঋতু কাল ছিল। দ্বিতীয়তঃ পুনর্ব্বিবাহের পূর্ব্বে স্বামী সহবাস করিতে নাই এই নিয়ম তখন হইতেই ভঙ্গ হইয়াছিল।

কেহ বলে···কামগাতিশয়—অতিশয় কামাতুরা।

সখীদিগের দ্বারা বিদ্যার চরিত্র বর্ণনা অতি সুন্দর হইয়াছে। ভারতের বর্ণনা এত সুন্দর নহে।

স্ত্রী বুদ্ধিতে পরমাদ (প্রমাদ) — শাস্ত্রে আছে,

"স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী।"

সখীগণ কর্ত্তৃক রাণীর নিকট বিদ্যার গর্ব্ভ বার্ত্তা প্রদান।

(৭১-৭২ পৃঃ)

চির দিন দেখি নাই সে চাঁদ বয়ান— মুসলমানদিগের সময় হইতে এই এক আশ্চর্য্য নিয়ম আমাদের দেশে প্রচলিত হইয়াছে। মুসলমানগণ যাহাকে পারিবারিক সুখ বলে,

তাহা ভোগ করিতে জানিত না। পিতা পুত্রে কখন দেখা সাক্ষাৎ হইত না; মাতা কন্যায় কখন দেখাদেখি ছিল না। সকলেরই স্বতন্ত্র মহাল থাকিত, কেহ কাহারই তত্ত্ব লইত না। এই জঘন্য প্রথায় অনেক কুফল ফলিয়াছে সন্দেহ নাই। মুসলমানগণ বহু বিবাহ করিত, তাহারা বড়ই বিলাসী ছিল, সুতরাং পিতা পুত্রে তাহাদের সম্বন্ধ না থাকাই সম্ভব। প্রেম ভক্তি স্নেহ তাহাদের বড়ই অল্প ছিল —অথবা সে প্রকৃতির স্ফূর্তি হইবার সুযোগ ছিল না। এই মুসলমানী প্রথা প্রথমতঃ হিন্দু রাজপরিবার মধ্যে—পরে উচ্চবংশীয় অথচ মুসলমান সরকারের চাকর ভদ্র লোকের ঘরে, শেষে সাধারণ হিন্দু পরিবারের মধ্যে প্রচলিত হয়। কবি দীনবন্ধু মিত্র সধবার একাদশীতে ইহার কতকটা বর্ণনা করিয়াছেন। এই জন্যই বিদ্যার সহিত রাণীর বহুদিন দেখাসাক্ষাৎ নাই।

উদর ডাগর বড় বরণ পাণ্ডুর—এই স্থানে এবং ইহার পরের পরিচ্ছেদে কবিরঞ্জন যে গর্ভ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা অসম্পূর্ণ। ইহা অপেক্ষা ভারত অতি চমৎকার রূপে সমুদায় গর্ভ লক্ষণই বর্ণনা করিয়াছেন।

রাণীর বিদ্যা প্রতি ভৎর্সনা।

(৭২—৭৪ পৃঃ)

শুনি চমৎকার রাণী উঠে—এই স্থান ভারত ও কবিরঞ্জন উভয়ের বর্ণনা প্রায় একরূপ। তবে ভারতের বর্ণনা আরও উৎকৃষ্ট। ভারতের প্রথমেই আছে,

"শুনি চমকিয়া বলে সহরিয়া
মহিষী যেন তড়িত॥"

আস্য আভা প্রভাতের শশী—উপমা অতিচমৎকার। প্রাতকলে

চন্দ্র যেমন পাণ্ডুর ও নিস্প্রভ দেখায়, বিদ্যার মুখও সেইরূপ হইয়াছে।

প্রসবস্থলী—জননী। ভারতে আছে,

প্রণমিতে মারে বিদ্যা নাহি পারে
লজ্জায় পেটের ভরে॥"

কান্দে কথা কহে শুদ্ধ—কবিরঞ্জনের বিদ্যা এই সকল স্থলে বড়ই কুব্যবহার করিয়াছেন। পূর্ব্বে যে অবরোধ প্রথার কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে যেমন মাতা ও কন্যায় দেখা-দেখি ছিল না, তেমান তাহার ফলে মাতৃস্নেহ ও মাতৃভক্তি অনেক কমিয়া গিয়াছিল। বোধহয় সেই জন্যই বিদ্যা মাতার প্রতি কোনরূপ সম্মান না দেখাইয়া অথবা যথোচিত ভক্তি না করিয়া অন্যায় করিয়া মাতাকে কতকগুলা কটু কথা বলিলেন। তবে বিদ্যা অবশ্য বলিতে পারে,

"অনাথিনী থাকি একা ছমাস বৎসরে দেখা
দিনেক তোমার সঙ্গে নাই।"

ভারতও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যথা,

"বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে
দাঁড়াইব কার কাছে।"

মানব রাক্ষসী তুমি যমের দোসর সেই বাপ—বিদ্যার এই অযথা অভিযোগ বড়ই অন্যায় হইয়াছে। তবে অপরাধী নিজ অপরাধ গোপন জন্য এইরূপ করিয়া থাকে সে কথা সত্য। ঈদৃশ মহা শঙ্কটে পাড়লে যখন বড় বড় বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাও কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়েন, তখন তরল বুদ্ধি বালিকা বিদ্যা যে, এহ ঘোর বিপদে হিতা-হিত ও দিগ্‌বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া মায়ের প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করিবে ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

ভারতের বিদ্যা প্রথমে কোন কথা কহে নাই, তবে শেষে আপনার অবস্থা গোপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল বটে।

প্রাণ ছাড় নীরে পশি—ভারতে আছে,

"না মিলিল দড়ী না মিলিল কড়ী

কলসী কিনিতে তোর॥"

তুই কলঙ্কের মুল—ভারতে আছে,

"রাজা মহারাজ তাঁরে দিলি লাজ

কলঙ্ক দেশে বিদেশে।"

কবিরঞ্জনের কোটাল অন্যত্র বলিয়াছেন,

"নির্ম্মল রাজার কুলে তুই দিলি কালি।"

রাণী সহ বিদ্যার বাক্‌চাতুরী।

(৭৪—৭৫ পৃঃ)

বিদ্যার এই বাক্‌চাতুরী বড়ই অন্যায় হইয়াছে। এই স্থলে বাস্তবিক বিদ্যাবতী বিদ্যার চরিত্র রক্ষা করা যায় না। ভারতের বিদ্যারও "বাক্যের কৌশল আছে," তবে তাহা এরূপ কদর্য্য নহে। তাহাতে বিদ্যার অনুনয় ব্যতীত মাতার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পায় নাই।

পাঠক ভারতের "বিদ্যার অনুনয়" পড়িয়া তাহার সহিত কবিরঞ্জনের এই অংশ তুলনা করিবেন।

দোষ বা দেখিলা কি—ভারতে অছে

"কিছু জানি নাই জানেন গোঁসই

পুরুষ না দেখি আমি - ভারতে আছে,

সবে এক জানি শুণ ঠাকুরাণী

প্রত্যহ দেখি স্বপন॥"

উদরী হয়েছে মোর—ভারতে আছে,

মিথ্যা পতি সঙ্গ সত্য বুঝি হবে পেট'

অন্যত্র "গুল্ম হৈল বুঝি পেটে।

ছি মাগি তোরে না আঁটি—বিদ্যা মাতাকে কিরূপ তাচ্ছিল্য করিত, তাহা এতদ্বারা বেশ প্রমাণ হইতেছে। পূর্ব্বেও

বিদ্যা মাতাকে বলিয়াছেন "চক্ষু নাই বুঝি কাণা। বাস্তবিক এই স্থানটী বড়ই অসঙ্গত। কবি স্বয়ং বলিয়াছেন "রস শ্রীকবিকঙ্কনে কহে।" কিন্তু বাস্তবিক আমরা কোন রসই এখানে পাইলাম না।

বাস্তবিক এসম্বন্ধে ভারতের বিদ্যা অনেক ভাল। তাহার এ সময়ে লজ্জা ভয় উভয়ই হইয়াছিল।

রাণী যত কহে বিদ্যা মৌন রহে
লাজে ভয়ে জড়সড়।
ভাবিয়া কান্দিয়া কহে বিনাইয়া
ধূর্ত্তের চাতুরী বড়॥"

রাণী সহ বিদ্যা ও সখীগণের পুনর্ব্বাক্‌ছল।

(৭৫—৭৭ পৃঃ)

আমি বিষ খাই—ভারতে আছে,

তখনি খাইব বিষ।
প্রবেশিব জলে কাতি দিব গলে
পৃথিবী বিদায় দিস॥"

উল্টা চোরে গৃহী বান্দে—যে চোর সেই কিনা গৃহস্থকে উল্টাইয়া চোর বলিয়া বন্ধন করিতেছে। অর্থাৎ বিদ্যা দোষী হইয়া আমাকেই উল্টাইয়া গালি দিতেছে। এই স্থানের রাণীর উক্তি ও বিদ্যার উত্তরের সহিত ভারতের বর্ণনার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

অনাথিনী প্রায় পড়ে থাকি—ভারতে আছে,

রাজার নন্দিনী চির বিরহিণী
মোর সম কেবা আছে।

তবে বুঝি...বাপ—এই স্থানটী অত্যন্ত অশ্লীল। কবির বর্ণনায় এইরূপ গ্রাম্য দোষ অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। তবে ইহার অন্যরূপ অর্থও করা যায়—অর্থাৎ "তবে কি তোমার বাপের জ্ঞাতসারে এই কর্ম্ম হইয়াছে।

গায় কাটে—গাত্রে কামড়ায়।

সখিগণ প্রতি কহে কর্কশ বচন—ভারতে আছে,

আলো সখীগণ তোরা বা কেমন
রক্ষক আছিলি ভালে।

(ইত্যাদি দেখ)

রামদুলাল—রামপ্রসাদের পুত্র।

কোটালকে ধরিতে অনুমতি।

(৭৮-৭৯ পৃঃ)

নহে সুখী…এই স্থানে বর্ণনায় প্রসাদগুণ না থাকিলেও, তাহা অত্যন্ত সুন্দর হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের এই স্থানের বর্ণনা আরও মনোহর।

অম্বর—(১) পরিধানের কাপড়। (২) আকাশ।

তারাকারা ধারা—তারকাতুল্য অশ্রুধারা।

তৃষ্টা নিষ্ঠাগত—পিপাসা অতিরিক্ত হইয়া উহা গায় বসিয়া গেলে, পরে আর জল পানের ইচ্ছা থাকে না।

জলদ গুচ্ছছটা—আলুলায়িত চুলের শোভা মেঘের শ্রেণীর মত।

বরটা—হংসী। মরালগামিনী।

উপে—সমীপে।

অদ্যকান্তে…লবে—রাজা, রাজ্ঞীর ঈদৃশ উগ্রচণ্ডামূর্ত্তি দেখিয়া ভাবিলেন, কোন্ হতভাগ্য না জানি রাজ্ঞীর বিরাগ ভাজন হইয়াছে, সুতরাং বলিলেন, হে প্রিয়ে, রজনী প্রভাতে আজ কোন্ হতভাগ্য না জানি শমন সদনে প্রেরিত হইবে।

পর্ব্ব—ব্যাপার, কাণ্ড।

টাঙ্গন—একজাতীয় পার্ব্বতীয় অশ্ব।

বেহেসাব—অন্যায় গালিগালাজ দেয়।

গিরি—পড়িয়া আছে।

সেতাব—শীঘ্র।

ঘটা—(১) আড়ম্বর, বা (২) সমূহ।
আকটে পাপোস—রাগে জুতা শুদ্ধলাথি মারে।
নজর দৌলত—দর্শনীর উপহার। রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইতে হইলে দর্শনী স্বরূপ ধন উপহার দিতে হয়, এস্থলে বাঘাই কোটালই সেই নজর দৌলত স্বরূপ হইয়াছে।

কোটালের বিনয়।

(৭৯-৮২ পৃঃ)

কব কাব্য—আশ্চর্য্য রহস্য কথা বলিব।
নাকে দিব তির—একালে রাগের সময় কথায় কথায় যেমন বলে "নাকে ঘুষি মারিব, বা ঘুষিমেরে নাক ভাঙ্গিব।" সে' কালে. তেমনি তীরের ব্যবহার ছিল বলিয়া রাগ হইলে, তীর দিয়া নাক বিঁধিব বলিত।
সবংশে গাড়িব একগাড়ে—ভারতও এই ব্যাপার ঠিক এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

"জান বাচ্ছা একখাদে গাড়িব হারামজাদে
তবে সে জানিবি মোর দন্ত।"

সুরাপানে রাগরঙ্গে—ভারতে আছে "মাতালে কোটালি দিয়া।"
থাক বারবধু সঙ্গে—ভারত রাজার মুখে এরূপ কথা না বলাইয়া হীরার মুখে বলাইয়াছেন যথা,

"লোকের ঝি বহুলয়ে সদা থাক মত্ত হয়ে
তোর ঘরে যত সকলি অসত
আমি দিতে পারি কয়ে॥"

বিষ খেতে দেন মাতা—এই স্থানটী বড়ই সুন্দর।
পিছে দিল মহসিল—পাছে কোটাল পলাইয়া যায়, এই আশঙ্কায় রাজা তাহার পিছনে পাহারা লাগাইয়া দিলেন।

কোটালিনীর অন্তঃপুরে গমন ও রাণী সহ কথা।

(৮২-৮৪ পৃঃ)

সৃষ্টি লোপ হয় —আমি সবংশে ধ্বংশ হইব। আত্মম্ভরি লোক, সৃষ্টির মধ্যে "আমি" ব্যতীত আর কিছুই দেখে না, ইহাই তাহার দৃষ্টান্ত।

নিশিনাথ—রাত্রির প্রহরি। কোতোয়াল।

ভূপতিকে হেয় জ্ঞান—রাজার প্রতি কোটালের এইরূপ ঘৃণা বড়ই স্বাভাবিক হইয়াছে। বাস্তবিক কোটাল রাজার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে তাহা বেশ সঙ্গত।

কোটালের ভূপতির প্রতি নিন্দা।

(৮৪-৮৫ পৃঃ)

এড়াইল সেই আমি চোর—ভারতে আছে,

"পরে করি গেল সুখ আমার কপালে দুখ
ধন্যরে কোটালি খেদমত।"

গরদান লৈতে চায় মোর—ভারতে আছে,

দুজনে ভুঞ্জিল সুখ আমার কপালে দুখ
এ বড় বিধির অবিচার।"

অগ্নি—বাণ, ক্রোধাগ্নি।

গ্রামের সম্বন্ধ যারে—এই উপদেশ গুলি কবিরঞ্জনের বড়ই চমৎকার। ইহা চলিত কথা হওয়া উচিত।

নেমকে পালা—আমি রাজার লুণ খাইয়া প্রতিপালিত হইয়াছি। কবিরঞ্জনের এই বর্ণনা ভারত অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট।

কোটালিনী কর্ত্তৃক ভদ্রকালীর স্তুতি।

(৮৫—৮৬ পৃঃ)

এই অংশ কবিরঞ্জনের সম্পূর্ণ নূতন। স্থধু এ অংশ বলিয়া নহে, কবিরঞ্জনের চোর ধরা সম্পূর্ণ নূতন রকমের। ভারতে ইহা অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কবিরঞ্জন যাহা আঠার অধ্যায়ে ত্রিশ পাতায় বর্ণনা করিয়াছেন—ভারত তাহা চারি অধ্যায়ে সাত পাতের মধ্যে শেষ করিয়া দিয়াছেন। চোর ধরার কৌশল কবিরঞ্জনে যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা এই—কোটাল রাজা কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া অনেক মিনতি করিয়া 'সাত দিনের সময় পাইল। বিদ্যার ঘরে কি চুরি হইয়াছে তাহা সে জানিত না। স্থতরাং সে রাণীর নিকট তাহার স্ত্রীকে পাঠাইয়া দিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানিল। তাহার পর কোটালপত্নী স্বামীর অভিষ্টসিদ্ধ হইবার জন্য কালীর আরাধনা করিয়া অভয় পাইয়া প্রসাদ পুষ্প তাহার স্বামীকে দিল। কোটাল তখন সাহস পাইয়া রীতিমত সজ্জা করিয়া চোরধরিতে নগরে বাহির হইল। নগরময় মহা দৌরাত্ম্য আরম্ভ হইল। লোকের দেশে থাকা ভার হইয়া উঠিল। কোটাল ছদ্মবেশে নগরের নানা স্থানে নানা রূপ চর রাখিয়া ছিল। কিন্তু এত করিয়াও সে চোর ধরিতে পারিল না। পাঁচ দিন এই রূপে গেল। তখন কোটাল তাহার পিতৃব্যের পরামর্শে চোর সন্ধান করিবার জন্য বিদু ব্রাহ্মণীকে বিদ্যার নিকট পাঠাইয়া ছিল—কিন্তু সেও কিছুই করিতে পারিল না। তখন কোটাল একেবারে নিরুপায় হইয়া পড়িল। তাহার এক ভাই শেষে বিদ্যার গৃহে সিন্দুর লেপিয়া চোর ধরিবার পরামর্শ দিল। কোটাল রাজার নিকট সম্মতি লইয়া বিদ্যার গৃহে প্রবেশ করিয়া তথায় সকল স্থানেই সিন্দুর লেপিয়া রাখিল। স্থন্দর এপর্য্যন্ত কিছুই ভ্রুক্ষেপ করে নাই—দেববলে—আত্মবলে নিরাপদ ছিল, স্থতরাং স্থন্দর প্রত্যহই বিদ্যার

নিকট পূর্ব্বমত যাতায়াত করিত। সেদিনও আসিল, কাজেই তাহার কাপড়ে সিন্দূর লাগিয়া গেল। সেই রাত্রেই সুন্দর হীরাকে দিয়া সে কাপড় ধোপার বাড়ী পাঠাইয়া দেয়, কিন্তু সেখানেও কোটালের চর ছিল। রঙ্গিন বস্ত্র দেখিয়া ধোপাকে পীড়াপীড়ি করিতেই চোরের সন্ধান হইল। তখন কোটাল মালিনীর বাড়ী উপস্থিত হইয়া তাহার প্রতি বড়ই উৎপাত করিতে লাগিল। মালিনী অগত্যা সব বলিয়া দিল। কোটাল তাহার কথামত সুন্দরের ঘরে প্রবেশ করিল। সুন্দর এতক্ষণ কালীপূজা করিতেছিল; সুতরাং কিছুই জানিতে পারে নাই। কোটালকে দেখিয়াই সুড়ঙ্গ দিয়া বিদ্যার মন্দিরে পলাইয়া গেল। তখন সুড়ঙ্গ খননে মহা ধুম পড়িয়া গেল। হাজার হাজার বেগার ধরা হইল. সিকি সহর খুঁড়িয়া চৌচচ্ করা হইল। অনেক কষ্টে সপ্তম দিনে কোটাল সুড়ঙ্গপথে বিদ্যার ঘরে গিয়া উঠিল। কিন্তু চোর কোথায়—দেখে সেখানে স্ত্রীলোক ব্যতীত আর কেহ নাই। তখন কোটালের সন্দেহ হইল। কিন্তু স্ত্রীলোককে ত সে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং থানা কাটিয়া সকলকে থানা ডিঙ্গাইতে বলিল। স্ত্রীলোক বাম পদ ও পুরুষ দক্ষিণ পদই আগে বাড়ায়। সুন্দর কোটালের কৌশল বুঝিল। কিন্তু তখন তাহার মনে বিবেক আসিয়া উপস্থিত হইল। কতদিন সে এরূপে থাকিবে। বিশেষতঃ সে দিন না ধরা দিলে কোটাল সবংশে মারা যায়, তাই সুন্দর দক্ষিণ পদে খন্দক ডিঙ্গাইল—চোর ধরা পড়িল। কবিরঞ্জনের গল্প এই। অবশ্য ইহার অনেক অংশ অসংলগ্ন হইলেও ইহাতে যে কারিগরি আছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

ভারতের গল্প অতি সংক্ষেপ। কোটাল রাজার অনুমতি পাইয়া বিদ্যাকে তাহার ঘর হইতে সরাইয়া দিয়া ঘর খুঁজিতে খুঁজিতে সুড়ঙ্গ দেখিল। কোটাল তখন সব বুঝিয়া স্ত্রীবেশ ধরিয়া বিদ্যার ঘরে রহিল। সুতরাং যাই সুন্দর আসিল, অমনি ধরা পড়িয়া গেল। ভারতের গল্পের কৌশল বড় অধিক নাই।

কোটালের চোর অন্বেষণ সজ্জা।

(৮৬—৮৭ পৃঃ)

লে খঞ্জর—ছোরা বা কাটারি লইয়া।

সোবান পতঙ্গ—প্রদীপ্ত সূর্য্যসম, অথবা সুবর্ণ প্রজাপতির ন্যায় তেজোময় চক্ষু।

মেনে গারি গাও—আমি এখানে গা ঢালিলাম। একটু বিশ্রাম করি।

ভরে পুর বাট—রাজপুরীর রাস্তা কোতায়ালের অনুচরে পূর্ণ হইয়া গেল।

খেলাওর—লাঠী খেলোয়ার, কুস্তীগির।

পড়ে সো কাহি—গায়ে ধূলা মাখিয়া মাটিতে পড়িয়া অর্থাৎ ডন্ ফেলিয়া কহিল।

ঝাঁপা এটে!—এই কথাটির সাত নকলে আসল খাস্ত হওয়ায় মূল ঠিক করা গেল না। অর্থ লুট তরাজ করা।

কহে আঁট—চীৎকার করিয়া বলা।

ইসে আটু...হাট—ইহাকে আগে তাড়িয়ে দে।

চোর ধরণার্থ কোটালের দৌরাত্ম্য।

(৮৭—৮৯ পৃঃ)

গাদাও—বিস্তৃত, ঘনবসতি।

তাওয়াইয়া—গরম করিয়া।

হাড়্যা ঠুক্যা রাখে—তখন এই এক প্রকার নূতন সাজা প্রচলিত ছিল। বলিদানের সময় যেমন হাড়িকাঠে খিল আঁটিয়া পশুকে আবদ্ধ রাখে, পূর্ব্বে দোষীকেও সেইরূপে আবদ্ধ করিয়া রাখিত। ভারতও কোটালের এজলাস বর্ণনায় বলিয়াছেন,

"ঠকঠকি হাড়ির কোড়ার পট্‌পটি।"

তথা কারু কথা লাগে নাই—কোটালের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রাজার নিকট নালিশ করিলেও, রাজা সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই। কারণ ভাবিয়াছিলেন বাধাই বুঝি চোরের সন্ধান পাইয়াছে।

পুরী সুদ্ধ—সবংশে।

কবিরঞ্জনের এই স্থানের বর্ণনা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

চরসমূহের ছদ্মবেশে চোর অন্বেষণ।

(৮৯—৯২ পৃঃ)

তঞ্চ—প্রবঞ্চনা।

বিড়া···উঠাইল—পান হাতে লইয়া প্রতিজ্ঞা করিল।

হরকরা—গুপ্তচর।

দানির···ছলে দান—রাস্তার চৌমাথা, নদীর ঘাট প্রভৃতি স্থান-বিশেষে, যে মাশুল আদায় করা হয়, তাহাকে দান বলে, আর যে আদায় করে তাহাকে দানী বলে।

ব্রজবাসী···বেশ—কবিরঞ্জনের এই ভণ্ড বৈরাগী বর্ণনা অতি চমৎকার হইয়াছে। শক্তি উপাসক প্রসাদের সহিত বৈরাগী-দের চির বিরোধ বলিলে হয়, বিশেষত বৈরাগী আজু গোঁসাইয়ের সহিত তাঁহার প্রতিযোগিতা ছিল। বোধ হয় সেইজন্যই কবি বৈরাগীদের এইরূপ লাঞ্ছনা করিয়াছেন।

গিরস—গিরিমাটির রং।

নামরস—হরিনাম সুধা।

চীরা—খণ্ডবস্ত্র।

দুই ভাই—গৌর নিত্যানন্দ।

বিষম উঠে ডেকে—মধ্যে মধ্যে বীরভদ্র বা অদ্বৈত বলিয়া মহা চীৎকার করিয়া উঠে।

নবশাক—সদ্গোপ, মালী, তিলী, তন্তুবায়, মোদক, বারুই, কুম্ভ-কার, কর্ম্মকার, নাপিত এই নয়টী জল আচরণীয় জাতি।

রামানন্দী—রামনন্দ নামক কোন সাধুর প্রচারিত ধর্ম্মমতাবলম্বী সম্প্রদায়কে রামানন্দী বা রামায়ৎ বলে।

লহর—লীলা খেলা।

তর তর—নানা প্রকার।

কয়েফেতে চুর চুর নদারদ গম—ভাং গাঁজায় মত্ত হইয়া আছে। শোক, তাপ, দুঃখ কাহাকে বলে, তাহা জানে না; নেশার ঝোঁকে রাতদিন বিভোর হইয়া রহে।

হেকমতে—কৌশলে বা ক্ষমতায়।

মায়া—ঠাট, ছলনা।

খেতে শুতে ইত্যাদি—এসকল স্থানে কবিরঞ্জনের বর্ণনা অত্যন্ত সুন্দর হইয়াছে। ভারত এসকল বর্ণনা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

বিদু ব্রাহ্মণীর বৃত্তান্ত।

৯২—৯৪ পৃঃ

হাপুগণা—বিপদে পড়িয়া নিরুপায় হওয়া।

সুবচণ্ডী—শুভচণ্ডী। কবিকঙ্কণে যে চণ্ডীর গান প্রচারিত আছে, সেই চণ্ডী পূজাকে শুভচণ্ডী পূজা বলে। এদেশে সামান্য লোকের নিকটে ইহা সুবচনীর পূজা বলিয়া বিখ্যাত।

মাসি মিছা কথা থো—কোতোয়াল স্পষ্টবাদী, তাই বিধুর এই ফাজিল কথাগুলা তাহার ভাল লাগিল না।

চিহ্নিত—তোমার আশ্রিত। তোমারই অনুগৃহীত।

কোটালের জানিত—কোটালের প্রেরিত চর।

আপ্ত—আত্মীয় ও অন্তরঙ্গ।

এক গালে চুণ—বিদু ব্রাহ্মণীর উপর এইরূপ অত্যাচার করা বিদ্যার ভাল হয় নাই। তবে কবি বিদ্যাকে যেরূপ "ক্ষণে রুষ্টা" স্বভাব বর্ণনা করিয়াছেন—তাহাতে ইহা কতকটা সঙ্গতও বোধ হয়।

বিদ্যুর নিকট কোটালের নিরাশ্বাসে মাঘাইর উপদেশ।

(৯৫—৯৭ পৃঃ)

স্বার্থ নাহি—কষ্ট—নীচ জাতীয় লোকের ধর্ম্মজ্ঞান এইরূপ। তাহারা নিজের জন্য পাপকর্ম্ম করাকে দূষণীয় মনে করে না। কিন্তু অন্যের জন্য—পরোপকারের জন্য এরূপ কোন কর্ম্ম করাকে অন্যায় মনে করে।

লোহা ভিড়া—চাদ, বা তাল বাধা লোহা।

গস্তান—নষ্ট মেয়েমানুষ যাহারা হাটে বাজারে, ঘুরে। (গস্তানী।)

অনুমতি হেতু...ভূপে—এস্থলে কোটাল রাজঅন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিবার অনুমতি লইল বটে, এবং তদনুসারে বিদ্যার গৃহে প্রবেশ করিল বটে—কিন্তু বিদ্যাকে রাজা সে মহাল হইতে সরাইয়া দেন নাই। বিদ্যার সহিত কোটালের দেখা হয়, বিদ্যা কোটালের সহিত বাক্যালাপ করে, বোধ হয় পূর্ব্বেই এরূপ করিত, তাই বিদ্যা গ্রাম সম্পর্কে তাহাকে ভাই বলিত। বোধ হয় এই জন্যই প্রথম গর্ভ শ্রবণে কোটালের উপর রাজার সন্দেহ হয়। এরূপ বর্ণনাটা কিছু অস্বাভাবিক। কেননা তখনকার রাজ অন্তঃপুর মধ্যে কাহারই প্রবেশানুমতি ছিল না, এবং রাজপরিবারকে কেহই দেখিতে পাইত না। কবিরঞ্জন পূর্ব্বে এক স্থানে বলিয়াছেন,

> বাহিরে প্রহরী থাকে দুরন্ত কোটাল।
> 'মনুষ্য সঞ্চার নাহি এক ঠাকুরাল॥'
> কিন্তু অন্যত্র আছে,
> " সতর্ক সদত থাকি, দণ্ডে দশ বার ডাকি,
> সখী কহে প্রবোধ বচন।"

ভারতের কোটালও চোর ধরিবার জন্য মহাল হাবালে লইয়াছিল কিন্তু,

বিদ্যা সখীগণ লয়ে, বাহির হৈলা দ্রুত হয়ে,
রহিলেন রাণীর নিকটে। ”

কুমারহট্ট—কুমারহাটা। ইহা হালিসহর পরগণার অন্তর্গত। এস্থলে অনেক বর্দ্ধিষ্ণু কুম্ভকার বাস করিত বলিয়া এরূপ নাম হইয়াছে। এই গ্রামেই কবিরঞ্জনের জন্ম হয়।

রাম কৃষ্ণ ধাম...তথা—কবিরঞ্জন এক জন ঘোর তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। তিনি তন্ত্র মতে উপাসনা করিতেন—শব সাধনা করিতেন। এইরূপ সাধনার জন্য তিনি তন্ত্রোক্ত পঞ্চমুণ্ড সাধনাসন সংস্থাপন করিয়া তথায় নিয়মিত রূপে সাধনা করিতেন। সর্প, ভেক, শশ, শৃগাল ও নরমুণ্ডে এই আসন প্রস্তুত হয়। অদ্যাপি তাহার বাসস্থানের নিকট এই আসনের চিহ্ন দোলমঞ্চের ন্যায় বিদ্যমান আছে। হিন্দুগায়কগণ আজ পর্য্যন্ত এই স্থানে আসিয়া প্রথমে গান করিয়া আসনের মাটী মস্তকে ও জিহ্বায় দিয়া, মজুরা করিতে বাহির হয়। এখনও সেদেশের লোক এই আসনকে সম্মান করে, তাহার নিকট মলমূত্র ত্যাগ করে না।

কিঞ্চিত তিষ্টিলে...শিবা—অর্থাৎ প্রসাদ এস্থলে সাধনায় সম্পূর্ণ রূপ সিদ্ধ হইতে পারেন নাই। কালী তাঁহাকে প্রত্যক্ষ হইয়া দেখা দেন নাই। বোধ হয় যথা সময়ের পূর্ব্বে ধ্যান ভঙ্গ হওয়ায় এরূপ হইয়াছিল। এই জন্য কবি বরাবর দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন।

“ আমি কি অধম এত বৈমুখ আমারে ”

চোর ধরণার্থ বিদ্যার মন্দিরে সিন্দূর লেপন।

(৯৭-৯৯ পৃঃ)

রজনী রাজন—কোটাল। অন্যত্র আছে নিশানাথ।

বাপীতটে—দীঘীর পাড়ে।

সুড়ঙ্গ পথে পলায়ন।

(৯৯-১০৩ পৃঃ)

বুবী—অত্যন্ত রাগ জন্য কথা বাধিয়া যাইতে লাগিল।
একসাত—এক দণ্ড।
হকাকত—ঠিক অবস্থা, আসল ব্যাপার।
বেতক্কির—নির্দ্দোষী।
ফাক্কা লবেজান—অনাহারে ওষ্ঠাগত প্রাণ।
মালিয়াৎ—সম্পত্তি।
হিমাইত তোড়ঙ্গা—আশার বাসা ভাঙ্গিব, দর্পচূর্ণ করিব।
কুপিলা অধীরা—এই স্থানে হীরার চরিত্র চিত্র অতি সুন্দর
হইয়াছে। ভারতের মালিনীও এই রূপ করিয়াছিল,

" আমারে যেমন, মারিলি তেমন
পাইবি তাহার ফিরা। "
(ইত্যাদি।)

দাবায় যাওগে—ধমকে দমন করিবে।
তওভি করতি সোর—তবুও গোল করিতেছিস্।
আঁটনি—প্রকৃত কথা গোপন জন্য গলাবাজি করা।
সোয়ার হাওয়ালে—অশ্বারোহীর জিম্মায়।
নেজা—বল্লাম, বঁড়ষা।
তন্ত্র—অভিসন্ধি।

চোর ধরণার্থে কোটালের সুড়ঙ্গ খনন।

(১০৩—১০৫ পৃঃ)

আকুরে হুকুরে—হাঁপাইতে হাঁপাইতে।
খাও জায়গীর—বৃত্তি পাইবে। অথবা তোমরা রাজার প্রদত্ত
বৃত্তি ভোগ কর, তোমরাই এ কাজ কর।

বেগারের ধুম—এই বেগারের ব্যাপার কবি অতি চমৎকার রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।
নিঘাবানা—চৌকিদার।
খোষতত্ত্ব—এই সুখের সংবাদ প্রচার জন্য।
পিছা—কে উহার হাত হইতে নিস্তার পায়।
গুজব—কবির এই জনরব বর্ণনা অতি স্বাভাবিক ও চমৎকার।
খাই—খাদ, খাল।
কতকাল…জেতে—কেহ বলে কুমার সুন্দর, কুমার বা কুম্ভকার জাতীয় হইবে, না জানি কতকাল ধরিয়া এই সুড়ঙ্গ খুঁড়িয়াছিল।

বিদ্যাবাক্যে সুন্দরের নারী বেশ ধারণ।

(১০৬—১০৭ পৃঃ)

পশ্চাতে—সহমৃতা হইতে। শাস্ত্রমতে গর্ভিণী স্ত্রীর সহমৃতা নিষেধ।

পরিণামদর্শী—যে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাজ করে, তাহার কোন বিপদ হয় না। সাধারণ লোকের এই রূপ বিশ্বাস—কিন্তু ভক্তের বিশ্বাস অন্য রূপ। সুন্দর ইহার উত্তরে অন্যত্র বলিয়াছেন—

"ভবিষ্যৎ কর্ম্ম এইক্ষণে কেন ভাবি।
তখনি তেমন কহ যে কহান কালী॥"

চন্দ্র মধ্যে…বিন্দু—মুখরূপ চন্দ্রমধ্যে চন্দনের ফোঁটাও চন্দ্রের ন্যায় দেখাইতেছিল। সুতরাং যেন চন্দ্রের মধ্যে চন্দ্র রহিয়াছে বোধ হইল।
নিছুনি—কথায় বলে 'বালাই লয়ে মরি।'
ভাক্কাপারা—বোকা প্রায়, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়।

খন্দক লঙ্ঘন পরীক্ষা।

(১০৮—১০৯ পৃঃ)

থামাটি—দাঁতে ওষ্ঠ কামড়াইয়া বিকট মূর্ত্তি ধরিয়া বসা।

ক্রোধে কহে পুনঃ পুনঃ—এই স্থানে উপাখ্যানগত দোষ আছে। যদি দিব্য দিয়াই চোর বাহির করিতে হইল, তবে এত গোলযোগের আবশ্যক ছিল না। প্রথমেই এই-রূপ ঘোষণা করিলে হইত। তবে স্ত্রীলোক বামপদ, এবং পুরুষ দক্ষিণপদ আগে বাড়ায় এই লক্ষ্য করিয়া চোর ধরিতে পারিলে গল্প আরও মনোহর হইত। বাস্তবিক ইহাই যে কবির উদ্দেশ্য ছিল, তাহা স্পষ্ট বোধ হয়।

রৌরবগামী—নরকে যাইবে।

বিচারিল ধরিল কোটাল—সুন্দর এই দিব্য শুনিয়াই বড় ভীত হইলেন এবং অনন্যোপায় হইয়া ধরা দিলেন। তাহার ধরা দিবার আরও কারণ এই যে, যখন তিনি কালীর আদেশ বেশ জানেন যে, ধরা দিলে তাঁহার পরিণামে কোন ক্ষতি হইবে না—তখন অনর্থক কষ্ট স্বীকার করা আবশ্যক মনে করিলেন না। তাঁহার অন্যান্য যুক্তিও এস্থলে স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

সুন্দরের বামপদে খন্দক লঙ্ঘনার্থ বিদ্যার সহ কথা।

(১০৯—১১১ পৃঃ)

দুরাত্মা পিতা—এই স্থলে এবং পূর্ব্বেও অনেক স্থলে বিদ্যাবতী বিদ্যা আশ্চর্য্য পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন।

পূর্ব্বাপর হেতু...দুষ্ট কর্ম্ম—যাঁহারা বিদ্যা সম্বন্ধে যথার্থই বলিয়াছেন,

"যদ্যপি পণ্ডিতা বট তথাপিও নব্য"।

এই জন্য বিদ্যার এই সকল উপদেশ গুলিতে অধিক সার দেখা যায় না। বিদ্যা বিদ্যাবতী এবং কালীভক্ত বটে কিন্তু তাহার ধর্ম্মনীতি শিক্ষা অধিক ছিল না। বিশেষ বিপদে পড়িয়া তাহার কর্ত্তব্যজ্ঞান কতকটা দূর হইয়াছিল।

কাল করে মুক্তি প্রশ্ন— রামায়ণে রামের লীলা সম্বরণ সম্বন্ধে যে উপাখ্যান আছে, তাহা দেখ।

সল্লোকে—সাধুব্যক্তিরা প্রাণান্তেও দুষ্কার্য্য করে না।

মিথ্যাকথা নহে মহাভারতেতে উক্ত—অবস্থাবিশেষেও যে মিথ্যা কথা কহা যায়, এরূপ উপদেশ মহাভারতে কোথাও নাই। যেহেতু মহাভারতে দেখান আছে যে, মিথ্যা কথা কহিয়া যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ধার্ম্মিকদেরও তাহার ফলভোগ করিতে হইয়াছিল।

সত্য বাক্য রক্ষা... সাধ্যোদ্ধার— কবিরঞ্জনের এই উপদেশ অতি সুন্দর হইয়াছে। ভারতের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে কোথাও এরূপ উপদেশ বড় পাওয়া যায় না। কবিরঞ্জন চোর ধরার বিস্তারিত বর্ণনা করিয়া বিদ্যা সুন্দর প্রভৃতির চরিত্র স্ফূর্ত্তি করিবার যেরূপ সুবিধা পাইয়াছেন, ভারত সেরূপ পান নাই।

চোর ধরণ।

(১১২—১১৫ পৃঃ)

ব্যাধ রূপে...অঙ্গদ—প্রভাষতীর্থে যদুবংশ ধ্বংশ উপাখ্যান দেখ। আত্মীয় ও জ্ঞাতিবর্গের বিনাশ জন্য শোকে একান্ত অধীর হইয়া, যে সময় শ্রীকৃষ্ণ নিম্ববৃক্ষমূলে হতাশচিত্তে বসিয়া পরিণাম চিন্তা করিতেছিলেন, তখন কাল প্রেরিত ত্রেতাযুগের রামায়ণের বালীরাজের পুত্র, দ্বাপরের ব্যাধরূপী অঙ্গদ মৃগভ্রমে তাঁহার প্রতি শর সন্ধান করে, তাহাতেই তাঁহার লীলা সাঙ্গ হয়।

কর্ম্মভোগ…ধরণীমণ্ডলে—শাস্ত্রমতে কর্ম্মই আমাদের সমস্ত সুখ দুঃখ, স্বর্গ নরক ভোগের মূল। কর্ম্মদ্বারা আমাদের আত্মা একরূপ সংস্কারে আবদ্ধ হয়। ভাল কর্ম্মের দ্বারা সুসংস্কার এবং মন্দ কর্ম্মের দ্বারা কুসংস্কার মনে বদ্ধমূল হয়। ইহাই পাপ পুণ্য। মৃত্যুর পরেও আত্মার এই সংস্কারবীজ সূক্ষ্ম শরীরে থাকে—সুতরাং পর জন্মেও সেই সকল সংস্কারানুযায়ী ভোগাভোগ হয়। এই কর্ম্মের ফল কিছুতেই অন্যথা হয় না, এই জন্য কোন কোন মতে ধর্ম্মকেই ঈশ্বর বলা হইয়া থাকে।

অন্যাকে…রামচন্দ্রে ফলে—কবি এস্থলে কর্ম্মের অখণ্ডনীয়তা দেখাইবার জন্য ভগবান রামচন্দ্রর কর্ম্মফল ভোগ করিবার দৃষ্টান্ত দিলেন। ত্রেতাযুগে রামাবতারে কিষ্কিন্ধাধিপতি কপীশ্বর বালীরাজকে বিনাপরাধে বিনষ্ট করারূপ দুষ্ক্রিয়ার ফল ভোগ জন্য তাঁহাকে কৃষ্ণাবতারে ঐ বালীর পুত্র ব্যাধবেশী অঙ্গদের হাতে সমুচিত শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল।

ভবিষ্যৎ কর্ম্ম…দেবী—ভক্তই এইরূপ ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে। শাস্ত্রে আছে,—

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥"

ভক্তি ভাবে…বধ—সুন্দরের অটল বিশ্বাস এই—গভীর-ধর্ম্মভাব বড় চমৎকার, তাহার উপদেশও বড়ই গভীর। ভারতের সুন্দরে এসব কিছুই নাই। ভারতের "কামমদে মত্ত সুন্দর" সুড়ঙ্গ পথে বিদ্যার মন্দিরে আসিয়া স্ত্রীরূপী কোটাল সহচরদিগকে বিদ্যা ও বিদ্যার সখী মনে করিয়া জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন, তাহার পর যখন তিনি ধরা পড়িলেন, তখন ভয়ে জড় সড়। তাঁহার তখন কত দুঃখ,—

হরি হরি মরি মরি কিবা করি জায়া।

* * *

অহর্নিশ বিমারিশ পেলে বিষ খাই ॥

বাস্তবিক কবিরঞ্জনের সুন্দরের চরিত্র অতি উচ্চ। ভারতের সুন্দরের সহিত তাহার তুলনাই সম্ভবে না।

কেহ বলে—এস্থলে কোটালের অনুচরদের দম্ভও অতি চমৎকাররূপে বর্ণিত হইয়াছে, পাঠক ভারতের বর্ণনার সহিত ইহার তুলনা করিয়া দেখিবেন।

পটুকা—কটিকষণ, কোমরবন্দ।

মুক্তকরে নিজ করে—এখানে রাজপুত্র সুন্দর নিজ বীর্য্য বলের বেশ পরিচয় দিয়াছেন। কবিরঞ্জনের সুন্দর সর্ব্বগুণালঙ্কৃত।

চুলছিল এল—তখন পুরুষেরও বড় বড় চুল রাখার রীতি ছিল। এখনও বঙ্গ বেহার উড়িষ্যা ও পঞ্জাবে এই পদ্ধতি আছে।

পলাইতে পারে...রাজারে।—এস্থলে সুন্দরের অসাধারণ শৌর্য্য বীর্য্য ও মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

সুন্দরের বন্ধনে বিদ্যার খেদোক্তি।

(১১৫-১১৬)

দয়িত—স্বামী। দগ্ধ।—দুঃখে অত্যন্ত কাতরা।

ধীহারা—জ্ঞান হত। ধূচয়।—কম্পন।

পারা—ন্যায়। পারা অথবা পানা কথা সর্ব্বত্রে চলিত নাই। প্রায় হইত 'পারা' হইয়াছে।

নিম্নগা—নদী। রাত্রিকালে সূর্য্য বিহনে নদী গর্ভস্থ পদ্মিনী যেমন বিরস ও মলিন হইয়া যায়। পদ্মিনী বিদ্যাও স্বামীর বন্ধনে সেইরূপ হইলেন।

স্বপ্নে—আবেশে, মনোভ্রমে।

আত্মহত্যা দিব—তোমার নিকট আত্মহত্যা করিব। অথবা আমার আত্মহত্যার পাপ তোমাতে অর্শিবে।

প্রভু পূর্ব্বে প্রাণ বলে—কুমারসম্ভবে আছে,

হৃদয়ে বসসীতি মৎপ্রিয়ং
যদবোচ স্তদবৈমি কৈতবং।
উপচার পদং নচে দিদং
ত্বমনঙ্গ কথমক্ষতা রতিঃ ॥

একটা চলিত গান আছে,
"আগে প্রাণ বলে শেষে প্রাণ নিলে।"
অশেষে বিশেষে, মজায়ে শেষে, শেষে প্রাণ, প্রাণে বধিলে।"

তোমার তুলনা তুমি—এইরূপ তুলনা অতুলনীয়।
নিধুবাবুর গানে আছে,
"তোমার তুলনা তুমি প্রাণ এ মহীমণ্ডলে।"

ত্বদঙ্গজ—তোমার ঔরসজাত পুত্র। ফাফরে ফেপর রূপা—
বিপদে বিপদনাশিনী।

কোটালের প্রতি বিদ্যার বিনয়োক্তি।

(১১৬-১১৮ পৃঃ)

কপালে কঙ্কন—ভারতে আছে,
"কপালে কঙ্কন হানে অধীর রুধির বানে।"
পাঠক কবিরঞ্জনের এই স্থলে বর্ণনা ও ভারতের বিদ্যার আক্ষেপ তুলনা করিয়া দেখিবেন, উভয়ই অতি সুন্দর হইয়াছে।

গাঁথা চাঁদে দিল যেন ভক্ত—এস্থলে বিদ্যার মুখ-চন্দ্রের ও তাহার কপালের রক্ত চিহ্নের সহিত, রক্তবর্ণ অশোক ও কিংশুক হারের তুলনা করা হইয়াছে।

ভানুচণ্ড—সূর্য্যের ন্যায় দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ এবং কোপন স্বভাব।

প্রকৃষ্ট প্রকাশ—নিকটেই যে যথেষ্ট অত্যাচার করিতেছে, বা তাহার প্রচণ্ড স্বভাবের প্রচুর পরিচয় দিতেছে।

রাকা শশধর—পূর্ণিমার চন্দ্র।

ফুল্ল ইন্দীবর—প্রস্ফুটিত নীল পদ্ম।

এবে কর্ম্মে ব্যক্ত সেই বটে—বিদ্যার বিনোদ বদন ললিত লোচন, এপর্য্যন্ত কোনও পুরুষে দেখিতে পায় নাই। কারণ অবরোধবাসিনী বিদ্যা অসূর্য্যম্পশ্যরূপা; তবে এক্ষণে অদৃষ্ট দোষে সুন্দরের দুর্দ্দশা দেখিয়া ঘোমটা দূর হওয়ায় কোটালগণ তাহা দেখিতে পাইল।

না বুঝিয়া কালাকাল—তুমি সত্য পথে গিয়া অন্যায় করিয়াছ। আমি তোমাকে কালধর্ম্মমত কার্য্য করিতে বলি, কিন্তু তুমি ধর্ম্ম ভাবিয়া তাহা শুনিলে না।

যুগ ধর্ম্ম—কলিকালে সত্যের আদর নাই। চারি যুগের প্রত্যেক যুগেরই ধর্ম্ম স্বতন্ত্র। বাস্তবিক দেশকাল পাত্র অনুসারে ধর্ম্মজ্ঞান, নীতিজ্ঞান সমস্তই বিভিন্ন হইয়া পড়ে। এজন্য যাহা সত্য যুগের ধর্ম্ম ছিল, কলিতে তাহা করিলে চলে না।

পরিণামে...দৃষ্টি—তুমি ত ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাজ করিলে, কিন্তু এখন আমি যে মারা যাই।

প্রাণ মোর...সোর—জোর করিয়া সুন্দর যে চোর এই রটনা হইয়াছে, বাস্তবিক তাহা সত্য নহে, সুন্দর বিদ্যার প্রকৃত স্বামী।

রাজা ভ্রান্ত...সমান—রাজা বরাবরই আমার উপর যমের ন্যায় অত্যাচার করেন। তিনি দুর্দ্দান্ত বলিয়াই হউক অথবা ভ্রান্ত বলিয়াই হউক, তিনি আমার পতিকে এইরূপ চোর অপবাদ দিয়া ধৃত করাইলেন। অথবা রাজসংক্রান্ত কার্য্য-কারকগণের আগাগোড়াই শমন সমান।

গাত্র চর্ম্ম দিয়া..চরণে—গায়ের চামড়া দিয়া তোমার পায়ের জুতা প্রস্তুত করিয়া পরাইব। ইহাতে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ হইয়াছে।

ভাব শ্যামা হইবে প্রতুল—এস্থলে কোতয়াল ঠিক উপদেশ দিয়াছিল। সুধু তাহাই নহে, এস্থলে কোটাল তাহার নিজের মনোগত ভাবও ঠিক প্রকাশ করিল। সুতরাং বিদ্যা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন।

টলে—এইরূপ উপদেশ দিয়া কোতোয়াল সুন্দরকে লইয়া প্রস্থান করিলে পর, বিদ্যা পুনরায় অধীরা হইয়া ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

চোর দৃষ্টে রাণীর বিদ্যার প্রতি বিলাপ।

(১১৮-১২০ পৃঃ)

জন্মে জন্মে পাপ—পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে না জানি কত কত মহাপাপ করিয়াছি, তাই এরূপ মনস্তাপ পাইলাম।

বিদগ্ধ—দারুণ পোড়া।

পূর্ব্ব কর্ম্ম ভোগ—তোরও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কুকর্ম্মের ফলভোগ স্বরূপ কালীর ইচ্ছা জন্য এরূপ মনোকষ্ট পাইলি।

গুপ্তে কণ্ঠে দিলি মালা—রাণীর মতে গোপনে গন্ধর্ব্ব বিবাহ না করিলে আর কোন দোষ হইত না। ভারতও এইরূপ রাণীর আক্ষেপ বর্ণনা করিয়াছেন। পাঠক তাহা দেখিবেন।

ভূপতি দুর্ব্বার...ভারতেও আছে,

"রাজার হয়েছে ক্রোধ না মানিবে উপরোধ
এ মরিলে বিদ্যা জীবে নাই।"

বিদ্যার স্তবে কালীর অভয় প্রদান।

(১২০-১২১)

ক্ষুদ্র দোষ—বিদ্যা এ স্থাল তাঁহার যে অল্প দোষ ছিল, তাহা স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছে, সে দোষ আর কিছু নহে, অভব্যতা মাত্র। কারণ গন্ধর্ব্ব বিবাহ তখন পর্য্যন্তও রাজাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। (এ স্থলে পাঠকের যেন মনে থাকে যে, বররুচীর বিদ্যাসুন্দর হইতেই কবিরঞ্জন ও পরে ভারত তাঁহাদের এই উপাখ্যান সংগ্রহ করিয়াছেন।)

যশোদা জঠোর জাতা— কৃষ্ণ যখন মথুরায় দৈবকী উদরে জন্মান, তখন দুর্গা গোকুলে যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বসুদেব সেই রাত্রে কৃষ্ণকে যশোদার নিকট রাখিয়া তাহার কন্যাকে লইয়া আইসেন। এই কন্যাকে কংশ হত্যা করিতে যাইলে, কন্যারূপিণী দুর্গা শঙ্খ চিল রূপ ধরিয়া উড়িয়া পলায়।

প্রভাকর পুত্র—সূর্য্যের পুত্র, অর্থাৎ যম।

প্রহরের পরে পুন পতি পাবে—কালী প্রত্যাদেশে করিলেন "ভয় নাই, শীঘ্রই তোমার স্বামীকে পাইবে।" ভারত এই রূপ বিদ্যার কালীপূজা (এবং তৎপক্ষে উপদেশ) বর্ণনা করেন নাই। ভারতের বিদ্যা এত কালীভক্ত নহে। কবি নিজে কালী ভক্ত বলিয়া নায়ক নায়িকা প্রভৃতি সকলকেই সেইরূপে রঞ্জিত করিয়াছেন।

চৌর দর্শনে নাগরিকগণের খেদ।

(১২২ পৃঃ)

পাঠকগণ ইহার সহিত ভারতের "নারীগণের পতি নিন্দা" মিলাইয়া দেখিবেন। ভারত এই 'পতিনিন্দায়' বর্দ্ধমান রাজকর্ম্মচারীদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন, কবিরঞ্জনের সেরূপ নাই। এই জন্য কবিরঞ্জনের বর্ণনা অধিকতর স্বাভাবিক।

সোর—গোল, হুলুস্থুল।

স্তন পান করে শিশু···যেন রহে— এই স্থানের বর্ণনা অতি চমৎকার ও অত্যন্ত স্বাভাবিক। প্রকৃত কবি ব্যতীত আর কেহই এরূপ বর্ণনা করিতে পারে না। কালিদাস কুমার ও রঘুতে প্রায় এই রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কুমার সম্ভবের ৭ ম অধ্যায়ের ৫৬ হইতে ৬৫ শ্লোকে ইহার বিষয় বর্ণনা আছে।

কেহ বলে···বিরূপ চরিত্র—ইহার অপেক্ষা চমৎকার ভাব আর কোথাও বর্ণিত আছে, ইহা আমাদের মনে হয় না।

ভারতের পতিনিন্দা অতি জঘন্য, তাহা বিলাসিতায় পূর্ণ। কিন্তু এ ভাব কেমন মধুর কেমন কোমল কেমন প্রীতিপ্রদ কোমল প্রাণা স্ত্রীলোকদেরই ইহা শোভা পায়। বিশেষ সুন্দরের দুরবস্থার সময় তাহাদের অন্য কোন ভাব মনে আসিলে তাহা কখনই সঙ্গত হইত না। এই জন্যই ভারতের এই স্থানের বর্ণনা বড়ই অসঙ্গত। স্ত্রীলোকেরা বলিল রাজা সুন্দরের স্বরূপ দর্শনে, কোন প্রকারেই ইহার বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইবেন না।

আছড়ি পাছড়ি....কহহ হীরা—কবি এস্থলে হীরাকে পর্য্যন্ত কেমন সুন্দর করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। হীরার মুখে এই সকল মধুর কথা শুনিলে আমরা তাহার পূর্ব্ব চরিত্র ভুলিয়া যাই—তাহাকে কত ভাল লোক বলিয়া মনে করি। হীরা যখন প্রাণের কথাগুলি খুলিয়া বলিয়া খেদ করিতেছে—তাহার মনে একথানা মুখে একখানা নাই—সে সুন্দরের দুঃখে বিদ্যার দুঃখে যথার্থই দুঃখিত। তাই হীরার কথগুলি আমাদের এত ভাল লাগিয়াছে। পাঠক! ভারতের হীরা ঠিক ইহার বিপরীত। তাহার বোধ, হয় রমণী, জনোচিত কোন কোমল বৃত্তিই ছিল না। যখন কোটাল তাহাকে চোরের সহিত রাজসভায় ধরিয়া আনে, তখন সে বলিল—

কে জানে এমন চোর সিঁধে চুরি করে।
নষ্ট হই নষ্ট সঙ্গে হয়েছে মিলন।

(ইত্যাদি)

আবার যখন সুন্দর ধরা পড়ে তখন বলিয়াছিল,
"মালিনী রুষিয়া বলে গালি দিয়া।
কে তুই, কে তোর মাসী॥
কেটে ফেল চোরে ছাড়ি দেহ মোরে
বান্দহ ধর্ম্মের সেতু।"

মৃত্যু প্রতি কারণ—মরণেরই এক মাত্র হেতু।

রাজার সহ চোরের ব্যঙ্গোক্তি।

(১২৩—১৩০ পৃঃ)

তপ্ততপনীয় তনু—তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় শরীর।

পাঠকগণ এই স্থানের, রাজসভা বর্ণনার সহিত ভারতের রাজসভা বর্ণনা মিলাইয়া দেখিবেন। ভারত কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় ছিলেন সুতরাং তিনি সেই মত রাজসভা বর্ণনা করিয়াছেন।

ভালে বিন্দু···বালার্ক যেমন—সুচারু চন্দ্র মধ্যে যদি তরুণ অরুণ সন্নিবিষ্ট হইত, তাহা হইলে যেরূপ শোভা হইত, রাজার চন্দনের ফোঁটাযুক্ত কপালের শোভাও তদ্রূপ।

চণ্ডার্চ্চি—রাজার চতুর্দ্দিকে প্রদীপ্ত তেজঃপুঞ্জ দ্বিজগণ রহিয়াছেন। যেন সূর্য্যমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে প্রখর সূর্য্যকিরণ বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

পুরোহিত···মখভুজ—অথবা যজ্ঞাগ্নির (মখভুজ) চতুর্দ্দিকে যেন হোতা ব্রাহ্মণ বসিয়া রহিয়াছেন।

মহাপাত্র—প্রধান মন্ত্রী।

চোপদার—বাঘ-মুখ-দণ্ডধারী পদাতিক।

গরীব নেওয়াজ—দীনদয়াল, দীনপ্রতিপালক।

নজর দৌলাৎ—হজুরের সম্মানের উপহার স্বরূপ।

সদত নির্ভয়...রাব—সুন্দর বরাবর এই নির্ভীকতা রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার অতুল সাহস অসীম বীর্য্যের পরিচয় তিনি সর্ব্বত্রই দিয়াছেন। এ সময়ে সুন্দরের মনের অবস্থা কি রূপ ছিল, তাহা ভারত বর্ণনা করেন নাই। তবে পরে তিনি পরিচয়স্থলে ব্যঙ্গ পরিহাস করিয়াছিলেন সত্য।

পরম পুরুষ—শ্রেষ্ঠ পুরুষ বা নরোত্তম নরপতি।

ধন্যা কন্যা—ভারতেও আছে।

"বাছিয়া দিয়াছে বিধি কন্যা যোগ্য বর।
কিন্তু চুরি করিয়াছে শুনিতে দুষ্কর॥"

রেবতী রমণ—রেবতীর প্রাণানন্দ বলরাম।
রাম রম্ভা—রমণীয় রূপরাজি যুক্তা রম্ভা নাম্নী অপ্সরী।
কেমন পণ্ডিত—সুন্দরের বংশ ও বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইবার জন্যই রাজা তাহাকে মশানে কাটিতে লইয়া যাইবার ইঙ্গিত করেন।
পর্ব্বতজা—পর্ব্বতনন্দিনী পার্ব্বতী দুর্গা।
কাট রাজা…মৃত্যুভয়—এখানেও সুন্দর তাঁহার অসীম নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছেন।
অদ্যাপি তাং…চিন্তয়ামি—এস্থলে বিদ্যার রূপ বর্ণনা উপলক্ষে যে পাঁচটী শ্লোক লিখিত হইয়াছে, তাহা কবিরঞ্জন বা ভারত কাহারও নিজের রচিত নহে, এবং তাহা প্রথমে এই সুন্দর-কর্ত্তৃক উক্ত হয় নাই। এই পাঁচটী শ্লোক যথাক্রমে চোর-পঞ্চাশতের ১,২,৩৩,২৮ ও ৫০ সংখ্যক শ্লোক মাত্র। ভারত ও ইহা হইতে তিনটী মাত্র শ্লোক মূল বিদ্যাসুন্দরে সন্নিবেশিত করিয়া, পরিশিষ্টে বাঙ্গলা ছন্দে এই সমস্ত পঞ্চাশ শ্লোকেরই বিদ্যাপক্ষে ও কালীপক্ষে দুই অর্থ করিয়াছেন। এ কথা তিনি মূল বিদ্যাসুন্দরে উল্লেখ করিয়াও দিয়াছেন। সে যাহা হউক, এই শ্লোকগুলি চোর নামক কোন প্রাচীন কবির রচিত। রহস্যসন্দর্ভে প্রমানিত হইয়াছে যে, এই চোর কবির প্রকৃত নাম বিহ্লন। প্রায় আট শত বৎসর পূর্ব্বে বিন্ধ্যাচল পর্ব্বতের নিকট ইঁহার জন্ম হয়। তিনি তথাকার রাজকন্যার শিক্ষক ছিলেন, এবং মদন পারিজাতের ন্যায় রাজকন্যার সহিত ক্রমে তাঁহার প্রণয় সঞ্চার হয়। রাজা ইহা জানিতে পারিয়া যখন তাঁহাকে মশানে বলি দিবার জন্য পাঠাইয়া দেন, প্রবাদ আছে তিনি সেই সময় এই কয় শ্লোক পাঠ করিয়াছিলেন। জয়দেব কবি প্রসন্ন রাঘব নামক নাটকে ইহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যথা

"যস্যাশ্চোরশ্চিকুর নিকর কর্ণ পুরো ময়ুরো"

অন্য এক প্রাচীন শ্লোকে আছে,

কবি রমরঃ কবি রমরুঃ কবী চোর ময়ূরকৌ

কবিরঞ্জন, ভারত (এবং তাঁহার পূর্ব্বে বোধ হয় কালীকা মঙ্গলরচয়িতা প্রাণরাম চক্রবর্ত্তী)এই শ্লোকগুলি তাঁহাদের বর্ণনীয় বিষয়ের উপযোগী দেখিয়া নিজ গ্রন্থমধ্যে তাহা সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আর পণ্ডিত ভারত তাহার দুই অর্থ করিয়া বিশেষ বাহাদুরী দেখাইয়াছেন।

রাজা কহে কাট চোরে—সুন্দর এই স্থান হইতে বরাবর রাজার কথায় চমৎকার উত্তর দিয়াছেন। পাঠকগণ দেখিবেন,

"মৃত্যুর প্রতি ভূপতি কারণ কহে যা।
বিদ্যায় ঘটায়ে কবীশ্বর কহে তা॥"

এই স্থানে কবি যথেষ্ট পাণ্ডিত্য প্রকাশও করিয়াছেন।

বটি কল্পতরু।—অর্থাৎ বিদ্যার নয়নের ভ্রূরূপ কামানের নিকট সর্ব্বদা রাখা ব্যতীত আর দয়ার কাজ কি হইতে পারে।

হুলায়।—পরিচালন করে।

তস্কর জামাই—ভারতও ঠিক এইরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া রাজাকে জামাই স্বীকার করাইয়া লইয়াছেন যথা,

"রাজা বলে বুঝা যাবে কেমন জামাই।"

সভা সাক্ষী করে—ভারতেও আছে,

"সভা সাক্ষী হৈও রাজা বলিলা জামাই।"

কহে গুণরাশি—এস্থনে সুন্দরের উত্তর বড়ই রূঢ় হইয়াছে। কিন্তু বর্ণনা অত্যন্ত মনোহর ও স্বাভাবিক।

কাতি—বোধ হয় এস্থলে কায়েত অর্থাৎ "কায়স্থকে" উল্লেখ করিয়া বিদ্রূপ করা হইয়াছে।

চর্য্যা—পরিচয় ব্যবহার।

চাসায় পরশ পায় দুনা বাড়ে দর—চাষা এক জোয়ালে জুড়িবার মত যদি তোমার ন্যায় আর একটি জুড়ী পায়, তাহা হইলে তোমার দরও দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয়, এবং চাষারও স্পর্শ মণি পাইবার ন্যায় বিশেষ জ্ঞান লাভ হয়।

শম্ভুধাম—শিব লোক।

ও কি···চোর—এই রূপ কটু গালাগালি কবিরঞ্জনের প্রায় সমস্তই এক রূপ। কবিরঞ্জনের বর্ণনা কিঞ্চিৎ কর্কশ।

কিছুকাল…স্তব—এস্থলে সুন্দর কোতোয়ালগণের তাড়নায় যথার্থই কিছু ভীত হইয়া মনে মনে কালীর ধ্যান করিয়াছেন।
তবে ভীত হইবার তত কারণও ছিল না, যেহেতু
" ফাকি ফুকি সার, নাহি কাটিতে হুকুম "

সুন্দরের চৌত্রিশাক্ষরে কালীস্তুতি।

(৩৩০-৩৩৬ পৃঃ)

কালরাত্রি—শ্যামা কালরাত্রিস্বরূপা। শাস্ত্রমতে কালই ঈশ্বর। এই জন্য তাঁহার সংহাররূপিনী শক্তিকে কালরাত্রি বলা হইয়াছে।

কঙ্কালমালিনী—হাড়ের মালা গলায় ধারণ করিয়াছেন।

কপর্দ্দী—জটাজুটধারী মহাদেব।

খ—আকাশ।

খগেশবাহিনী-শক্তি—বৈষ্ণবী শক্তি। যাহার দ্বারা ক্ষণমাত্রে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয়।

গয়া গঙ্গা—কালীই সর্ব্ব ঘটে, বিশেষতঃ এই সকল তীর্থস্থানে কালী সদা বিদ্যমান। কবিরঞ্জনের পদাবলীতে আছে
"আমার শ্যামার পদ কোকনদে গয়াগঙ্গা বারাণসী।"

গুণত্রয় গুণময়ি—অন্যত্র আছে,
" ত্রিগুণধারিণী পুন ত্রিদেবের জায়া। "

ঘনাঘন—ঘোর এবং অঘোর রূপিনী।

ঘরণী—সুন্দর নিজ জননীর কথা কহিলেন। তিনি এসব শুনিলে প্রায় মরিয়া যাইবেন।

চতুর্দ্দল চক্রে চক্রভয় বিভেদিনী—অন্যত্র আছে,
" কুণ্ডলিনী চক্র বিভেদিনী "
কবিরঞ্জনের পূর্ব্বোদ্ধৃত ষট্‌চক্র ভেদের গান দেখ। গুহ্যে মূলাধার নামক চতুর্দ্দল চক্রে কালী ধ্যান করিলে আর মায়ায় আবদ্ধ থাকিতে হয় না।

ফণী—অনন্ত, ইনি পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন।
চুম্বিতধরণী—চুল মাটী পর্য্যন্ত লুটাইয়া পড়িয়াছে।
জন্মভূমি···বচন—কথায় বলে
"জননী জন্মভূমি চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"
অর্থাৎ প্রণান্ত বিপাকে পড়িয়া এই পাঁচ অমূল্য নিধির সহিত বুঝি বা সাক্ষাৎ না হয়।
জয়ঙ্করী—যাঁহার নাম লইলে সকল বিপদকেই জয় করা হয়।
টোটাই—কমাই। ধনুকের টঙ্কার শব্দ "মা" শব্দ দ্বারা ঢাকিয়া ফেলি।
ঠাকুরালী ছাড়—ঠাকুর ভক্তকে প্রথমে ছলনা করেন—তাহাকে পরীক্ষা না করিয়া তাহার অভিষ্ট সিদ্ধ করেন না।
ডিঙ্গিয়া—পূর্ব্বেকার খন্দক লঙ্ঘন পরীক্ষার কথা।
মসান—মসান শ্মশান কথার অপভ্রংশ।
তব তত্ত্ব···কত—ভারতে আছে,
"কত মায়া কর কত কায়া ধর
বেদের গোচর নয়।"
অন্যত্র,—
"বিধি বিষ্ণু শিব আদি তোমার মায়ায়।
মৃণালের তন্তু মধ্যে সদা আসে যায়॥"
স্থাবর জঙ্গম···নহে—ভারতে আছে,
"মাটি কাট পাথর প্রভৃতি চরাচর।
পুরাণে কোরাণে দেখ সকলই ঈশ্বর॥"
দুরিত—পাপ, দুঃখ।
ধূর্জ্জটি ধামনি—মহাদেবে দেহিনী মহাকালী।
ধরা ধরেশকুমারী—পৃথিবীধারী পর্ব্বতগণের শ্রেষ্ঠ হিমালয় দুহিতা।
ধীমান...করি—অর্থাৎ ধীরব্যক্তি ধৈর্য্যপূর্ব্বক সেই নিত্যধাম তোমার শ্রীপদ একমনে চিন্তা করেন।
নলিন নির্জ্জিত—যাহার নয়নশোভায় নীলপদ্ম পরাজিত হইয়াছে।

পদ্মযোনী...ভাবে—ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ তোমার পদের মহিমা না বুঝিয়া তাহা আশ্রয় করিয়াছেন ।

ফণীন্দ্ররূপিনী—অনন্তরূপিনী ।

বিধির বিধাতা—ভারতে আছে, আদ্যাক্তি "ত্রিগুণ জননী" ও বিধি বিষ্ণু হরেপ্রসবিনী ।

ভেশ —'ভা' ও 'ভ' = ভয়ঙ্কর ; ঈশ = স্বামী মহাদেব। ভয়ঙ্কর তেজোরূপী রুদ্রের স্ত্রী ।

যজ্ঞসমূলঘাতিনী —'যোগ, মার্গ অবলম্বন করিলে অথবা ভক্তি পথে যাইলে নিত্য নৈমিত্তিক যজ্ঞাদি কর্ম্মের আর প্রয়োজন থাকে না। অথবা দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী ।

রাঘব রমণি —রামের মনোরঞ্জন কারিণী ।

লীলায়—ক্রীড়াছলে ।

বিধিমত ··বরিল—এ স্থলে সমস্ত ব্যাপারের গূঢ় কথা সুন্দর বলিয়াছেন। যখন বিচারে হারিলে বিবাহ করা বিদ্যার পণ ছিল, তখন তদনুসারে পিতা মাতাকে না বলিয়া সে বিবাহ করিলেও বিশেষ দোষী নহে ।

সবে সুখ সম্পদদায়িনী —ভারতে আছে,

"সবে দেন কুমতি সুমতি

হিংসার —আমার মরণের, প্রাণ হননের ।

ক্ষুদ্র দোষে—বিদ্যা যেমন পূর্ব্বে সুন্দরকে গোপনে পিতা মাতার অজ্ঞাতে গন্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ করা, সামান্য দোষ বা অভ্যবতা মনে করিয়াছিলেন, সুন্দরও সেই রূপ ভাবিয়াছেন ।

পাঠক ! স্বয়ং কবিরঞ্জনের এই চৌত্রিশ অক্ষর স্তবের সহিত ভারতের পঞ্চাশ অক্ষর স্তব মিলাইয়া দেখিবেন। কবিরঞ্জনের বর্ণনা নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট। ইহা প্রাঞ্জল, প্রসাদগুণবিশিষ্ট, ভাবব্যঞ্জক, ভারতচন্দ্রের মত ইহাতে কাহার ছাড়াছাড়ি, অনুপ্রাসের বাড়াবাড়ি বা বর্ণযোজনার্থ আড়ম্বর কিছুই নাই। ভারতের মত ইহা তত দুর্বোধ্যও নহে। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে এইরূপ চৌত্রিশ অক্ষরে কাহার স্তব আছে, তাহাও অতি সুন্দর ।

সুন্দরের প্রতি কালীর অভয়দান।

(১৩৬-১৩৭পৃঃ)

দক্ষিণ শ্রবণে—ডাইন কাণে শুনিলেই সুফল হয়। তাহাতেই দেবী পরিতুষ্ট হইয়াছেন বুঝায়।

চতুষ্পাদ—(১) দীক্ষাহীন মানব পশু। (২) সালোক্য সামীপ্য সাযুয্য ও সারূপ্য এই চার প্রকার মোক্ষ।

আজ্ঞা—(১) গুরূপদেশ। এবং (২) প্রকৃত শাস্ত্রসম্মত কথা।

ক্ষিপ্ত সেই স্বধর্ম্ম খোয়ায়—প্রত্যেকেই নিজ আশ্রমোপযোগী নিজের বর্ণোপযোগী কর্ম্ম করিতে হয়। ইহাই ধর্ম্ম, ইহাই শাস্ত্র উপদেশ। এবং যে পর প্ররোচনায় তাহা নষ্ট করে, সে বাতুল। অথচ বাতুলেরাই তোষামোদে মত্ত হইয়া নিজ ধর্ম্ম বিনাশ করে। যথা গীতায় আছে,

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহ।"

এস্থলে অর্থ, যাহারা পরানুচার্য্যায় নিজ কর্ত্তব্য অর্থাৎ গুরূপদেশানুযায়ী কর্ম্ম (সাধনাদি) বিস্মৃত হয়, তাহারা ক্ষিপ্ত—কাণ্ডজ্ঞানপরিশূন্য বাতুলমাত্র।

শিষ্ট কষ্ট…ফলাফল—এই স্থানটী অতি দুরুহ, সহজে অর্থবোধ হয় না। বোধ হয়, ইহার অর্থ এইরূপ—কেহ কেহ বলেন, শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ প্রকৃত সাধকের নিকট এই কথা প্রচারিত আছে (অর্থাৎ সাধক জানেন) যে ধীরভাবে বহু যত্নে আরাধনা করিলে (অভ্যাস বৈরাগ্যেন তৎসিদ্ধিঃ) তবে লোকে সিদ্ধি লাভ করে। কিন্তু সে সিদ্ধির পথে বহুতর বিঘ্ন আছে। যাহারা সেরূপ নহে অর্থাৎ সেই বিঘ্নবাধায় যাহারা ভীত হয়, তাহাদের সিদ্ধ হওয়া বড়ই দুঃসাধ্য। সুতরাং গুরূপদেশবলে সাধকের গরলেও (কষ্ট সাধনায়ও) অমৃত লাভ হয়। আর যাহারা সাধক নহে তাহাদের অমৃত ও (বিলাস ভোগও) গরল হইয়া উঠে। বিশেষতঃ কলিকালে পাপ পুণ্যের ফলাফল বড় শীঘ্রই ভোগ করিতে হয়। এজন্য ফল হাতে হাতে পাওয়া যায়।

পরম সংস্কৃত···গম্যা—তন্ত্রোক্ত সাধনাদি ক্রিয়াকলাপ রূপ অতি উচ্চ অঙ্গের সাধনপ্রণালীগুলি গুরুর নিকটও অতি গোপনীয়।

বীর্য্যবন্ত সাধক—বহু বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া যাঁহারা সিদ্ধ হইয়াছেন, সেই সকল তেজায়ান সাধকের নিকট এই সকল গূঢ় রহস্য ব্যাপার অতীব মনোরম।

সল্লোক যে পথগামী - সদ্‌গুরু বা মহাজন যে পথ দেখাইয়া দেন, তাহাই সাধনার প্রশস্ত পথ। শাস্ত্রে আছে,—

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।"

মাধব ভট্ট—পূর্ব্বে এই মাধব ভট্টই পাত্রান্বেষণে কাঞ্চীপুর গিয়া সুন্দরের নিকট বিদ্যার পরিচয় দিয়াছিল।

নবরত্ন—নবরত্নবিশিষ্ট অঙ্গুরীয়। ১ মুক্তা, ২ মাণিক্য, ৩ বৈদূর্য্য, ৪ গোমেদ, ৫ বজ্র, ৬ বিদ্রুম, ৭ পদ্মরাগ, ৮ মরকত, ৯ নীলমণি এই নয় প্রকার মণিকে নবরত্ন বলে।

চক্কণ পাথর - পর্ব্বতজাত চাকচিক্যময় সূর্য্যের ন্যায় আভা-বিশিষ্ট বহুমূল্য মণি।

চাপ্পানী।—চাপ, ধনু।

এস্থলে ভারতের বর্ণনার সহিত কবিরঞ্জনের বর্ণনার অনেক প্রভেদ আছে। ভারত এই স্থলে অলৌকিক ঘটনার কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, কবিরঞ্জন তাহা করেন নাই। প্রথমত, ভারতের শুকমুখে সুন্দরের পরিচয় একটু অদ্ভুত রকমের হইয়াছে। সুন্দর রাজপুত্র, নিজমুখে তাঁহার পরিচয় দিবার রীতি নাই—বেশ কথা। হীরা, বিদ্যা, ভাট প্রভৃতি অনেকেই সুন্দরকে চিনিত; ভারত প্রথমে তাহাদের মুখে সুন্দরের পরিচয় না দিয়া শুকমুখে সেই পরিচয় দিয়াছেন। তাহার পর, মশানে সুন্দর কালীস্তুতি করিলে কালী একবারে যোগিনী প্রভৃতি লইয়া সসৈন্যে মসানে উপস্থিত। তাহার পর

"কোটালের সৈন্যগণে বাঁধিলেক জনে জনে
ডাকিনী যোগীনী ভূতগণ॥"

কবিরঞ্জনে এ সকল অলৌকিক ঘটনার কোন উল্লেখ নাই। তাহাতে কাব্যের সৌন্দর্য্য, উপন্যাসের কারিগরি আরও অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। তিনি শুকমুখে সুন্দরের পরিচয় দেন নাই। তাহার পর মসানে সুন্দর কালী স্তব করিলে,

কি রূপ কালীর কৃপা কহা নাহি যায়।
মাধব নামেতে ভট্ট মিলিল তথায়॥

কালীর কৃপা এই পর্য্যন্ত প্রকাশ। ইহাতে অলৌকিকতা কিছুই নাই। এ সম্বন্ধে কবিরঞ্জন শ্রেষ্ঠ।

কোটালের প্রতি মাধব ভট্টের উক্তি।

(১৩৭—১৩৮ পৃঃ)

রকত রদ ছদ—রক্ত দন্ত ছটা।

দর্প ছোড়ল…জ্ঞান—অতি গর্ব্বে তুই জ্ঞানশূন্য হইয়াছিস।

লালন…ভাট—স্নেহের কোমল ক্রোড়ে অতি যত্নে লালিত ও প্রতিপালিত সুন্দরমূর্ত্তি সুন্দরের এবম্বিধ কষ্ট দেখিয়া, মাধব ভাট কাঁদিয়া ফেলিল।

ক্যা কঁহু যাকো—যাহার প্রতি ভবানী সহায় আছেন, তাহার বিষয় অধিক আর কি বলিব।

জাকর—যাহার। যাকর—যাইয়া।

গজরাজ—পুরুষের মধ্যে হস্তিতুল্য—অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। এস্থলে ভারতও হিন্দীভাষা ব্যবহার করিয়াছেন।

দেওতোর মুঝে গারি—ইহা (দেওয়ত রে) হইবে। মাধব ভাটের তিরস্কার শুনিয়া কোতোয়াল কহিল, বড় যে আমাকে চোক মুখ ঘুরাইয়া কোটালীয়া কোটালীয়া বলিয়া বার বার গালি দিতেছিস্।

মট্ দোহাই…তোহারি—এই স্থানের পাঠটি এত গোলমেলে যে, বর্ত্তমান ভাবে ইহার অর্থ সংগ্রহ করা বড়ই দুষ্কর, তবে

পাঠটি এইরূপ হইলে অনেকটা ভাল হয়। যথা,—মঠ দোহাই লাগে তুঝে, ভট সেতার! কাঁহা চোর? কোতোয়াল তোহারি? ভাটের চোখ মুখ ঘুরাণীতে কোতোয়াল রাগে অধৈর্য্য হইয়া ভাটকে গালি দিয়া বলিল, তুই বড় যে আমায় তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া চোখ মুখ ঘুরাইয়া গালি দিতেছিস্, তোকে তোর গুরু মন্দিরের দোহাই শীঘ্র লাগে, অর্থাৎ তুই তোর গুরুমন্দির বা দেবমন্দির ছুঁয়ে শপথ করে বল্, কে চোর বা কোথায় তোর চোর? তবে কি তোর চোর এই কোতোয়াল, যে অমন করিয়া ঝাল ঝাড়িতেছিস্? বলা বাহুল্য যে, ভাটের কথায় ভাটকেই চোরের সহচর, সন্দেহ জন্মিয়াছিল।

ভাট কহে. .কিজিয়ে—ভাট প্রথমে কোতোয়ালকে খুব এক হাত নিয়াছিল। কিন্তু কোতোয়াল যেমন তাহার উপর ঝাঁকিয়া উঠিল, ভাট অমনি নরম হইয়া বলিল, কোতোয়াল রে অমন করে গালি দিস্ না, কারণ যদি তোর অনবধানতায় সুন্দরের প্রাণের কোন অনিষ্ট ঘটে, তবে তুইও সপুরি এক গাড় যাবি।

গাধি—'গাদি' হইবে। (অর্থাৎ পুরীসুদ্ধ, বা সবংশে)

মাধবের প্রতি কোটালের কটুবাক্য।

১৩৯—১৪০ পৃঃ

থয়ের—মঙ্গল।

মৌত লাগা—তোর মরণ উপস্থিত।

বেল্‌ফেয়াল—আপাততঃ-সম্প্রতি।

মোচ তো উখাড়ো—গোঁপ ছিড়ে ফেলো।

পদ্য দেখি ...হা করে—বোধ হয় এই স্থলের অর্থ এইরূপ—যেমন চিকিৎসা শাস্ত্রে রোগের ঠিক ঔষধ লেখা থাকিলেও এবং তাহার ব্যবহারে সদ্য রোগ নাশ হইলেও তাহার

প্রকৃত ব্যবহার না জানায় বৈদ্য যেমন চিকিৎসা করিতে যাইয়া সেরূপ ফল পান না—যে রূপ পদ্যে ছন্দোবন্দে যে কথা যে ভাব ব্যক্ত হয়, তাহাতে যত রস, যত মধুরতা থাকে, সেই কথাকেহ গদ্যে বিকৃত করিলে তাহার রস নষ্ট হয়, অর্থাৎ তাহার প্রকৃত ভাব ও গাম্ভীর্য্য রক্ষা হয় না, (এ সময়ে গদ্যের আদর ছিল না, এবং একখানিও গদ্যগ্রন্থ লিখিত হয় নাই।) সেইরূপ রাজার নিকট সুন্দরের পূর্ব্ব পরিচয় দিয়া মসানের এই সকল গোলযোগ প্রতি-বিধানের সম্পূর্ণ উপায় মাধব ভাটের স্বায়ত্ত থাকা স্বত্ত্বেও সেই সহজ পথ অবলম্বন না করায় কোতোয়ালের নিকট গিয়া বিফলমনোরথ হইলেন, এবং কোতোয়ালের নিকট অনর্থক অবমানিত হইলেন।

'গুণ যেন...ঘটে— যেমন বিশিষ্ট গুণযুক্ত দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হওয়ায়, সেই সংযোগ জন্য কোন সাধারণ দ্রব্যের গুণ পরিবর্ত্তিত হইয়া উৎকৃষ্ট গুণ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ অপরিণাম-দর্শী নব্য লোক পারিণামদর্শী সভ্য লোকের সঙ্গে থাকিলে ভদ্র হয়। এ কারণ উদ্ধত স্বভাব কোতোয়াল যদি সুসভ্য ভদ্রলোকের নিকট থাকিয়া ভব্যতা শিখিত, তবে ভাটকে অযথা গালি দিত না।

ভূপতির সভা সুদ্ধ মসানে গমন।

(১৪০—১৪১ পৃঃ)

জম্বুদ্বীপ— সাধারণতঃ ভারতবর্ষকেই জম্বুদ্বীপ বলে। ভারতে আছে,—

"সপ্ত দ্বীপ মাঝে ধন্য ধন্য জম্বুদ্বীপ।
তাহাতে ভারতবর্ষ ধর্ম্মের প্রদীপ॥"

(অন্নদামঙ্গলের টীকার ৩৯১—৯২ পৃষ্ঠা দেখ।)

রাজ্য সুদ্ধ....প্রাণী—সে দেশের সকল লোকই বাহিরে বৈষ্ণব বেশে থাকিয়া, সর্ব্বদা মুখে রাধাকৃষ্ণ বলে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহারা সকলেই শাক্ত, কালীই তাহাদে অন্তরে সদা বিরাজিত থাকিয়া তাহাদিগকে পরিচালিত করিতেছেন। শাস্ত্রমতে সাধকের মনের প্রকৃত কথা বাহিরে প্রকাশ করিতে নাই, কারণ,—

"গুরু মন্ত্র ইষ্টদেব পরমায়ু ধর্ম্ম,
ব্যক্ত করা মত নহে এ সকল কর্ম্ম।"

শাক্তসম্বন্ধে তন্ত্রে এই উপদেশ আছে, যথা—

"অন্তে শাক্তাঃ বহিঃ শৈবাঃ সভায়াং বৈষ্ণবাস্তথা।"

বৈশ্য ক্ষত্র...যেবা কহে—অর্থাৎ বৈশ্য ক্ষত্র প্রভৃতি নিত্যানন্দ ও বীরভদ্র পরিবারভুক্ত বৈষ্ণবদিগের মধ্যে, যে কেহ এই কর্ম্মভূমে আসিয়া আপনার বর্ণগত কর্ত্তব্য কর্ম্মকে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে না করে, এবং তৎপালনে পরাঙ্মুখ হয়, তাহার স্বর্গলাভ হয় না, এবং ইহাদের সংশ্রবেও যাহারা থাকে, তাহারা তদ্রূপ দশাগ্রস্ত হয়। স্বয়ং ভগবান গীতায় ইহা বলিয়াছেন,—

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"

সুন্দরের প্রতি ভূপতির বিনয়োক্তি।

১৪২—১৪৪ পৃঃ

তমোগুণে—অহঙ্কারবশে, অজ্ঞানান্ধ হইয়া। যশোদা কৃষ্ণকে উদূখলে বন্ধন করিয়াছিলেন।

বিমুখ তাঁরে—বিরাটের প্রতি বাম।

মর্য্যাদা—(মার্জ্জনা পাঠ হইলে অর্থ অধিক সঙ্গত হয়।) অর্থাৎ আমি না জেনে যে সকল দোষ করিয়াছি, তাহা তোমাকে মর্য্যাদা করিয়াছি, এইরূপ বিবেচনা করিয়া লহ।

মাণিক...নাই—কথায় আছে, "অস্থানে পতিতামতীব মহতা

মেতাদৃশীস্যাদ্গতি” অর্থাৎ জহুরী না হইলে জহর চেনে না। মূর্খে মাণিকের আদর জানে না।

শিলাপুত্র—বালকেরা যেমন শালগ্রামকে না চিনিয়া সামান্য পাথরের নুড়া মনে করিয়া তাহার সহিত ক্রীড়া করে, আমিও সেইরূপ তোমাকে অবহেলা করিয়াছি।

নিজ নিজ কর্ম্মভোগ—পূর্ব্বেও অভেদ্য কর্ম্মবন্ধনের কথা বলা হইয়াছে, তবে তাহা সমস্তই ঈশ্বরকৃত এইমাত্র বিশেষ। মানুষ কর্ম্মফল ভোগ করে সত্য, কিন্তু সে কর্ম্ম বা ফল সকলই কালীর ইচ্ছায় সম্পাদিত হয়, মানুষের তাহাতে কোন হাত নাই। ইহাই প্রকৃত সাধকের কথা।

যেন রথচক্রাকৃতি—কথায় আছে,

“চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ ॥”

অর্থাৎ রথচক্রের গতির ন্যায় মানবের সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখ পর্য্যায়ক্রমে আসিতেছে।

রাণীর বিদ্যার প্রতি বিনয়।

(১৪৪—১৪৫ পৃঃ)

আগো মাগো···মিলে—বিদ্যা পূর্ব্বে তাহার মাতাকে যেরূপ তাচ্ছিল্য করিয়াছিল, এই বিনয়োক্তির সহিত তাহার সামঞ্জস্য হয় না।

বিদ্যার উল্লাস।

১৪৫—১৪৬ পৃঃ

বদনে রসনা রব—হুলুধ্বনি, উলু উলু শব্দ।

মহাশঙ্খ মালা—মনুষ্যের কর্ণ ও নেত্রের মধ্যগত অস্থিনির্ম্মিত জপ মালা। তান্ত্রিকেরাই ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে।

মতান্তরে,—

"নরাঙ্গুল্যস্থিভির্মালা গ্রথিতা পর্ব্ব ভেদতঃ।
নাড্যা সংগ্রথিতা মালা কার্য্যা রক্তেন বাসিতা॥"

সাবিত্রী সমান ভব—ব্রাহ্মণগণ বিদ্যাকে সাবিত্রী সমান হও বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। এস্থলে কালীভক্ত সুন্দরের মোচন শুনিয়া, কালীকার ব্রতদাসী বিদ্যা আনন্দে অগ্রে সুন্দরের সম্ভাষণে না যাইয়া, কালীকার পূজা করিলেন, ইহাতে বিদ্যার চরিত্র উত্তম রক্ষিত হইয়াছে। ভারতের বিদ্যার ইহার কিছুই নাই।

জননী জনক—এস্থলে কালীকে ও শিবকে পিতা মাতা ভাবে উপাসনা করা হইয়াছে।

বদরি কোমল...ত্বরা—কবির এই সকল কুট কথা সহজে বুঝা যায় না। বোধ হয় এটী ষট্‌চক্রভেদের কোন গূঢ় কথা হইবে। মূলাধারে শিবের মস্তকস্থিত কুণ্ডলিনী কালীর মুখ নিঃসৃত সুধা মৃণাল তন্তুবৎ ব্রহ্ম নাড়ী দিয়া সহস্রারে আসিয়া সমস্ত শরীরকে সুধাসিক্ত করে। ইহার প্রকৃত তত্ত্ব সাধক ব্যতীত আর কেহই জানিতে পারে না। অথবা কাব্যরস উল্লেখ করিয়াও একথা বলা হইয়া থাকিবে। বদরিকোমল কি অর্থে বলা হইয়াছে, বুঝা গেল না।

রসবেত্তা—ভক্তিরস বা কাব্যরস উভয়ই হইতে পারে। সম্ভবতঃ এস্থলে ধর্ম্ম ভাবকেই উদ্দেশ করা হইয়াছে।

গবা গণ...হাসে—এই ইঙ্গিত অতি সুন্দর হইয়াছে। বাস্তবিক যাহারা নির্ব্বোধ প্রকৃত রসজ্ঞ নহে, তাহারা এইরূপ গরুর মত ভঙ্গী করে মাত্র। তাহারা কোন রস বুঝে না। গো, সম্বোধনেও হইতে পারে। বাস্তবিক বানর ব্যতীত আর কোন পশুই মুখভঙ্গী করিতে জানে না।

অরসিক...মরণ—সংস্কৃত শ্লোক আছে,

"ইতরতানি তাপশতানি যথেচ্ছয়া
বিতর মাংপ্রতি চতুরানন।

অরসিকেতু রসস্ত নিবেদনং
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ॥"

গ্রন্থমধ্যে…স্থানে—শুধু এই জন্যই গ্রন্থমধ্যে স্থানে স্থানে যে সকল কুট শ্লোক আছে, তাহা বুঝা যায় না। আমরা যথাসাধ্য তাহার অর্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু সর্ব্বত্র সফল হইয়াছি বলিয়া বোধ হয় না। প্রকৃত গুরূপদেশপ্রাপ্ত সাধক ব্যতীত আর কেহ এ সকল বুঝিতে পারিবে না, কবির এইরূপ ইচ্ছা।

ভূপতি হইতে সুন্দরের সম্মানপ্রাপ্তি।

(১৪৭—১৪৯ পৃঃ)

শাস্ত্রসিদ্ধ কথা বটে এই—এস্থলে সুন্দরের বিবাহ যে আদৌ অশাস্ত্র নহে, তাহা কবি বিলক্ষণরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। গন্ধর্ব্ববিবাহের পর আর বিবাহ হয় না—ইহাই শাস্ত্রসম্মত।

এই কথা কবি রুক্মিণী, সত্যভামা, সুভদ্রা ও উষার দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। ভারতে গন্ধর্ব্ববিবাহের স্বাপক্ষে এরূপ কোন কথা নাই। একস্থানে মাত্র আছে,

"এইরূপে অনিরুদ্ধ উষা হরেছিল।
* * * * *
অতএব সহসা বধিবা যুক্তি নয়।"

গ্রন্থশ্রেষ্ঠ…নাথে—ভাগবত কবিরঞ্জনমতে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইহার স্বামীকৃত টীকাই অতি প্রসিদ্ধা, তাহাতে উক্ত আছে যে ঈশ্বরকে কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় না, কারণ

"নমাং কর্ম্মাণি লিপ্যান্তি নমে কর্ম্মফলে স্পৃহা॥"

এই ভাগবতেই সত্যভামা সুভদ্রা প্রভৃতির গোপনে গন্ধর্ব্ববিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া অনুমোদিত আছে।

কালভেদে মতভেদ—ভিন্ন ভিন্ন যুগে আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম,

মত সকলি বিভিন্ন। যথা, সত্যযুগের ধর্ম্মশাস্ত্র মনু, কিন্তু কলিতে পরাশর স্মৃতিই প্রয়োজ্য।

আছে পূর্ব্বাপর নীত—এইরূপ গন্ধর্ব্ববিবাহ রীতি বরাবরই প্রচলিত আছে।

রত্নসিংহাসন মাঝে—ভারতে আছে,

সিংহাসনে বসাইয়া বসন ভূষণ দিয়া
বিদ্যা আনি কৈলা সমর্পণ॥"

বোধ হয় ভারতের বিদ্যাকে পুনর্ব্বার সুন্দর সঙ্গে রাজা বিবাহ দিয়াছিলেন। (সমর্পণ) কবিরঞ্জনে সেরূপ নাই।

মাণিক্য জড়িত হেম—যেমন সুন্দর অলঙ্কারের মধ্যস্থ মাণিক্যকে স্বর্ণ ঘেরিয়া থাকে, (তাই জড়োয়া গহনা বলে) সেইরূপ সুন্দররূপ মাণককে বিদ্যারূপ স্বর্ণ ঘেরিয়া রহিল তাহাদের ক্ষণমাত্র বিচ্ছেদ ছিল না।

চলিত গানে আছে,

"মরকত পাশে হেম মেঘে সৌদামিনী যেন
মাধবীলতা তমালে বেড়িল।"

সুন্দরকে মাতৃবেশে কালীর স্বপ্ন দান।

(১৪৯—১৫০ পৃঃ)

শাপভ্রষ্ট জম্মধরা—অন্যত্র আছে,

"শাপভ্রষ্ট তোমা দোঁহাকার জম্ম মহী॥
বিদ্যাবতী হারাবতী তুমি মালাধর।
মম পূজা প্রকাশার্থে হইয়াছ নর॥"

এরূপ ভাব ভারতের বিদ্যাসুন্দরে স্পষ্ট নাই। সুধু এই মাত্র আছে,

"তোরা মোর দাস দাসী, শাপেতে ভূতলে আসি,
আমার মঙ্গল প্রকাশিলা॥"

কত বা সন্তান···ভূত—নানা জাতীয় মানবেরা বৃদ্ধ কালের সেবা সুশ্রুষার জন্যই সন্তান কামনা করে, এবং সন্তা-

নেরও বৃদ্ধকালে জনকজননীর সেবা সুশ্রুষা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহাদের ভাগ্যে সব সন্তান সমান জন্মে না, কেউ সৎ কেউ অসৎ হয়।

কিদোষ তোমারি···মন্ম—আজি কালির পাঠকগণ এ কথা মনে রাখিবেন। ইহাঁরা বরং মাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু রমণীর মোহিনী মায়াপাশ কাটাইতে পারেন না। মাগ-সর্ব্বস্ব নবীন নাগরদিগের চরিত্র এস্থলে সুন্দর স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে।

বিদ্যার নিকট বিদায় প্রার্থনা।

(১৫০—১৫২ পৃঃ)

যাবে কি না যাবে তুমি—ভারতে আছে,

"যদি মোরে ভাল বাস সংহতি চলহ।"

সে নাকি বিচ্ছেদে থাকে—ভারতে আছে,

"বিধিকৃত স্ত্রীপুরুষ কে ছাড়ে কাহারে॥"

বৎসরেক বই···ক্লেশ—ভারতের বিদ্যাও ঠিক এই কথা বলিয়াছেন,

"কৃপাকরি করিয়াছ যদি অনুগ্রহ।
এই দেশে প্রভু আর দিন কত রহ॥"

যে মাসে যে গুণ—ভারতের বারমাস বর্ণনা আছে। বিদ্যা বলিয়াছেন,

"বার মাসে মাসে মাসে যে সেবা পতির।
যে নারী না করে তার বিফল শরীর॥"

বিদ্যা কর্ত্তৃক বার মাস বর্ণন।

(১৫২—১৫৬ পৃঃ)

মেষ—এখানে মেষ বৃষ প্রভৃতি দ্বাদশটী রাশির দ্বারা বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ প্রভৃতি দ্বাদশটী মাসের নাম করা হইয়াছে।

কুসুমশর শরে—কুসুম (ফুল) হইয়াছে শর (বাণ) যাহার, সেই মদনের বাণে।

নেত্রানলে...সেই—মদন হরকোপানলে ভস্ম হইয়া পুনর্ব্বার জীবিত হয়।

বিরূপাক্ষ...ঈশ—মহাদেব। মদন তাহাকে বাণবিদ্ধ করিয়াছিল।

মলয়জ পঙ্ক—চন্দন।

মিথুনে মিথুনে—আষাঢ়ে স্বামী সহ বাসে।

যারা তারা সেবে তারা—যাহারা বিরহিণী কুলবধূ, তাহারা বসিয়া বসিয়া শুধু তারা গণিতেছে।

দুঃখ শান্ত কান্ত কি কৃতান্ত—সংস্কৃতে আছে;

"অদ্য কান্তঃ কৃতান্তোহবা দুঃখ শান্তিং করিষ্যতি।"

এ মহা দুঃখের অবসান, হয় স্বামী নয় শমন, এই দুয়ের এক জন করিতে পারেন।

আটনি...দামনি—বিদ্যুতের লকলকি মদনের হাত নাড়ার তুল্য।

দেবরাজ—মেঘ ও বৃষ্টির অধিপতি ইন্দ্র, মেঘসম্পাতে ও বিন্দু বিন্দু বারিপাতে বিরহিণীর মর্ম্মদাহ করিতেছেন।

মেঘদূতে আছে,—

"মেঘোদয়ে ভবতি সুখীনোহপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ
কণ্ঠশ্লেষে প্রণয়িনি জনে কিং পুনঃ দূরসংস্থে।"

শক্তি—এস্থলে শারদীয়া দুর্গাপূজা।

সুর-তরু...কল্প—তুমি দানে কল্পবৃক্ষ সদৃশ। মন্দার, পারিজাত, সন্তান, কল্পতরু ও হরিচন্দন এই পাঁচটীকে সুর-তরু বলে।

ছুই—স্বামী সহ একত্রিত।

ভগবান—ভাগ্যবান্। লক্ষ্মীযুক্ত। ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহং। গীতা ১০।৩৫।

ত্রিবিধ প্রকার…লোক—আমীর, ফকির ও মধ্যবিৎ লোক, অথবা ধনী, কৃষি ও ব্যবসায়ী।

কাকবলি—নবান্ন সময়ে নূতন তণ্ডুল দ্বারা পিতৃপুরুষাদির শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিয়া তাহার অগ্রভাগ কাককে দিয়া পরে নবান্ন খাইতে হয়।

তরুণী তপন তুলা…ভোজন—একটা চলিত কথায় শীতকালের প্রিয় দ্রব্যগুলির নামোল্লেখ আছে। যথা—

" তেল তামাক আর তপন তুলা তপ্ত ভাতে ঘি।
পাপোষ পাশুড়ি আর শ্বাশুড়ির ঝি॥"

দশ দণ্ড মধ্যে…হবে—অর্থাৎ সকাল সকাল ভোজন হবে।

চেতনবিশিষ্ট মনু…তনু—যে লোক চেতনবিশিষ্ট—অর্থাৎ সংসারের মোহে আবদ্ধ নহে—সে জপ হোমাদি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের দ্বারা আপনার পাপ দূর করে। ভারতে আছে,—

"চেতরে চেতরে চেত তাকে চিদানন্দ।
যে জন চেতনমুখী সেই সদা সুখী।"

মিনে…মীনকেতু—চৈত্রে মদন। মধু-বসন্ত কাল।

তার দৈবে…পরভৃতবধূ—পাপ মদনের দৈব অর্থাৎ দেব বিড়ম্বনায় লাজ ভয় নাই, আর চন্দ্র—সে ত নিজে কলঙ্কী, সুতরাং তার আবার লজ্জা ভয় কি! আরও দুঃখের বিষয় এই যে, পরগৃহে পালিত যে কোকিল, সেও এখন সময় পেয়ে বিরহিণী বধের কারণ হইয়া দাঁড়াইল।

রাজা মূর্খ…মূর্খ পাত্র—মদন রাজা ও তাহার সখা ও মন্ত্রী বসন্ত বড়ই মূর্খ ও পরমন্দকারী।

ভারত বিদ্যাসুন্দরে এবং কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে, কবিরঞ্জনের ন্যায় বার মাস বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে ভারত ও কবিরঞ্জন স্বামী সহবাসে যে সুখ, তাহাই বর্ণনা করি-

যাছেন—আর কবিরঞ্জন স্বামী বিরহে যে কষ্ট হয়, তাহাই প্রধানতঃ উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা হউক সকলেরই বর্ণনা প্রায় একরূপ। পাঠক তাহা দেখিয়া লইবেন।

বিদ্যার শ্বশুরালয়ে গমনার্থ প্রার্থনা।

(১৫৬—১৫৭ পৃঃ)

শাস্ত্রসিদ্ধ কথা...ধ্বনি—ইহা শাস্ত্রসম্মত ও শাস্ত্র সঙ্গত কথা যে, যে জনক জননী হইতে এই দুর্ল্লভ মানবদেহ ধারণ করিয়াছি, ভক্তিভাবে সেই জনকজননীর চরণ সেবা ভিন্ন মুক্তি কেবল কথার কথা বা একটা ধ্বনিমাত্র। শাস্ত্র মতে বহু যোনি ভ্রমণ করিয়া পরে আমরা এই মাতাপিতৃজ মানব দেহ ধারণ করিয়া তৎ সাহায্যে সাধনাদি ধর্ম্ম কার্য্য করিলে তবে মুক্ত হইতে পারি। কারণ "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং।"

লয় কালে লয়···গঙ্গাতীরে—মৃত্যুকালে গঙ্গাতীরে লইয়া যায়। কাঞ্চীপুর দেশে সুন্দরের বাস। সেখানে গঙ্গা নাই। সুতরাং কথাটা অপ্রাসঙ্গিক। ভারতে আছে—

"শুনিয়াছি সে দেশের কাঁই মাই কথা।
হায় বিধি সেকি দেশ গঙ্গা নাই যথা॥
গঙ্গাহীন সে দেশ এ দেশ গঙ্গাতীর।"

জম্ম—জন্ম।

হও তুমি পুত্রবতী ..সতী—ভারতে ঠিক ইহার বিপরীত আছে,

" যদি মোরে ভালবাস সংহতি চলহ।"

কবিরঞ্জন বিদ্যাকে যেরূপ বিদ্যাবতী, বুদ্ধিমতী করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—এ স্থান তাহার উপযুক্ত হইয়াছে। সুন্দর বিদ্যাকে নিজের দেশে যাইবার কথা বলিলে বিদ্যা অভিমান করিলেন, এবং স্বয়ং মাতার কাছে গিয়া স্বামী সঙ্গে যাইবার অনুমতি চাহিলেন।

মেলানি—বিদায়।

রাণীর প্রতি বিদ্যার প্রবোধ বচন।

(১৫৮—১৬১ পৃঃ)

এই স্থানটী অতি চমৎকার। বিদ্যা যে প্রকৃত বিদ্যাবতী, ভারত তাহার কোথাও পরিচয় দেন নাই। ভারতের বিদ্যা চিরকালই রঙ্গরস লইয়া উন্মত্ত। এই বিদায়ের সময়েও সন্ন্যাসিনী সাজিয়া কত রঙ্গ করিয়াছিল, কিন্তু কবিরঞ্জনের বিদ্যা স্থানে স্থানে আপনার অসাধারণ বিদ্যার পরিচয় দিয়াছেন। তন্মধ্যে এই স্থানটী অতি উৎকৃষ্ট। পাঠকগণ এরূপ বর্ণনা আর কোথাও পাইবেন না।

মুনি···মনোহরা—যে কথায় মুনিরও মন হরণ করে।

মাতৃহত্যা···ভয়—রাণীর শোক অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। রাণী সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায় মায়ামুগ্ধা।

কার পুত্র···দুহিতা—ভারতে আছে,

মিছা দারা সুত লয়ে, মিছা সুখে সুখী হয়ে।
যে রহে আপনা কয়ে সে মজে বিষাদে॥
সত্য ইচ্ছা ঈশ্বরের আর সব মিছা ফের—

বিষম যাঁহার মায়া...ব্যাপিনী—ভারতে আছে,

"কত মায়া কর কতমায়া ধর বেদের গোচর নয়।
বিধি হরিহর আদি চরাচর কটাক্ষেতে কত হয়॥"

কর্ম্মভোগ—নিজ কৃত কর্ম্মের ফলভোগ। পূর্ব্বে ইহার শাস্ত্র প্রমাণ দেখান হইয়াছে।

বাহ্য জ্ঞান নাই—যিনি মহাযোগী, তিনি বাহিরের বিষয় কিছুই দেখেন না। তাঁহার ইন্দ্রিয়দ্বার গুলি নিরুদ্ধ। কারণ "যোগশ্চিত্তবৃত্তির্নিরোধঃ।"

নিবৃত্তি মার্গ—সংসারের মিছা মায়া ত্যাগ করিয়া সত্য ও ধর্ম্ম পথে যাওয়া উচিত, তাহা প্রথমে বুঝান হইল।

প্রবৃত্তি মার্গ—কিন্তু সাংসারিক লোক এ উপদেশের মর্ম্ম বুঝিবে না—কেন না তাহারা মায়ামুগ্ধ। আপন আপন

করিয়া আপনার লইয়াই ব্যস্ত। এই জন্য বিদ্যা এ স্থলে সাংসারিক লোকের ন্যায় পুনর্ব্বার উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন।

কন্যাপুত্র···কর্ম্ম—সন্তান হইতে সুখ অপেক্ষা দুঃখই অধিক ভোগ করিতে হয়।

তুভ্যমহং সম্প্রদদে—তোমাকে আমি এই কন্যা সম্প্রদান করিলাম। ইহা কন্যা সম্প্রদানের মন্ত্রের অংশ।

ক্ষমা—সহিষ্ণুতা।

জল শৈবালের ন্যায়—পদ্মপত্র ও শৈবালের দলের উপর যেমন জলের বিন্দু স্থির থাকে না, তাহা এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়ায়, মনও তদ্রূপ চঞ্চল।

ক্ষণেকে বিবেক···শরীর—এই স্থান অতি চমৎকার। বাস্তবিক মানুষের মন, জ্ঞান ও মোহের মধ্যে ঘড়ির দোলক (পেণ্ডুলম্) মত সর্ব্বদা এদিক ওদিক দুলিতেছে।

বিদ্যা সহ সুন্দরের স্বদেশ গমন।

(১৬১—১৬৪ পৃঃ।)

স্বপ্নরূপ কন্যাগুলা...পাশিল—এই স্থানের ন্যায় চমৎকার ভাব আর কোথাও দেখি নাই। এই সকল বর্ণনা হইতেই, কবিরঞ্জন যে প্রকৃত কবি ছিলেন, তাহা বেশ বুঝা যায়।

উত্তর মুখে—শাস্ত্রমতে উত্তরায়ণ পথে গমন করিলে দেবলোকে যাওয়া যায়। "দেব যজ্ঞাদি মহামহা পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা যে সকল মহাত্মাগণের চিত্ত দেবলোকে যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হয়, তাঁহাদের অন্তরে পিঙ্গলা নাড়ী বা যমুনানদী দীপ্তি পায়। তাহা স্বর্গপথ স্বরূপে সূর্য্যপ্রভা সমুজ্জ্বলিত সুরলোক পর্য্যন্ত আয়ত। ইহাকেই দেবস্বর্গের নেতা মহা দীপ্তিমান্ উত্তরমার্গ, উত্তরায়নমার্গ, অগ্নিমার্গ, জ্যোতিমার্গ, সূর্য্যদ্বার,

শুক্লমার্গ, অর্চ্চিরাদি মার্গ, দেবজান প্রভৃতি কহে।" শাস্ত্রে আছে,

"অগ্নি র্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষন্মাস উত্তরায়ণং।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদোজনাঃ॥"
ভগবদ্গীতা।

অপরাহ্ণে তরুছায়া...মূল---এই উপমাটী অতি চমৎকার। কালিদাসেও এইরূপ একটী উপমা আছে।

গোটা দুই কথা—আজ কালের সকল গৃহিণীরই এই অমূল্য উপদেশগুলি মনে রাখা কর্ত্তব্য।

দশদণ্ড মাত্র দিবা—শিবজ্ঞান মতে ইহা যাত্রার শুভ সময়।

জনকের অধিকার সীমা ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, তৎকালে বর্দ্ধমান রাজ্য অতি বিস্তৃত ছিল। দশ দিবসের পথ যাইলে তবে তাহার সীমায় আসা যাইত।

ভারত এই স্থানেই সঙ্খেপে তাঁহার বিদ্যাসুন্দর শেষ করিয়াছেন। কিন্তু কবিরঞ্জন ইহার পর আরও অনেক নূতন বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। ভারত এগুলি কেন ত্যাগ করিলেন বলা যায় না। তাহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক বা কাব্যের অনুপযোগী হইত না।

সুন্দরকে আনয়নার্থ তাহার পিতার প্রত্যুদ্গমন।

(১৬৪—১৬৬ পৃঃ)

জীবন্যাস—পূর্ব্বে যোগবলে জীবন্যাস মন্ত্র দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে পুনর্জ্জীবিত করা যাইত।

বিদ্যাকে দর্শনার্থ নারীগণের আগমন।

(১৬৬—১৬৬ পৃঃ)

মুখফোড় মেয়ে—যাহারা মুখরা ও স্পষ্টবাদিনী।
জগদীশ্বরী—কবিরঞ্জনের কন্যা।
নায়ক—প্রধান গায়ক। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, তৎকালে বিদ্যাসুন্দর রীতিমত গীত হইবার জন্যই লিখিত হইয়াছিল। তখনকার সকল কাব্যই গীত হইত। এখনকার মত সোজা করিয়া কাব্য পড়িবার রীতি ছিল না।

সুন্দরের স্বরাজ্যাভিষেক।

(১৬৭—১৬৯ পৃঃ)

সম্মত প্রজা যতেক—হিন্দু রাজ্য অবশ্য প্রজাতন্ত্র ছিল না। কিন্তু রাজা প্রজাবৎসল ছিলেন। প্রজার সম্মতি লইয়াই সকল কাজ করিতেন। প্রজারঞ্জন তাঁহাদের প্রধান ব্রত ছিল। এই জন্য এস্থলে পুত্রকে রাজ্যাভিষেক কালে গুণসিন্ধুরাজ প্রজাদের সম্মতি লইয়াছিলেন।
বামেতে মাহষী—হিন্দু রাজাদের এই নিয়ম ছিল। প্রজাপালন রাজধর্ম্ম এবং সস্ত্রীকোধর্ম্মমাচরেৎ।
কবিরাজ—কবিশ্রেষ্ঠ, জ্ঞানবান।
নিজ দেহ ছবি…দীপ জ্বলে।—এই উপমাটী অতি চমৎকার। কালিদাসের রঘুবংশ হইতে ইহা গৃহীত। যথা,

"ন কারণাৎ স্যাৎ বিভিদে কুমারঃ।
প্রবর্ত্তিতাদীপ ইব প্রদীপাৎ॥"

অভেদ সুন্দর—নিজ সৌন্দর্য্যের সাহিত ইহার কোনই প্রভেদ নাই। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।

সপ্ত দিন...তন্ত্র—কবিরঞ্জনের সময়ে বিদ্যাভ্যাসের এই রীতি ছিল। আজি পর্য্যন্ত "টোলে" এই নিয়ম প্রচলিত আছে।

গণ—গণ পাঠ বা ধাতুমালা শিক্ষা।

দণ্ডী—ইনি "কাব্যাদর্শ" নামক অলঙ্কার শাস্ত্রের রচয়িতা। দশকুমারচরিত্র নামক ইহাঁর কৃত আর এক খানি উৎকৃষ্ট উপাখ্যান আছে।

তদনু কাব্যপ্রকাশে—তাহার পর, অর্থাৎ "কাব্যাদর্শ" পাঠের পর কাব্যপ্রকাশ নামক অলঙ্কার শাস্ত্র পাঠ করেন।

পিঙ্গল—পিঙ্গলাচার্য্য কৃত ছন্দগ্রন্থ।

নিল একাক্ষরী মন্ত্র—সুন্দরের পুত্র বিদ্যা শিক্ষা শেষ করিয়া মাতার নিকট দীক্ষিত হইলেন। মাতাই তাঁহার গুরু হইলেন। একাক্ষরী মন্ত্র—কালীমন্ত্রের বীজ। "ক্রীং"।

সুন্দরের দক্ষিণাকালিকা মূর্ত্তি সংস্থাপন।

(১৬৯-১৭১পৃঃ)

বিষ্ণুপদ—আকাশ।

শবারূঢ়া মুক্তকেশী—বীরাচার মতে দক্ষিণাকালীর ধ্যান এই।—

"প্রেতহৃদিস্থিতাং বিবসনাং নির্জ্জীব কর্ণোৎপলাং
ত্যক্তাশু হস্তাম্বুজৈঃ কাঞ্চিমুগ্র করালদংষ্ট্রবদনাং।
খড়্গাভয় বরমুণ্ডমুণ্ডিতভুজাং বহ্ন্যার্ক চন্দ্রেক্ষণাং
মুক্তমৌলি পিঙ্গলজটাং শ্রীকালিকাংদক্ষিণাং॥"

শ্রেষ্ঠ—"বীর্য্যবন্ত সাধক।"

ভৌমবার—মঙ্গলবার।

গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি...ব্যস্ত—কবিরঞ্জন কিরূপ সাধক ছিলেন, তাহা এই স্থান হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়। তাঁহার মনে যখন ভক্তির স্রোত বহিত, তখন তাহার প্রভাবে সমস্তই ভাসিয়া যাইত, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান দূর হইত, তিনি নিজ কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইতেন। তিনি যখন ভাবে এইরূপ বিভোর হই-

তেন, তখন তাঁহার মুখ হইতে স্বতঃই সংগীত নির্গত হইত, তাহার জন্য তাঁহার চেষ্টা বা যত্ন করিতে হইত না। তিনি অবলীলাক্রমে গান রচনা করিতেন।

স্বকীয় কল্যাণ—সকল লোকেরই নিজ নিজ কল্যাণার্থ পরকালের জন্য এই সকল বিষয় জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। অথবা কবি তাঁহার নিজ মঙ্গলকামনায় এই বিষয় বর্ণনা করিলেন।

অকর্ত্তব্য হেতু— শাস্ত্রমতে সাধনার এই সকল গুহ্য কথা কাহাকেও বলিতে নাই। যিনি রীতিমত দীক্ষিত, তিনিই এ সকল বিষয় জানিবার অধিকারী হইলে, গুরুর নিকট উপদেশ পাইতে পারেন। নতুবা আর কেহ তাহা জানিবার অধিকারী নহে। তাই কবি ইঙ্গিতে ইহার বর্ণনা করিয়াছেন। এবং প্রকৃত তন্ত্রজ্ঞের নিকট তাঁহার অসম্পূর্ণ বর্ণনা, এবং গুহ্য কথা প্রকাশের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন।

শবসাধন।

(১৭১-১৭৬পৃঃ)

এই শবসাধনের সমস্ত প্রক্রিয়া বুঝা সহজ নহে। যিনি রীতিমত তন্ত্র জানেন, বা স্বয়ং সাধনা করিয়াছেন, তিনিই ইহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারেন। কিন্তু এরূপ লোক এখন বিরল। বিশেষ ইহা সাধারণে জানিবার ও কোন উপায় নাই। গুরুই কেবল সাধককে তাহা বুঝাইবেন, সাধক সেই মত সাধনা করিবেন। অন্যে তাহা জানিতে পারে না। তন্ত্রসারে শবসাধনার এই সকল কথা লিখিত আছে। আমরা নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

সামামার্ঘে সুবিধান—যথানিয়মে জল ফুল দূর্ব্বা আতপ তণ্ডুল দ্বারা পূজার পূর্ব্ব বিধান ব্যবস্থা করা।

তন্ত্র—যে সকল চক্র প্রভৃতি অঙ্কিত করিয়া তন্মধ্যে বীজ প্রভৃতি লিখিয়া কালীর মূর্ত্তি বিশেষ ভাবনা করিতে হয়, তাহাকে যন্ত্র বলে।

বটুক—ভৈরব।

শব সাধন।

(তন্ত্রসার হইতে উদ্ধৃত)

শূন্যাগারে নদীতীরে পর্ব্বতে নির্জ্জনে শিবা।
বিল্বমূলে শ্মশানে বা তৎসমীপে রণস্থলে ॥
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি।
ভৌমবারে তমিশ্রায়াং সাধয়েৎ সিদ্ধিমুত্তমাম্ ॥

ভাবচূড়ামণি।

* * * * *

অথ পূর্ব্বোক্তান্যতমস্থানং গত্বা সামান্যার্ঘং বিধায় পূর্ব্বমুখোমূলান্তে ফট্কারং দত্বা যাগভূমিং সংপ্রোক্ষ্য গুরুং গণেশং বটুকং যোগীনীঞ্চ চতুর্দ্দিক্ষু পূর্ব্বাদিতঃ সংপূজ্য পূর্ব্বোক্ত বীরার্দ্দনমন্ত্রং (হুঁ হুঁ হ্রীং হ্রীং কালিকে ঘোর-দংষ্ট্রে প্রচণ্ডে চণ্ডনায়িকে, দানবান্ দারয়হন্ হন্ শব-শরীরে মহাবিঘ্নং ছেদয় ছেদয় হুঁ ফট্ ইতি) ভূমৌ বিলিখ্য যে চাত্রেত্যাদি পূর্ব্বোক্তক্রমেণ (ওঁ যেচাত্র সংস্থিতা দেবা রক্ষণাশ্চ ভয়ানকাং। পিশাচঃ সিদ্ধয়োযক্ষাগন্ধর্ব্বাপ্সর অঙ্গনাঃ ॥ যোগিন্যামতায়া ভূতাঃ সর্ব্বান্ চ খেচরস্ত্রিয়ঃ। সিদ্ধিদা স্তাভবন্ত্বাত্র তথাচ মম রক্ষকাঃ ॥) ভূমৌ পুষ্পাঞ্জলি ত্রয়ং দত্বা প্রণম্য শ্মশানাধিপতিভ্যঃ পূর্ব্বোক্তক্রমেণ বলিং দত্বা অঘোর মন্ত্রেণ শিখাবন্ধনং বিধায় হৃদি হস্তং দত্বা সুদর্শনমন্ত্রে আত্মরক্ষ রক্ষেতি আত্মরক্ষাং কুর্য্যাৎ॥ (অঘোর সুদর্শন মন্ত্রৌ ওঁ হ্রীঁ স্ফুর স্ফুর প্রস্ফুর প্রস্ফুর ঘোর ঘোরতর তনুরূপ চট্ চট্ প্রচট্ প্রচট্ কহ কহ বম বম বন্ধ বন্ধ ঘাতয় ঘাতয় হুঁ ফট্। ওঁ সহস্রারে হুঁ ফট্। ততঃ পূর্ব্বোক্তক্রমেণ ভূতশুদ্ধিং ন্যাস জলঞ্চ বিধায়

জয়দুর্গা মন্ত্রেণ দিক্ষু সর্ষপান বিকীর্য্য তিলোসীতি মন্ত্রেণ তিলাংশ্চ বিকীর্য্য বিহিত শবসমীপং গচ্ছেৎ।

বিহিত শবো যথা—

"যষ্টিবিদ্ধ শূলবিদ্ধ খড়্গাবিদ্ধ পয়োমৃতম্।
বজ্রাবিদ্ধং সর্পদষ্টং চাণ্ডালং চাভিভূতকং॥
তরুণং সুন্দরং শূরং রণেনষ্টং সমুজ্জ্বলং।
পলায়ন বিশূন্যঞ্চ সম্মুখে রণবর্ত্তিনম্॥

*　　*　　*　　*

ন দুর্ভিক্ষমৃতঞ্চাপি ন পর্য্যুষিতমেববা।
স্ত্রীজনঞ্চেদৃশং রূপং সর্ব্বথা পরিবর্জ্জয়েৎ॥
ব্রাহ্মণং গোময়ং ত্যক্ত্বা সাধয়েদ্বীরসাধনম্।"

ভৈরবতন্ত্র।

এবমুক্তংশবং গৃহীত্বা মূলমন্ত্রেণ পূজাস্থানমানয়েৎ। তৎ-সমীপং গত্বা ওঁ হুঁ হুঁ ফড়িতি শবমভ্যুক্ষ্য ওঁ হুঁ মৃতকায় নমঃ। ফড়িতি পুষ্পাঞ্জলি ত্রয়ং দত্ত্বা শবংস্পৃষ্টা প্রণমেত। প্রণায়াম মন্ত্রস্তু। (বীরেশ পরমানন্দ শিবানন্দকুলেশ্বর। আনন্দ ভৈরবাকার দেবী পর্য্যঙ্ক শঙ্কর॥ বীরোহং ত্বাং প্রপদ্যামি উত্তিষ্ঠ চণ্ডিকার্চ্চনে॥) অনেন শবমন্ত্রেণ প্রণম্য ক্ষালয়েৎ শবম্। ওঁ হুঁ মৃতকায় নমঃ। অনেন ক্ষালয়িত্বা সুগন্ধি জলেন স্নাপয়িত্বা বাসসাজলমুত্তোল্য ধূপৈ ধূপয়িত্বা চন্দনাদিনা শবং প্রলিপ্য কটিদেশং ধৃত্বা পূজাস্থানমানয়েৎ।

তথা ভাবচূড়ামনৌ—

"ধূপেন ধূপিতং কৃত্বা গন্ধাদিনা প্রলিপ্যচ।
রক্তাক্তো যদি দেবেশি ভক্ষয়েৎ কুলসাধকং॥"

ততঃ কুশশয্যাং কৃত্বা পূর্ব্বশিরঃ কৃত্বা শবং স্থাপয়েৎ।

"কুশশয্যাং পরিষ্কৃত্য তত্র সংস্থাপয়েচ্ছবং।
এলালবঙ্গকর্পূর জাতী খদিরমার্দ্দিকং।
তাম্বুলং তন্মুখে দত্ত্বা শবং কুর্য্যাদধোমুখং॥
তৎপৃষ্ঠং চন্দনেনাপি বিলিপ্য প্রয়তঃ সুধীঃ।
বাহুমূলাদি কট্যন্তং চতুরস্রং বিধায় চ॥

মধ্যে পদ্মং চতুর্দ্ধার দলাষ্টক সমন্বিতম্।
পীঠমন্ত্রং লিখেন্মধ্যে তত্তৎ কল্প বিধানতঃ॥

ওঁ হ্রীং ফড়িতি মন্ত্রেণ তত্তৎ কল্পোক্ত পীঠমন্ত্রংলিখেৎ। তদুপরি কম্বলাদ্যাসনং ন্যসেৎ।

(তন্ত্রান্তরে) গত্বা শবস্যসান্নিধ্যং ধারয়েৎ কটিদেশতঃ।
যদ্যপ্রদ্রাবয়ে তস্য দদ্যন্নিষ্টীবনং শবে।
পুনঃ প্রক্ষালনং কৃত্বা জপস্থানে সমর্পয়েৎ॥

ততো দ্বাদশাঙ্গুলযুক্ত কাষ্ঠানি দশদিক্ষু পূর্ব্ববৎ সংস্থাপ্য ইন্দ্রাদি দশদেবতা সংপূজ্য সামিষান্নেন বলিং দদ্যাৎ॥

* * *

তথা চ বীজমন্ত্রায় সংলিখ্য সুরাধিপতয়ে ততঃ।
বিঘ্ন নিবারণং কৃত্বা সিদ্ধিং মে প্রযচ্ছয় স্বাহা॥
(ততঃ) সর্ব্বভূত বলিং দদ্যাৎ সর্ব্বত্র সামিষান্নেন।
ততশ্চাধিষ্ঠাতৃদেবতাভ্যো বলিঞ্চ সুরয়াত্তারয়েত্ততঃ॥
চতুঃষষ্ঠি যোগিনীভ্যো ডাকিনীভ্যোপি সংদিশেৎ।

* * *

মূলান্তে হুঁ ফট্ শবাননায় নমঃ।

ইতি সংপূজ্য মূলমুচ্চার্য্য অশ্বারোহণক্রমেণ শবোপরি উপবিশ্য স্বপাদতলে কুশান্ দত্বা শবকেশান্ প্রসার্য্য যুটিকা বদ্ধা গুরুং গণপতিং দেবীঞ্চ নমস্কৃত্য প্রাণায়াম ষড়ঙ্গন্যাসৌ কৃত্বা পূর্ব্বোক্ত বীরার্দ্দন মন্ত্রেন দশদিক্ষু লোষ্ট্রান্ বিনিঃক্ষিপ্য সংকল্পং কুর্য্যাৎ।

* * *

ইতি সঙ্কল্প্য ওঁ হ্রীঁ আধারশক্তি কমলাসনায় নম ইত্যাসনং সংপূজ্য স্ববামতঃ শবসমীপে ২র্ঘ্যপাত্রাদিকং সংস্থাপ্য শবযুটিকায়াং পীঠপূজাং কৃত্বা ষোড়শোপচারৈঃ পঞ্চোপচারৈ র্বা দেবীং সংপূজ্য শবমুখে দেবীং গন্ধাদিনা সন্তর্পয়েৎ। ততঃ শবাদুত্থায় সংমুখে গত্বা মন্ত্রং পঠেৎ—

ওঁ বশোমে ভব দেবেশ, "মম বীরসিদ্ধিং দেহি দেহি মহাভাগ কৃতাশ্রয়পরায়ণ।"

ততঃ পট্টসূত্ররজ্জ্বাশবচরণৌ দৃঢ়ং বধ্নীয়াৎ।

*　　*　　*

ইত্যনেন শবস্য পাদতলে ত্রিকোণং যন্ত্রমুল্লিখেৎ। ততঃ শবোপরি উপবিশ্য হস্তদ্বয়ং পার্শ্বয়োঃ প্রসার্য্য তদুপরি কুশান্ দত্বা তত্র স্বপাদৌ নিধায় পুনঃ প্রাণায়ামং কৃত্বা শিরসি গুরুং বিভাব্য হৃদয়ে দেবীং ধ্যাত্বা ওষ্ঠৌ সংপুটং কৃত্বা বিহিতমালয়া মৌনীভূত্বা বীতভীর্জপেৎ।

*　　*　　*

তথাচ. শবাসনাদ্ধর্য্যং নাস্তি ভয়ে জাতেবদেত্ততঃ। যৎপ্রার্থয়ে বলিস্তেন দাতব্যং কুঞ্জরাদিকং। দিনান্তরেচ দাস্যামি স্বনাম কথয়স্বমে: ততশ্চেন্মধুরং বক্তি বক্তব্যং মধুরং ততঃ। ততঃ সত্যং কারয়িত্বা বরং প্রার্থয়েৎ।

*　　*　　*

ত্রিরাত্রং বাথ ষড্রাত্রং নবরাত্রন্তু গোপয়েৎ।
স্ত্রীশয্যাদিগচ্ছেত্তু, তদা ব্যাধিং বিনির্দ্দিশেৎ॥
গীতং শ্রুত্বা তু বধিরো নিশ্চক্ষু নৃ ত্যদর্শনাৎ।
যদি বক্তি দিনে বাক্যং তদস্য মুকতাং ভবেৎ॥
পঞ্চদশদিনং যাবদ্দেহে দেবস্য সংস্থিতি।

*　　*　　*

গোব্রাহ্মণ বিনিন্দক ন কুর্য্যাচ্চ কদাচন।
দুর্জ্জনং পতিতং ক্লীবং নস্পৃশেচ্চ কদাচন॥"

*　　*　　*

ইত্যানেন বিধানেন সিদ্ধি মাপ্নোতি সাধকঃ।
ইহ ভুক্ত্বাবরান্ ভোগান্ অন্তে যাতি হরেঃ পদং॥

এক বর্ণ...ভবিষ্যতি—কলিকালে জাতিভেদ উঠিয়া গিয়া, সব একাকার হইবে।

অবলা···ফলা হবে—সাধারণ স্ত্রীজাতি অত্যন্ত অস্থীরা ব্যাপিকা এবং কুফলদায়িকা হইবে।

ঠাকুরাল—প্রভুত্ব, কর্ত্তৃত্ব।

উত্তমাসিদ্ধি—তার, সুতার, তারয়ন্তি, প্রমোদ, প্রমুদিত, প্রমোদ-

মান, রম্যক ও সৎপ্রমোদিত এই অষ্টসিদ্ধি। ইহার মধ্যে পরিচর্য্যা করিয়া গুরুকে পরিতুষ্ট করিলে, তত্ত্বভাবভূত বিষয়ে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই সৎপ্রমোদিত নামক অষ্টম সিদ্ধিই উত্তমাসিদ্ধি।

তন্ত্রমতে উত্তমাসিদ্ধি অন্য প্রকার। যথা,—

"মনোরথানামক্লেশ সিদ্ধিরুত্তম লক্ষণং।
মৃত্যুনাং হরণং তদ্বদ্দেবতা দর্শনং তথা॥
প্রয়োগেস্যাঃ ক্লেশসিদ্ধিসিদ্ধেস্তু লক্ষণং পরং।
পরকায়ে প্রবেশশ্চ পুরপ্রবেশনং তথা॥
উর্দ্ধোৎক্রমণ মেবং হি চরাচর পুরে গতি।
খেচরী মেলনঞ্চৈব তৎ কথা শ্রবণাদিকং॥
ভূচ্ছিদ্রাদি প্রপশ্যেত্তু তদুত্তমস্য লক্ষণং।"

বিদ্যাসুন্দরের স্বর্গারোহণ।

(১৭৭-১৭৯ পৃঃ)

অমার কর্ত্তব্য ··কহি—এস্থানে সুন্দর তাহার পুত্রকে রাজনীতি ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে।

পরস্ত্রী.. সাবধানে—চাণক্য শ্লোকে আছে,

"মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিত॥"

মানি-মান-ভঙ্গ—যে মান্যমান বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, তাহাকে কদাচ অপমান করা উচিত নহে।

রিপু সঙ্গে সৌর্য্য—শত্রুদের নিকট সর্ব্বদা বীরত্ব প্রকাশ করিবে, ইহাই বিগ্রহের প্রধান নীতি।

ব্রাহ্মণ মামকী তনু—ব্রাহ্মণই ঈশ্বরের শরীর, ইহা ভগবানের উক্তি।

ধরামর সন্নিকটে—পৃথিবীতে মনুষ্যের নিকটে।

ভবানী শঙ্কর···প্রজ্ঞাহীন—ভারত বলিয়াছেন,

"হরি হর বিধি তিন আমার শরীর।
অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর॥"

শাস্ত্রে আছে,

"একমূর্ত্তি স্ত্রিনামানি ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
নানাভাবে মনোর্যস্য তস্য মোক্ষো ন বিদ্যতে॥"

গুরুমন্ত্র···ধর্ম—হিন্দু শাস্ত্রমতে এসকল প্রকাশ করিতে নাই। কারণ যে অধিকারী নহে, তাহার এসকল কথা শুনিলে অপকার ব্যতীত উপকার হয় না। এই জন্যই হিন্দুশাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম বুঝা এত দুরূহ।

অবচ্ছেদাবচ্ছেদে—ব্যাপকভাবে। অর্থাৎ যাহার ষড়ৈশ্বর্য্য লাভ করায় নিমিষেই ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইতে পারে। তন্ত্রমতে মন্ত্রবিশেষ জপ ও সাধন করিলে এই কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারা যায়।

অদ্য বাব্দ শতান্তে বা···মরণ—কবিরঞ্জন অন্যত্র বলিয়াছেন,

"ওরে আজি বাব্দ শতান্তে বা অবশ্য মরিতে হবে।"

বাদিয়ার বাজী···সংসার—এই ভাবটী অতি সুন্দর। হিন্দু শাস্ত্রের ইহাই মূল সিদ্ধান্ত। অবিদ্যার মোহে সংসারকে এইরূপ সত্য বলিয়া বোধ হয়, নতুবা ইহা কিছুই নহে। কবিরঞ্জনকৃত একটী গানে আছে,

"এসংসার ধোঁকার টাটি।
ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি॥
ওরে ক্ষিতি জল বহ্নি বায়ু শূন্যে পাঁচে পরিপাটি।
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা অহঙ্কারে লক্ষকোটী।
যেমন সরার জলে সূর্য্যছায়া অভাবেতে স্বভাব যেটী॥"

কালক্রমে—কোন না কোন সময়ে মরিতেই হইবে।

মর্ম্মে লাগে ব্যথা—মায়ে পোয়ে যে সকল মর্ম্মভেদী দুঃখ কাহিনী হয়, সে সকল দুঃখ ও শোকের কথা কবি এস্থলে বর্ণনা করিলেন না।

যোগবলে…প্রাণ—পূর্ব্বে যোগিগণ এইরূপে ইচ্ছা করিলে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে যাইতে পারিতেন।

পূর্ব্ব কলেবর—আতিবাহিক দেহ। গন্ধর্ব্ব দেহ।

মালাধর হারাবতী—মালাধর সম্বন্ধে বিশেষ বৃত্তান্ত এস্থলে কোথাও উল্লেখ নাই। কিরূপে তাহারা শাপ ভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে আসে, পূর্ব্ব জন্মে তাহারা কে ছিল, তাহা এস্থলে কোথাও বর্ণিত হয় নাই। কবিরঞ্জন চণ্ডীতে মালাধরের কথা আছে, বোধ হয় তাহা অবলম্বনেই ইহা রচিত।

নগজাতা—পর্ব্বতদুহিতা দুর্গা।

অষ্টমঙ্গলা।

(১৭৯—১৮১ পৃঃ)

মহাকালী দর্শন—মহাভাগবতী পুরাণের শেষে এই মহাকালী বৃত্তান্ত অতি সবিস্তারে বর্ণিত আছে। সেই কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড, কোটী কোটী ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশের সৃষ্টি-কর্ত্রীর অনন্ত বিস্তৃত মহৈশ্বর্য্যময় পুরী দর্শনে ব্রহ্মাদি মোহিত হইয়া অনন্তকাল নিজকাজ বিস্মৃত ছিলেন। স্বকন্যা সন্ধ্যা সঙ্গমে ব্রহ্মার যে পাপ হয়, তাহাই ক্ষালন জন্য শিব ও বিষ্ণু ব্রহ্মাকে সঙ্গে করিয়া মহাকালী পুরী দর্শনে যান; এবং পুরী প্রবেশেই তাঁহার পাপ দূর হয়। ইহার বিস্তারিত বিবরণ এস্থলে সম্ভব নহে।

এই অষ্টমঙ্গলা পড়িলেই কবিরঞ্জনের বিদ্যা সুন্দর অসম্পূর্ণ বোধ হয়। বোধ হয় যেন ইহাও কবিরঞ্জনের চণ্ডী বা ভারতের অন্নদামঙ্গলের অষ্টমঙ্গলা গানের ন্যায় সম্পূর্ণ ছিল। তবে বাঙ্গালী পাঠকদের অদৃষ্টদোষে তাহা আর পাওয়া যাইবে না বোধ হয়। এই অষ্টমঙ্গলা পাঠে

বেশ বুঝা যায় যে, ইহাতেও প্রথমে দক্ষযজ্ঞ, পরে পার্ব্বতীর জন্ম ও মদনভস্ম, তাহার পর মহিষাসুর যুদ্ধ, তাহার পর রামের সেতুবন্ধে দুর্গাপূজা, তাহার পর শুম্ভনিশুম্ভের যুদ্ধ, ও সুরথ রাজার মহাপূজা, তৎপরে ব্রহ্মাবিষ্ণু শিবের মহাকালী দর্শন, তৎপরে বিক্রমাদিত্য ও ভানুমতী উপাখ্যান ও শেষে এই বিদ্যাসুন্দর বা মালাধর ও হারাবতী উপাখ্যান; এই আটটী বিষয় বর্ণিত ছিল। ইহার মধ্যে কেবল বিদ্যাসুন্দর অংশটি পাওয়া যায় মাত্র। কবিরঞ্জনের ন্যায় একজন মহা সাধক ও মহাকবির এরূপ মহাকাব্য কিরূপ অমূল্য ছিল, তাহা অবশ্য সকলেই বুঝিতে পারিবেন। কবির যে এই অষ্টমঙ্গলা গান সম্পূর্ণ ছিল, তাহার আর একটী কারণ এই দেখা যায় যে বিদ্যাসুন্দরকে ইহার "জাগরণ পালা" বলিয়া নির্দ্দেশ করা আছে। অর্থাৎ প্রথম সাত দিন দিবসে বা সন্ধ্যার সময় গান হইয়া শেষ দিনে রাত্রিতে লোকে এই পালা শুনিত। ভারতের মানসিংহ এইরূপ জাগরণ পালা। যথা,

"এত দূরে পালা গীত হইল সমাপন।
অতঃপর রজনীতে গাব জাগরণ ॥"

আমরা কবিরঞ্জনের সেই জাগরণ পালা মাত্র পাইলাম মূল পালা গীত পাইলাম না। বড়ই দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই।

সমাপ্ত।
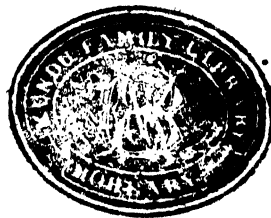
শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	২৩	তপ কৃপালেশে	তব কৃপালেশে
		প্রাজ্ঞবান	প্রজ্ঞাবান
৪		মনোহর মনোহর	মনোহর মনোহরা
„	২৩	আসি বটে সেই	অসি বটে সেই
৮	২৪	আর তো লাগায়	আর্ তো লাগায়া
১৯	৩	নলাটী	নুলাটী
„	১৬	চায় ভার	চায় তার
২১	১১	সুপাতিত মহী	সুতাপিত মহী
২২	১৩	কেহ কেহ	কেহ কহে
২৩	১০	এদেশে	এদেশ
„	১৩	কেহ	কহে
৪৫	১৯	প্রমাণ সরমে	প্রণাম সরমে
৪৮	৩	কুণ্ডকলি	কুন্দকলি
৫০	১৩	মৃদমদ	মৃগমদ
৫৩	১৯	সমুস্তুত	সমুদ্ভুত
৫৬	২	বন্দয়ে যে জাতি	বন্দয়ে মন্দ যে জাতি
৫৮	১১	অলি	আলি
„	১২	করি	কবি
৬১	১৪	করিবর	কবিবর
„	১৮	কণতি	কল্পতি
৬৩	৮	অচট্	আচট্
৬৭	৬	পরামর্থ	পরামর্শ
৭৪	১	সে=	সেতু
„	৭	ছি ছি	ছি
৭৫	৪	দিয়েছি	দিয়েছে
৮৭	৫	খেলাওব	খেলাওর
	১০-১১	গা, আভি ও উঙ্কা	ইহার পর

তিনটি অশ্লীল কথা বাদ যাওয়ায় * * এই চিহ্ন হইবে।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯২	১	শিজ্ঞাসিলে	জিজ্ঞাসিলে
৯৩	৬	নিষ্ঠু	নিষ্ঠুর
১০১	২১	কর	কহ
১০৩	১৪	জিনিয়া	জানিয়া
১০৭	১৬	এই দেশে	এই বেশে
১২২	৯	দ্বাদশ বৎসর	দ্বাদশ বৎসরে (প্রশস্ত পাঠ)
১২৪	২	জানিলে	জানিল
১২৫	৭	পীড়িতানি গাত্রানি	গাত্রাণি শেষ চরণের প্রথমে বসিবে
১৩১	৩	থ ভবে	থ ভরে
১৩৩	২১	ভারে	ভাবে
„	২২	পারে	পাবে
১৩৪	৩	বিশ্ববিভু দ্বারা	বিশ্ববিভুদারা
১৩৭	১	সল্লোক পথগামী	সল্লোক যে পথগামী
১৩৭	১	খঞ্জন	খঞ্জর
১৩৯	৮	চল সাত	লোকে চল সাত
১৪১	২০	কাহার	করহ
১৪৩	২২	সবল হৃদয়	সরলহৃদয়
১৪৭	১০	কোথা	কোথায়
১৫২	৮	মলিম	মলিন
১৬৫	৫	যোড়	যোড়া
„	১২	সংব্রাদ	সংবাদ
১৬৭	৯	কন্যা দারা	ধন্যা দারা
১৬৯	১৫	কলী	কালী
১৭২	৫	সর্ব্বদা	সর্ব্বথা
„	১০	বিবেশেতি	বীরেশেতি
১৭৩	৩	পুষ্ঠে	পৃষ্ঠে
„	২৩	বিবর্দ্ধনে	বীরার্দ্দনে

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৭৪	৬	বসোমে ভারত্তি	বসোমে ভবেতি
"	১২	প্রাণায়ামে	প্রাণায়াম
১৭৬	২২	বড়হ	বটহ

টীকার অতিরিক্ত ও শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৮	তুলনার	তুলনায়
১২	৩	এওসে	এয়সে
"	১২	জান্যে	জানো
১৫	১৫	একহি	এক হই
১৬	৫	যেথানে	সেথানে
"	৮	আয়বেদজ্ঞ	আয়ুর্বেদজ্ঞ
১৭	৪	তাহা	তাই
"	১১	বর্ণনার করিয়াছেন	বর্ণনায় কবিরঞ্জন
১৯	১২	"বুড়	"বু"
২০	১৪	কেমক	কম কে
"	১৭	পরস্প	পরস্পর
২১	১১	মেওরে	মেওয়া
২৪	৩	ব্রিসেন	বিসেন
"	১৬	শরতে	শরতে যেরূপ
২৫	৬	চন্দ্রের সহিত	চন্দ্রের
২৬	১৭	পনীয়	[ইহার অর্থের শেষে "নিন্দি তপনীয় এরূপ পাঠও হয়। তপনীয়—স্বর্ণ।" ইহা বসাইতে হইবে]
২৮	১৫	আর গুণ	আর গুন"
৩৩	২০	মলা	মালা
৩৮	১২	কম্বল	কন্দল
৪২	১০	মথায়	মাথায়
৪৪	৩	মোহীতে	মহীতে
৪৮	৯	নাড়ী ছয়টী	ছয়টী নাড়ী

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৯	১১	রুস্থ	রুক্ষ্ম
৬৯	২৪	গিরি	[ইহার অবস্থা অর্থও হয়—অর্থাৎ কোটালি পদের জারি জুরি এখন কোথায় রহিল]।
৬৪	৪	মেনে গারি গাও—	["আমি শপথ করিয়া বলিলাম" এরূপ অর্থও হয়]
”	৯	পড়ে সো কাঁহি	[সে চোর যেথনে থাক্না কেন, এরূপ অর্থও হয়]
”	১১	জাঁপাযেটে	["ইহার পাঠ "জা (যা)—পায়েট (পৈট্) অর্থাৎ স্বেচ্ছায় যাওয়া। পৈট—অর্থে হাট্ও হয়, যথা "লে না হৈ সো লেলে উঠি যাত হৈ পৈঠ" বিহারী সাতশৈ।]
৭৭	৮	লইল বটে	লইল
৭৯	২০	খাং. জায়গীর	[(রাজা প্রথমেই বলিয়াছেন, ধরিয়া আনিলে চোর সম্মান করিব তোর জায়গীর দিব বহু করে। অর্থের শেষে ইহা বসাইতে হইবে।]
৮৩	৯	ধর্ম্মকেই ঈশ্বর	কর্ম্মকেই ঈশ্বর
৮৫	১৯	মুখচন্দ্রের	মুখচন্দ্রের সহিত
৯২	২৭	জ্ঞান লাভ	লাভ জ্ঞান
৯৫	৪	ক্ষ্যাদ্যাক্তি	আদ্যাশক্তি
৯৬	১	ডাইন কানে	দেবতা ডাইন কানে
১০৫	২৭	নানা জাতীয় মানবেরা	সকল লোকেই
১১৬	১৭	ফাট্তি	ফটিতি
১১৮	৬	যত্ন্যপ্রদ্রাবয়ে	যত্ন্যপদ্রারয়ে
১২১	১১	যাহার	যাহারা

☞ (*)চিহ্নিত শুদ্ধ কথাগুলি টীকায় নূতন সন্নিবেশিত হইবে।

—:০:—